জিলা মেদিনীপুর : স্বাধীনতার আন্দোলন

২০০১

দীপশ্রী প্রকাশন
তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুর

প্রথম প্রকাশ, ২৩শে নভেম্বর, ২০০১

প্রকাশক ঃ দীপশ্রী প্রকাশন-এর পক্ষে শ্রীমতী বাসন্তী কুণ্ডু,
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ ঃ ধনঞ্জয় বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ দীপঙ্কর সিন্‌হা, "সিন্‌হা প্রিন্টার্স",
পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন-৫২০০৮

অক্ষর বিন্যাসে ঃ সঞ্জয় বসাক ও উদয় শঙ্কর দ
পারফেক্ট লেজার পয়েন্ট

প্রাপ্তিস্থান ঃ সুবর্ণরেখা, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯
সঞ্চিতা, বড়বাজার, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

আকাশবাণী ও দূরদর্শনের খ্যাতিমান সাংবাদিক - সাহিত্যিক
শ্রদ্ধাভাজন প্রয়াত প্রণবেশ সেন-এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যেমন বিপুল তেমনি বহুধা। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষে দ্বিধারায় আন্দোলন চলে একটি গুপ্ত বিপ্লববাদের ধারা আর অপরটি গণতান্ত্রিক ধারা যা জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনাধীনে গান্ধীজির নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল। এই উভয়ধারার প্রভাব মেদিনীপুর জেলায় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। গুপ্ত বিপ্লববাদের অন্যতম পীঠস্থানরূপে ইতিহাসে মেদিনীপুর যেমন স্থান করে নিয়েছে, তেমনি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তিনটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মেদিনীপুর কেবল অনন্য ভূমিকা পালন করেনি, বরং বলা চলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। বর্তমান গবেষণার ফলে এসব আজ একরকম স্বীকৃত সত্য বলে প্রমাণিত।

এসব কথা জানতে ড. কমল কুমার কুণ্ডুর 'জিলা মেদিনীপুর ঃ স্বাধীনতার আন্দোলন' আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবে। গবেষক হিসেবে তিনি ইতিপূর্বেই সুধী সমাজের কাছে সুপরিচিত নাম। এই বইটিতে তার আলোচিত প্রবন্ধগুলিতে তিনি মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিবিধ ধারার উপর আলোক সম্পাত করেছেন। অনেক অল্প পরিচিত ও অজ্ঞাত বিষয়ের উপর ড. কুণ্ডু তার বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

বইটি পাঠ করলে লেখকের পরিশ্রম চোখে পড়ে। তথ্যচয়ন ও তাদের উপস্থাপনায় লেখকের মুন্সিয়ানা সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি যথাযথভাবে জানতে হলে এই বইটি সংগ্রহে থাকা দরকার। ইতিহাস অনুরাগী সাধারণ পাঠক এমনকি বিশেষজ্ঞরাও এই বইটি থেকে উপকৃত হবেন একথা বলা চলে। লেখক তার সৃষ্টিধর্মী কাজকর্ম এভাবে চালিয়ে যান, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানাই। সেই সঙ্গে আমি এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অর্ঘ্য আমার

বিগত দুই দশক ধরে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কিছু প্রবন্ধ, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে ক্ষুদিরাম জন্মশতবর্ষে আমার কথিকা, কোলকাতা দূরদর্শন এবং দূরদর্শনের জাতীয় চ্যানেলে যথাক্রমে আগষ্ট আন্দোলনের (১৯৪২) ৫০তম বর্ষ পূর্তি এবং স্বাধীনতার ৫০তম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমার লেখা কাহিনীগুলির পরিমার্জিত করে বিন্যাস করা হয়েছে 'জিলা মেদিনীপুর ঃ স্বাধীনতার আন্দোলন' নামের এই বইটিতে। আমি দাবী করিনা যে দেশের সর্ববৃহৎ এই মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু কর্মধারার পূর্ণাঙ্গ রূপ ধরে দিতে পেরেছি। স্বল্প পরিসরে তা বলাও অসম্ভব। তবে কিছু কিছু ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে এই জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের মোটামুটি এক রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

এই বইতে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তির কর্মকান্ডের বিন্যাস নেই আলাদা করে। তবুও আন্দোলনের জন্য যে মানুষটি আক্ষরিকভাবে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন সেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে নিয়ে একটা লেখার মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীর ভূমিকাকে জানবার প্রয়োজনে এবং বর্ণময় প্রচারের আলোর বাইরে থাকা তদানীন্তন মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের এক ব্যক্তিত্ব রমেশচন্দ্র কর মহাশয়ের আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু ঘটনার কথা জানা যাবে বলে এদুটি অনিবার্যভাবেই চলে এসেছে। এখানে মুখ্যত কিছু ঘটনার মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ভূমিকাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং সেই বর্ণনার প্রয়োজনেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে;কারুর সম্পর্কে আলাদাকরে লেখা হয়নি। অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ-কিশোর স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বলেই আন্দোলন পূর্ণতা পেয়েছিল এই জেলায়। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

বইটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রথমেই স্মরণ করছি "তাম্রলিপ্ত' (সাপ্তাহিক) পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক জয়দেব মালাকার এবং অনিল পট্টনায়েককে। এরা ওদের পত্রিকায় প্রতিবছর শারদীয় সংখ্যাগুলিতে লেখবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলেই লেখার কাজ অনেক আগেই সেরে রাখতে পেরেছিলাম। এছাড়াও জয়দেব মালাকার তিনি তার পিতা ঁধীরেন্দ্রনাথ মালাকারকে লেখা সরকারী চিঠির প্রতিলিপি প্রকাশ করতে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 'ক্রান্তিক' পত্রিকার সম্পাদক রাসবিহারী দত্ত তাঁর পত্রিকায় আমার একটি লেখা 'পরাধীন ভারতের স্বাধীন সরকার ও তার বিচারালয়ে' এবং 'প্রমা'-র সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ 'মেদিনীপুর জেলার বীরাঙ্গনা কাহিনী' প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের পত্রিকায়। এই কাহিনী দূরদর্শনের পর্দায় এনেছিলেন প্রযোজিকা যূথিকা দত্ত স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যেও 'বিপ্লবতীর্থ তমলুক' দূরদর্শনে চিত্রায়ণ করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রয়াত প্রনবেশ সেন। এঁদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। 'আইন অমান্য আন্দোলনে জেলা

মেদিনীপুর' অংশে ব্যবহৃত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা ভারতের অবস্থা সম্পর্কে লন্ডনের 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় মি. বেলস্‌ফোর্ডের বক্তব্যের অনুবাদ, বড়লাটকে লেখা মহাত্মাগান্ধীর চিঠি এবং আমেরিকার 'ইউনিটি' পত্রিকায় গান্ধীজির প্রশস্তির বঙ্গানুবাদ আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় (১৯৩১-৩২) প্রকাশিত হয়েছিল। এঁদেরকেও আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পুরাতন কাগজ বিভাগের কর্মীদের।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন প্রয়াত অধ্যাপক নিশীথ রঞ্জন রায়, প্রয়াত নৃতত্ত্ববিদ ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায়, গবেষক প্রশান্ত কুমার মণ্ডল, প্রাবন্ধিক-গবেষক তারাপদ সাঁতরা, আমার প্রধান শিক্ষক গৌরীশংকর বসু, শ্রদ্ধাস্পদ শক্তিপদ রায়চৌধুরী, নৃতাত্ত্বিক ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিক, বিপ্লবী ড. সুশীল ধাড়া, গোপীনন্দন গোস্বামী, কৃষ্ণচৈতন্য মহাপাত্র, ডাঃ রাধাকান্ত মাইতি, অধ্যাপক সুধাংশু ভৌমিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন (বেঙ্গল সার্কল)-এর সাধারণ সম্পাদক তথা ঐ সংস্থার সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী বি. বি. দাস, বন্ধুবর মাননীয় লোকসভা সদস্য লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ প্রমুখ গুণীজন। অনেক সময় অন্য কাজের সহযাত্রায় আন্দোলনের নানান কথার আলোচনায় অংশ নিয়ে সহায়তা করেছেন বন্ধুবর স্বপন কুমার ভৌমিক, রজত মিত্র ও পবিত্র কুমার পাহাড়ী। অমলেন্দু রায়, বিশ্বনাথ সামন্ত, প্রদীপ রায় ও অসিত সিনহা সহ আমার অনেক সজ্জন বন্ধু আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ভালো গদ্য লিখতে যিনি উৎসাহ দিতেন সেই প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার কথা সাহিত্যিক প্রয়াত কিশলয় ঠাকুর এবং যাঁর কাছে স্নাতকস্তরেই ছাত্রাবস্থায় গবেষণার কাজে উৎসাহিত হয়েছিলাম এবং যিনি আমার এই বইটির জন্য ভূমিকা লিখে দিয়েছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি — এঁদের উভয়কেই আমার প্রণাম। অধ্যাপক কানু কুমার সাহু এবং অধ্যাপক দীপক মিত্র-র কাছেও কৃতজ্ঞ।

মনে পড়ছে হাতেম ভাই-এর কথা, খুব ছোটবেলায় যাঁর কাছ থেকে জীবনের প্রথম একটি 'রাইটার' কলম উপহার পেয়েছিলাম।

সারাজীবনই যাঁদের স্নেহধারা বর্ষেছে আমার ওপর তাঁরা আমার পিতা, মাতা, এবং কাকাবাবু। আমার চাকুরীর শর্তে সময়ের ফাঁক খুবই কম এবং ফলে সময় বের করে লেখার কাজ খুবই শক্ত। সংসারের নৈমিত্তিক কাজে আমাকে দায়মুক্ত করে আমার লেখার জন্য সময় বের করে দিয়েছে আমার স্ত্রী বাসন্তী, কন্যা দেবীশ্রী এবং পুত্র দীপময়। এদের সবার কাছেই আমি ঋণী।

বন্ধুবর শিল্পী ধনঞ্জয় বিশ্বাস খুবই যত্ন নিয়ে বইটির প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন এবং প্রচ্ছদটির মুদ্রণে সাহায্য করেছেন। বইটির সমূহ মুদ্রণের কাজ নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন সিন্‌হা প্রিন্টার্সের শ্রী দীপঙ্কর সিন্‌হা। এদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সূচীপত্র

প্রাসঙ্গিকী

আজকের ঝাড়গ্রাম বা আগের দিনের ঝারিখণ্ড পরিমণ্ডলে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী কিছু আদি নিষাদজনের বাস ছিল। এই গোষ্ঠীর দলপতিরা আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার করে রাজত্ব করত। এরা শ্রম এবং দেহশক্তিকে মূলধন করে জীবন সংগ্রামে নেমেছিল। মানভূম-সিংভূম সীমান্ত বরাবর বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে তারা এক প্রাক্-আর্য সভ্যতার বুনিয়াদ তৈরি করেছিল কোন সুদূর অতীতে। ঝাড়গ্রাম মহকুমার বীনপুর থানার 'লালজল' গ্রামের দেবপাহাড়ে পাওয়া গেছে সেই আদিম মানুষের আবাসস্থল একটি গুহা। গুহার দেওয়ালে আদিম মানুষের আঁকা দেওয়াল চিত্র। আর পাহাড়ের গা বেয়ে ধেয়ে আসা এক জলপ্রবাহ কাঁসাই-এর এক উপনদী তারাফেণীতে যেখানে মিশেছে, সেখানে পাওয়া বিবিধ আয়ুধের মাঝে প্রতিভাত হয়েছে শিকারজীবী আরণ্যক জীবনের প্রতিচ্ছায়া। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী রামগড়ের কাছে প্রবাহিত কংসাবতীর বাঁদিকের তীরে 'সিজুয়া'-য় আবিষ্কৃত হয়েছে ১০ হাজার বছর আগেকার একটি মানব জীবাশ্ম — ১৭-২৩ বছরের তরুণের একটি ভগ্ন চোয়াল। উল্লেখ করা যেতে পারে তাম্রলিপ্ত, সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্রের কিউরেটর প্রশান্তকুমার মণ্ডল, রূপনারায়ণ যেখানে হুগলী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে তারই একটু আগে রূপনারায়ণের দক্ষিণ তীরের নাটশাল গ্রামে আবিষ্কার করেছেন মানবদেহের জীবাশ্ম, শিলীভূত হাড় ও হরিণ শিং-এর তৈরী নানান অস্ত্রশস্ত্র এবং এগুলির উপর মানুষের নানান শিল্প কর্ম, যা ভারতীয় উপমহাদেশে একক ও অনন্য। মেদিনীপুর জেলায় পাওয়া এই পুরাবস্তুগুলি টেনে নিয়ে যায় ভারত সভ্যতার এক রহস্যময় অতীতে। প্রাক-আর্য সভ্যতার এই মানুষজনেরা নিজেদের সংস্কৃতির প্রসারও ঘটিয়েছিল।

ক্রমে অন্ত্যজ মানুষের সংস্কৃতির দ্বারে ধাক্কা দিল বহিরাগত অন্য সংস্কৃতির উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার মানুষজনেরা - দক্ষিণ থেকে এল উৎকল সংস্কৃতি আর উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বঙ্গ সংস্কৃতি। এই ত্রয়ী সংস্কৃতির উপাদানেই পরিপুষ্ট হয়েছে মেদিনীপুরের এই জনমানস। নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক পালাবদলের মধ্য দিয়েই মোটামুটিভাবে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার আয়তন নির্ধারিত হয়ে যায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুনের এক আদেশবলে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিহার, সুবর্ণরেখা, উত্তর পূর্বে শিলাবতী এবং রূপনারায়ণ আর পূর্বে হুগলী নদী ও বঙ্গোপসাগর দিয়ে মোড়া সেই ভূখণ্ডই বর্তমানের এই মেদিনীপুর জেলা।

জেলার মূল নদী তিনটের একটা কাঁসাই। পুরুলিয়ার ঝালদায় 'কপিলা' পাহাড় থেকে উৎসারিত হয়ে মেদিনীপুর জেলায় রামগড়ের কাছে ঢুকে ময়না থানার ট্যাংরাখালির

কাছে নাম হারিয়ে হলদী নাম নিয়ে হুড়হুড়িয়ে পড়েছে হুগলী-ভাগীরথী নদীতে। অপর নদী কেলেঘাই ঝাড়গ্রামের গোলবান্দির কাছে জঙ্গলময় এক টিলার ঝর্ণাধারা থেকে নেমে শাঁকরেল থানার ভেতর দিয়ে কেশিয়াড়ীকে দক্ষিণে রেখে নারায়ণগড় থানায় ঢুকে সবং, পটাশপুর, ভগবানপুর থানার সীমানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ট্যাংরাখালিতে কাঁসাই-হলদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর মানভূমের শিলাবতী গড়বেতায় ঢুকে নাড়াজোল হয়ে ঘাটাল শহরের মধ্য দিয়ে বুক চিরে এগিয়ে রূপনারায়ণ নদ-এ মিশেছে বন্দরের কাছে। আরও দু-একটি ছাড়া এই প্রধান তিন নদীই জেলাকে পরিপুষ্ট করেছে।

মেদিনীপুর-এর পুরান ইতিহাস প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যেরই (আধুনিক নাম তমলুক) ইতিহাস। কিংবদন্তী এই যে মহাভারতের কালে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন তাম্রলিপ্তরাজ। ভারতবর্ষের বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত। বহু মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে এখানে। সম্রাট অশোক মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহল পাঠিয়েছিলেন এই বন্দর দিয়েই। মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানান দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক তথা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হয়েছে এই বন্দর থেকেই। মাঝে মাঝেই বহু বহিরাগতের পদচিহ্ন পড়েছে এই ব্যস্ততম বাণিজ্য কেন্দ্রটিতে; কখনও ভ্রমণার্থী, কখনও ব্যবসায়ী, কখনওবা ধর্মীয় যাজকের ভূমিকায়। প্লিনি, টলেমি, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ প্রভৃতি পরিব্রাজকদের রেখে যাওয়া বিবরণ, জাতকের গল্পকথা, দণ্ডির দশকুমারচরিত আর কথাসরিৎসাগরের নানান বর্ণনায় তাম্রলিপ্তির পূর্ব ভারতের এক বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ও বৌদ্ধধর্মের এক শিক্ষাক্ষেত্র হিসেবেই পরিচিতি।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে নানান রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝায় মেদিনীপুর সমেত আশপাশের এলাকাগুলো বিভিন্ন ধরনের বিপদ প্রত্যক্ষ করেছে। ষোড়শ শতকের মধ্যেই ওড়িশার গঙ্গবংশীয় নৃপতিদের প্রভাব কমে এবং বহিরাগত মুসলমান শক্তি বাংলা তথা মেদিনীপুরের অধিকার লাভ করে। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে পাঠান সুলতান সুলেইমান কররাণীর পুত্র দায়ুদের লড়াইয়ের সাক্ষী হয়ে আছে সুবর্ণরেখার দুই তীর। আবার ১৫৭৬-এ নেকুড়শ্রেণী রেল ষ্টেশনের কাছে মোগলমারী নামের এক জায়গায় যুদ্ধে দায়ুদ হেরে যায়। ১৫৯৩-এ মানসিংহের চেষ্টায় মেদিনীপুর মোগল অধিকারে এল। এই মোগল আমলেই হিজলী নগরীর পত্তন হয়েছিল বঙ্গোপসাগরের থেকে জেগে ওঠা দ্বীপ-এ। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পর্তুগীজ মিশনারী সিবাষ্টিয়ান ম্যানরিক সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় নিতান্ত বাধ্য হয়েই হিজলীর তীরভূমিতে পৌঁছেছিলেন। হিজলীর এই সময়ের অধিপতি ছিলেন তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা। এঁর রাজত্বকাল ১৬৪৯ পর্যন্ত। এই হিজলী ধীরে ধীরে নিমক মহাল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। হিজলীর ৬-৭ মাইল দূরে (মাঝে কাউখালি নদী) খেজুরিতে কোন এক আফগান সর্দার জংলা আর লোনা জমিকে আস্তে আস্তে বাসস্থানের উপযোগী করে তুললেন। গড়ে উঠল চা-কফির ট্যাভার্ণ, নাচগানের আড্ডা। ফরাসী, পর্তুগীজ আর ইংরেজরা কলকাতা নগরীর পত্তনের আগে খেজুরি-হিজলীতে ব্যবসার এক বড় কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। বহু বিদেশী আসতো খেজুরিতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায়। হুগলী থেকে তাড়া খেয়ে জোব চার্ণক চলে এলেন হিজলীতে ১৬৮৭তে।

শায়েস্তা খাঁ তখন বাংলার সুবেদার। এখানে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধল চার্ণকের। কৌশলে সেদিন চার্ণক জিতে গেলেন। ইংরেজদের বিজয়কেতন উঠল হিজলীতে ১৬৮৭-তেই, কলকাতার অনেক আগে।

পরের সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ঘাটালের শোভা সিংহ। ১৬৯৫-এর মাঝামাঝি এর ভয়ে ভীত আরামপ্রিয় নবাব ইংরেজদের সাহায্য নেয়। বিনিময়ে পোক্ত হয় ইংরেজদের কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম। এর পরে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মেদিনীপুর বারে বারেই বিব্রত হয়ে উঠেছিল বর্গীদের আক্রমণে। বাংলা, বিহার আর ওড়িশার নবাব আলিবর্দীকে অনেকবারই আসতে হয়েছিল মেদিনীপুরে। বর্গীদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য মহিষাদলরাজ পোর্তুগীজদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিনিময়ে এদের গেঁওখালির কাছে মীরপুরে বসতির জন্য নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। আজও তারা সেখানে হিন্দু-পোর্তুগীজ সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে বসবাস করে চলেছেন। গড়ে তুলেছেন ফিরিঙ্গীপাড়া। আশ্চর্যসুন্দর এক সংস্কৃতি। ধর্মের জন্য কেউ গীর্জায় যায়, আবার গৃহকোণে নারীরা হিন্দুদেবদেবীর পূজার্চনাও করতে পারে নির্বিবাদে। প্রত্যেকটি লোকের দুটো করে নাম। একটা হিন্দু নাম, আর একটা পোর্তুগীজ নাম। হিন্দুনাম নিমাই তো পর্তুগীজ নাম পল তেসরা।

যাইহোক মেদিনীপুরের দুর্দশার শুরু হলো ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন মিরকাশীম রাজ্যলোভে মেদিনীপুর তুলে দেয় স্থায়ীভাবে ইংরেজদের হাতে - যদিও সেই মেদিনীপুর বর্তমানের পুরো মেদিনীপুর নয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরকে বর্ধমান প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের আওতায় রেখে ১৭৭৬-এ জন পিয়ার্সকে মেদিনীপুরের কালেক্টর করা হল। ১৭৭৯তে স্বতন্ত্র কালেকটরেট হয় মেদিনীপুরের জন্য। ১৭৮১তে তৈরি হল মেদিনীপুরের দেওয়ানি আদালত। আর প্রধান বিচারক হলেন মিঃ শেরম্যান বার্ড।

ইংরেজ আমলেই মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে শোষণ আর বঞ্চনার স্রোত। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজরা প্রথম আঘাত হানল দেশের জমিদারদের ওপর। বেশী খাজনা আদায়ের আশায় এরা নতুন কিছু জমিদার খুঁজতে লাগলো। জমিদারদের পাইক বরকন্দাজরা বিনা খাজনায় যে সব পাইকান জমি রেখেছিল সেগুলি দখল করতে চাইলে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এদের আন্দোলনের সহায়তা করেছিলেন কর্ণগড়ের জমিদার রাণী শিরোমণি আর নাড়াজোলের চুনিলাল খাঁন। শিলদায় আন্দোলন শুরু হল বাগদী সর্দার গোবর্ধন দিকপতির নেতৃত্বে। তবে শিলাবতী নদীর দক্ষিণে গড়বেতার গনগনির মাঠের মধ্য থেকে যে বিদ্রোহ, তার ইতিহাস 'আগুনের মতই গনগনে'। ব্রিটিশ আমলে এরকম ভয়াবহ বিদ্রোহ পশ্চিম বাংলার আর কোথাও হয়েছে কিনা বলা যায় না। এই বিদ্রোহ 'বগড়ী'র লায়েক বিদ্রোহ বা পাইক বিদ্রোহ এবং ব্রিটিশের ভাষায় 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামেই পরিচিত। আসলে এটা এক ব্যাপক 'গণবিদ্রোহ'। গভর্নর জেনারেলের আদেশে

'ওকোলি' নামে একজন ইংরাজের নেতৃত্বে একদল সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যের গণগনি অরণ্যের নায়েকগণের কিছুদিন যুদ্ধ চললেও পরাজয় হয় নায়েকদের। কারণ, বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহ প্রথমে যোগ দিয়েও পরে নিজের রাজ্য উদ্ধারের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের নেতা অচল সিংহকে। তবু গনগনির আগুন নিভতে সময় লেগেছিল অনেক দিন।

হিজলীকে কেন্দ্র করে মহিষাদল তমলুক-এর নিমকমহাল এলাকায় তখন এদেশীয় মালঙ্গীরা লবণ তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করত। মেদিনীপুরে তখন প্রায় ২৮ লক্ষ মন লবণ তৈরী হত। দ্বারকনাথ ঠাকুরও একসময় তমলুক এসেছেন ইংরেজদের লবণ ব্যবসার দেওয়ান হিসেবে। কলকাতার আরও গণ্যমান্যরা এসেছেন এই ব্যবসায়ে। সরকারী কোষাগারের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারিরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য মালঙ্গীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। বেশী খাটান, কম পয়সা দেওয়া কাজগুলো মালঙ্গীদের মহাজনদের ঋণজালে জড়িয়ে দিত বেশী করে। ১৭৯৩-এর মার্চ-এপ্রিলে জমিদার আর পুলিশের অসহনীয় অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে জেলার দোরোদুমনান পরগণার কিছু মালঙ্গীরা কাজ বন্ধ করে চব্বিশ পরগণার মুড়াগাছাতে আশ্রয় নেয়। পরের বছর ওখানে চলে যায় জেলার আরও পনেরটি পরিবার। নিপীড়ন আর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে এলাকার সকল শ্রেণীর মালঙ্গীরা সংগঠিত করলেন নিজেদের। বীরকূল-এর মালঙ্গীদের নেতৃত্ব দিলেন বলাই কুণ্ডু। তাঁর নেতৃত্বে এলাকার মালঙ্গীরা মিছিল করে কাঁথি গিয়ে তাদের জীবন যন্ত্রণার স্মারকপত্র তুলে দিল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের হাতে। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা তাদের সংকল্প আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮০০-এর ২৯শে এপ্রিল কাঁথি লবণ অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে দাবিপত্র পাঠ করে প্রতিবাদ জানায়। এবারের বিফলতায় সংহত শক্তিতে সুসংগঠিত হয়ে প্রেমানন্দ সরকার নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে শ্রমিকরা লবণ কারখানায় ধর্মঘট করে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে। সল্ট এজেন্ট গ্রেপ্তার করল প্রেমানন্দকে। এতে মালঙ্গীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করল ওরা। সংগঠিত মালঙ্গীদের দমন করতে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানী ইংলণ্ড থেকে লবণ আমদানী করতে লাগল। মালঙ্গীদের দুর্দশা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু ওদের এই আন্দোলন ভারতবর্ষের পরবর্তী শ্রমিক আন্দোলনের উপর এক গভীর ছায়া ফেলে গেছে।

এদেশীয় লোকদের শায়েস্তা করতে না পেরে লায়েক বিদ্রোহের সূত্র ধরে অষ্টাদশ শতকের শেষে কিংবা উনবিংশ শতকের শুরুতেই চন্দ্রকোণা থানার ছত্রগঞ্জ গ্রামের শত শত বিপ্লবীকে একসাথে ফাঁসী দিয়েছিল ইংরেজরা। ছত্রগঞ্জ-এর নাম বদলে হয়েছে 'ফাঁসীডাঙ্গা' যা আজও স্মরণ করিয়ে দেয় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের করুণ ইতিহাস।

আবার ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের ঢেউ লেগেছিল মেদিনীপুর জেলাতেও। এক সিপাহী পল্টনকে বিদ্রোহী করে তোলার অপরাধে মে মাসে এক তেওয়ারী ব্রাহ্মণ

সিপাহীকে মেদিনীপুরের স্কুলের সামনের কেল্লার মাঠে ফাঁসী দিলেন ইংরেজ সরকার। বঞ্চনা আর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুব জেলা এগিয়ে এল সবার আগে। বাংলার অন্যান্য জায়গার মত মেদিনীপুর জেলার দুটি বড় কেন্দ্র ছিল। একটি মেদিনীপুর শহরে যেখানকার নেতৃত্বে ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ এবং হেমচন্দ্র কানুনগো। মেদিনীপুরের এই কানুনগো ভারতের জাতীয় পতাকার উদ্গাতা। অন্যটি তমলুকের রক্ষিতবাড়ির সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের ব্যায়ামাগারে, যেটির কাজ শুরু হয়েছিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এখানেই গড়ে উঠেছিলেন পরবর্তীকালের বিপ্লবীরা - ক্ষুদিরাম বসু, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দাস প্রমুখ। দুই কেন্দ্র থেকে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল সারা জেলায়। আর এই ঢেউ সামলাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েষ্টন সাহেব (১৯০৬-৭) জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে খড়্গপুরের হিজলীতে ৪০০০ বিঘা জমি নিয়ে দক্ষিণ মেদিনীপুর-এর সদরকার্যের বাড়ি তৈরি করলেন। যদিও পরে বাড়িটি হয় 'হিজলী বন্দী শিবির' এবং বর্তমানের আই.আই.টি.।

বারীন ঘোষ-এর নেতৃত্বে খড়্গাপুরের নারায়ণগড়ের কাছে ১৯০৭-এর ৬ই ডিসেম্বরের ভোরে ট্রেনের তলায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে নিহত করার প্রয়াস ব্যর্থ হলেও এর ব্যাপক প্রতিফলন ঘটল পরের দিনের মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে। কয়েকদিন পরের সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে যে দক্ষযজ্ঞ বেঁধেছিল তার রিহার্স হয়ে গেল মেদিনীপুরের ঐ অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় এবং অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে। পরের বছর ১১ই আগস্ট মেদিনীপুরের ক্ষুদিরামের ফাঁসি ভারতে বৃটিশ শাসনের ইস্পাত কঠিন সুদৃঢ় কাঠামো নড়িয়ে দিল।

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই জেলার পূর্বাঞ্চলে জেলারই সুসন্তান বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে সরকার সমগ্র জেলা থেকেই ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিতে বাধ্য হল।

১৯২৭-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী খড়্গাপুরের রেলের শ্রমিকদের প্রতিবাদী আন্দোলন ও ধর্মঘট সারাভারতকে শিল্প আন্দোলনে জুগিয়েছে এক অমোঘ শক্তি। ১৯২৯-এর আইন অমান্য আন্দোলনেও মেদিনীপুর জেলা এগিয়ে। ১৯৩০-এ তমলুকের নরঘাট আর কাঁথির পিছাবনীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলন দিয়ে শুরু। জেলার পরিস্থিতির সামাল দিতে না পেরে ১৯৩১-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রে 'হিজলী বন্দীশালা'র বন্দীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালাল পুলিশ। মারা গেলেন দুজন। ব্যথিত হলেন গান্ধীজি, নেতাজী ও জওহরলাল। অমানবিক এই ঘটনায় ব্যথিত কবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতার এক জনসভায় সভাপতির ভাষণে নিন্দা করেছিলেন। তিনি তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতায় সেই প্রশ্নই রেখেছেন ঃ

'আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।'

ব্রিটিশকে সমঝে দেওয়ার জন্য বিপ্লবীরা পরপর তিনবছরে গুলি করে হত্যা করলেন তিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট - পেডি (১৯৩১), ডগলাস (১৯৩২) এবং বার্জকে (১৯৩৩)।

স্বাধীনতার শেষ পর্যায়ের 'বিয়াল্লিশ' -এর আন্দোলনে এই জেলার ভূমিকাও গৌরবোজ্জ্বল। মূলতঃ জেলার কাঁথি এবং তমলুক মহকুমার নেতৃত্বে এই আন্দোলন। তমলুকের অসামান্যা বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে অবর্ণনীয় নারী নির্যাতন, অকল্পনীয় অত্যাচার এবং সঙ্গে অসহনীয় প্রাকৃতিক রুদ্ররোষকে জয় করে সতীশচন্দ্র সামন্ত ও অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অন্যান্য বিপ্লবীরা নিজেদের বিজয়কেতন উড়িয়ে ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর তমলুকের গণপতিনগরে গড়ে তুলেছিলেন ভারতের প্রথম দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীন সরকার - 'তাম্রলিপ্ত মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় সরকার।' তমলুক তথা মেদিনীপুর জেলার মানুষের দুঃখ কষ্টের সঙ্গী হতে গান্ধীজি মহিষাদলে এসে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন ১৯৪৫—১৯৪৬-এ। ২৮শে ডিসেম্বর জনসভায় জেলার প্রায় ৬০,০০০ মানুষের উপস্থিতিতে তিনি বলেছিলেন 'দুঃখবরণ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না'। অবশেষে ১৯৪৭-এ এল স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার এই লগ্নে পৌঁছতে মেদিনীপুর জেলার মানুষজনকে নানা দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয়েছে। এই জেলার স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হয়েছে । তবুও কিছু ছোট্ট ছোট্ট স্মরণীয় ঘটনা থেকে গেছে অলক্ষ্যে। অথচ খণ্ড খণ্ড ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মিলিত স্রোতই হতে পারে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর বাস্তবতা। সীমিত পরিসরে ঐ সমস্ত কাহিনীর উপস্থাপনায় জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের মোটামুটি একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই বইতে।

তমলুকের বিপ্লবকেন্দ্র রক্ষিতবাটী এবং ক্ষুদিরাম বসু

মহকুমা শহর তমলুকের ভীমার বাজারের দেবী বর্গভীমা-র মন্দিরের ঠিক পাশেরই 'রক্ষিতবাটী'-তে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মোরাদলি খাঁর বিখ্যাত গায়ক ছাত্র কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায় প্রতিদিন ভোর কেটে যাওয়া সকালে কখনও গুরুর সঙ্গে কিংবা একাকী যখন রেওয়াজ করতেন, তখনই পিতার সুরের মোহজালে আবিষ্ট কিশোর যাদুগোপাল জানালায় চোখ রাখতেন ঠিক পাশ দিয়ে কুল কুল করে বয়ে যাওয়া রূপনারায়ণ নদ আর তার 'ঝুমঝুমি'-র চড়ায় বেড়ে ওঠা শরের জঙ্গলে, হোগলা বনে আর বাতাসের মৃদুমন্দ দোলায় কাশফুলের সমারোহে। চোখ রাখতেন নদের চরের বালির উপর খড়হাঁস, গাঙচিল, শ্যামখোল, বেগড়ী, খঞ্জন, চকাচকি, পাণকৌড়ি, মাছরাঙাদের ওপর। এরই ফাঁকে পিঠে টোকা দিয়ে ডাকতেন প্রিয় বন্ধু সুরেন রক্ষিত লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, আর ব্যায়ামের নিত্য অভ্যেস শুরুর জন্য। 'রক্ষিতবাটির' বাড়ি দিয়ে ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যেকার ফাঁকা জায়গায় আখড়ায় মেতে উঠতেন এঁদের সঙ্গে আরও অনেকেই। ব্যায়াম চর্চার আড়ালেই চলত বিপ্লবী কাজকর্মের প্রথম পাঠ।

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনটি পর্যায় — প্রথম ১৭৭২ থেকে ১৮৫৪, দ্বিতীয় ১৮৫৫ থেকে ১৯০৪ এবং শেষ ১৯০৫ থেকে ১৯৪৪। তৃতীয় পর্যায় শুরু বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই পর্যায়ে ইংরেজ রাজত্বকে অস্তগত করে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের শুরুর সংগ্রামী নায়ক নিঃসন্দেহে বিহারের মজঃফরপুরের কিছু দুরের স্টেশন ওয়াইনিতে ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের বদলে দুজন শেতাঙ্গ মহিলাকে হত্যার অপরাধে ধৃত বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, ১৯০৮-এর ১১ই আগষ্ট ফাঁসির রজ্জু গলায় পরার পর গণ্ডকের তীরে যাঁর মহাপ্রয়াণ। বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথায় ঃ "দেশসেবার যজ্ঞবেদীতে স্বার্থলেশহীন আত্মবলিতে যে প্রোজ্জল হোমাগ্নি আজও দেদীপ্যমান, তাতে সবিশেষ সমিধ ও শহিদ হয়েছিল বীরবালক ক্ষুদিরাম"।

১৮৮৯-এর ৩রা ডিসেম্বর তাঁর জন্ম মেদিনীপুরের হবিবপুর অথবা মতান্তরে এই জেলারই কেশপুর থানার মোহবনী গ্রামে। জন্মের অব্যবহিত পরে বোন অপরূপা তিন মুঠি ক্ষুদ দিয়ে কিনে নেওয়ার জন্য নাম ক্ষুদিরাম। ঠিক একশ বছর আগে মেদিনীপুরে অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে বিপ্লবী কার্য্যাবলী, অবশেষে কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যার বদলে

★ প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়ে বাকি অংশটি ০৩-১২-১৯৮৯ তারিখ রাত্রি ৮-৩০ মিঃ ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আকাশবাণী কলকাতা ক কেন্দ্র থেকে লেখক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন।

মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যাকে ভুলবশতঃ হত্যার দায়ে ধৃত ক্ষুদিরামের বিচার ও ফাঁসী ইত্যাদি বিষয়ে বারংবার আলোচনায় আমরা তাঁর জীবনের এক নিটোল চিত্র পেয়েছি তা সবারই জানা। তাই আজ তাঁর জন্মশত বর্ষের পূণ্যলগ্নে এই স্বল্প পরিসরে তাঁর জীবনের এক অনালোচিত দিকেই আমরা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই সেখানে, যেখানে ক্ষুদিরাম দীক্ষিত হয়েছিলেন বিপ্লবী মন্ত্রে।

ইংরেজ বিতাড়নের ষড়যন্ত্রে ১৭৭৫-এ মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী, ১৮৯০ এ আসাম প্রদেশের মনিপুরের চিফ কমিশনার ও অন্যান্য ইংরেজদের হত্যার দায়ে মনিপুর রাজ্যের সেনাপতি বৃদ্ধ থঙ্গল ও মন্ত্রী টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসী এবং ১৮৯৭-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর দিন 'র‍্যাণ্ড' ও 'আয়ার্ষ্ট'কে হত্যার দায়ে মহারাষ্ট্রের দামোদর চাপেকর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর বীরের মরণ বরণ করে ফাঁসী গেলেও আঠার বছর বয়সী ক্ষুদিরামের ফাঁসীই ভারতে বৃটিশ শাসনের ইস্পাত কঠিন কাঠামো নড়িয়ে দিতে পেরেছিল।

তিলকের নেতৃত্বে ও 'লাঠি-সোটা-তলোয়ার' নিয়ে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'গণপতি উৎসব' আর ১৮৯৫-এ শিবাজী উৎসবের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে মহারাষ্ট্র গৌরবময় অতীতকে সামনে রেখে সশস্ত্র বিপ্লব অভিযানের পথ ধরে। রাজদ্রোহিতায় তিলকের এক বছরের কারাদণ্ড ঘোর অমানিশায় একফালি বনজ্যোৎস্নার চাঁদ — সারা দেশ উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল স্বাধীনতা স্পৃহায়। এখানকার গরিমাময় উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত হ'ল বাংলা। উন্মাদিত হয়েছিল আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি'র বারুদখানা মেদিনীপুর। আমরা জানি ১৯০২-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের মাঝে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল বাংলার বিভিন্ন জায়গায়। ঋষি অরবিন্দ বাংলায় গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে — একটি কোলকাতায় আব একটি মেদিনীপুরে।

স্বাধীনতা পিয়াসী বাংলার যুবকদের সুস্থ সবল ও কর্মঠ করে তোলার জন্য ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতার হিন্দু মেলার সময় থেকেই যুবকদের ব্যায়ামচর্চায় অশ্বারোহণে, তরবারি সঞ্চালনে শিক্ষিত করবার কাজ চলছিল। এই প্রচেষ্টার সূত্র ধরেই ১৮৯৭ নাগাদ মেদিনীপুরের তমলুক শহরের রক্ষিতবাটীতে এক ব্যায়ামাগারের কার্যাবলী চলত ঐ বাড়ীরই সন্তান বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের উদ্যোগে, পিতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ত্রৈলোক্যনাথের অর্থানুকূল্যে আর বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা দেশপ্রেমী কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। সঙ্গীত বিশারদ এই লাঠিয়াল উকিলটি কোলকাতা থেকে তমলুকে এসেছিলেন ওকালতির জন্য। রক্ষিতবাটীরই এক অংশে ভাড়াটে ছিলেন তিনি।

রক্ষিতবাটীর সুরেন রক্ষিতের ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম চর্চার আড়ালেই কাজকর্ম চলত বিপ্লবের। এই আখড়ায় বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছিলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পূর্ণ সেন, যোগজীবন ঘোষ প্রমুখেরা। এঁদেরই সঙ্গে আখড়ায় যোগ দিয়েছিলেন নাড়াজোল রাজের শহর তহশীলদার ত্রৈলোক্যনাথ বসুর পুত্র অগ্নিযুগের অগ্নিশিশু বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। পরবর্তীকালে এঁরা প্রত্যেকেই 'আপন আপন শক্তি অনুসারে মায়ের বোধনে (দেশ প্রেমে)

নৈবেদ্য যুগিয়েছেন।' ক্ষুদিরাম যাদুগোপালের কথা বিস্তারিতভাবে আমরা জানি। আলিপুর বোমার মামলার আসামী পূর্ণ সেন, মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যোগজীবন ঘোষকে যেমন আমরা পেয়েছি তেমনই পেয়েছি হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী হিসাবে সন্দেহ করা হয়েছিল যাকে, সেই সুরেন্দ্র নাথ রক্ষিতকে। এখানেই ক্ষুদিরাম বসু লাঠিখেলা ব্যায়াম চর্চার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী কাজকর্মে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন — ভবিষ্যতে বড় কিছু করার দুর্জয় বাসনায় আকাঙ্খিত হয়েছিলেন। এখানেই দীক্ষিত হয়েছিলেন স্বাধীনতার মন্ত্রে।

স্বল্পায়ু ক্ষুদিরামের আট বছরের বিপ্লবী জীবনের প্রথম চার বছর ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত কেটেছে তমলুকের এই আখড়ার অন্তরালের গুপ্তসমিতির কাজকর্মে। পিতামাতাকে হারিয়ে দিদি অপরাজিতার আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা ক্ষুদিরাম তমলুকে এসেছিলেন জামাইবাবুর হাত ধরে। জামাইবাবু অমৃতলাল রায় তমলুক কোর্টের সেরেস্তাদারের চাকরীতে বদলি হ'য়ে এসে পড়াশুনার জন্য ক্ষুদিরামকে ভর্ত্তি করে দিলেন হ্যামিলটন স্কুলের তখনকার সেভেন্থ ক্লাসে। এই স্কুলেই ক্ষুদিরাম বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন বিপ্লবী যাদুগোপালের ভাই ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, পূর্ণ সেন, যোগজীবন ঘোষ এবং সুরেন রক্ষিতকে। এঁদেরই সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আখড়ায় যাতায়াতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন সার্থক বিপ্লবীর পথে।

দিদির আশ্রয়ে বিপ্লবের কাজকর্মে অসুবিধার জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জামাইবাবু অমৃতলাল রায়ের মেদিনীপুর বদলি ক্ষুদিরামের কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ। একদিকে যেমন দিদির আশ্রয় ছাড়লেন, তেমনই পরিপূর্ণভাবে জড়িয়ে নিলেন বিপ্লবী কাজকর্মে—জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো আর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তত্বাবধানে মেদিনীপুরের বিভিন্ন গুপ্ত সমিতিগুলিতে। মেদিনীপুরে চলে এলেও মাঝে মাঝেই চলে আসতেন রক্ষিতবাটীর ব্যায়ামাগারে — লাঠিখেলা শেখাতেন এবং বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতেন নতুন নতুন ছেলেদের। এভাবেই এখান থেকে ঘুরে বেড়িয়েছেন মেদিনীপুরের নানানপ্রান্তে — কখনও মুগবেড়িয়ার নন্দ পরিবারে, কখনও কলাগাছিয়ার জমিদার গিরিশচন্দ্র মাইতির যুবকপুত্র জগদীশ চন্দ্র মাইতিদের অন্যতম জমিদারীর স্থান গোপীনাথপুরের বাগানবাড়ীতে কিংবা সুজামুঠা রাজবংশের গোলকেন্দ্রের তৎকালীন বংশধর কলাবেড়িয়ার বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে, আবার কখনও কিশোরপুর গ্রামের প্রবোধ চন্দ্র দে-র বাড়ীতে। এভাবেই যোগাযোগ চলত তমলুক কেন্দ্রের সঙ্গে কলকাতা আর মেদিনীপুরে ছড়িয়ে থাকা নানান গুপ্ত কেন্দ্রগুলির সাথে।

দুর্জয় সাহসের অধিকারী কিশোর ক্ষুদিরাম পরবর্তী চারবছরের বিপ্লবী জীবনের গৌরবময় অধ্যায় কাটিয়ে কিংসফোর্ড হত্যায় ব্যর্থ এবং এর বদলে নিরীহ মানুষকে হত্যার আত্মগ্লানিতে জর্জরিত অপরাধবোধে নিজের দোষ স্বীকার করে ফাঁসির দড়িতে চুমু খেলেন হাসতে হাসতে। মুক্তি সংগ্রামের পুরোধা, বীরত্ব, ত্যাগ আর সহনশীলতায় সশস্ত্র ও অহিংস বিপ্লবীদের কাছে আদর্শ ও প্রেরণার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। যুবশক্তির কাছে অনির্বাণ প্রেরণার উৎস তিনি।

বিপ্লবী জীবনের বন্ধু সুরেন রক্ষিতের বংশধরেরা আজও শ্রদ্ধায় স্মরণ করে এই মহাজীবনকে ঃ

"ক্ষুদিরাম গেয়ে গেল সারা জীবনের জয়গান
সেই দামাল ছেলে অগ্নিযুগের অগ্নিশিশু
হে বীর ক্ষুদিরাম তোমার ক্রীড়াভূমি
এই "রক্ষিতবাটী"
আপামর জনগণের সাথে
তোমায় আজও স্মরণ করে"

এঁদেরই সঙ্গে আমরাও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এই বীর বিপ্লবীকে, আর স্মরণ করি রক্ষিতবাড়ির এই ব্যায়ামাগারের বিপ্লব কেন্দ্রটিকে — যেখান থেকে দেশ উপহার পেয়েছিল কয়েকজন সশ্রদ্ধ বিপ্লবী বীর সন্তানদের।

নারায়ণগড়ের সেই ট্রেন দুর্ঘটনা

ছোটলাট অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারকে নিয়ে ওড়িশা থেকে হাওড়ার দিকে আসছে স্পেশাল ট্রেন। ওড়িশার দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় ত্রাণের কাজ পরিদর্শন সেরে ১৯০৭-এর ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার ট্রেনে চড়ে কলকাতায় ফিরে আসছেন লাট সাহেব। মধ্যরাত্রির শীতের নিশ্চুপ জমাট অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি এগিয়ে আসছে হিস্‌হিস্ শব্দ তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে। রাত্রি ২টা থেকে ৩টার মধ্যে গাড়ি নারায়ণগড় পেরিয়ে (আন্দাজ ২ মাইল দূরে) খড়্গপুর জংশনের দক্ষিণে ১০ মাইল দূরের স্টেশন বেনাপুর-এ ঢোকার কিছু আগেই রেলের লাইনে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। চালকের মনে হল ইঞ্জিনটি ছোঁড়া হয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হল না। ঈশ্বরের পরম করুণায় দৈবগুণে বিপ্লবীদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে তৃতীয়বারের জন্য অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার।

এরও আগে দু-দুবার বোমা ব্যবহার করে রেলের লাইনে 'মাইন' পেতে ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। প্রথমবার ১৯০৭-এ শরৎ-এর পূজাবকাশে বাংলার 'সামার ক্যাপিটাল' দার্জিলিং-এ ব্যর্থ হয়েছে বিপ্লবী সরকারী কর্মচারি চারুচন্দ্র দত্তের প্রয়াস। পরের বারের চেষ্টা চন্দননগরের দক্ষিণে মানকুণ্ডু রেলস্টেশনের কাছে, ফ্রেজার যখন ১লা নভেম্বর দার্জিলিং থেকে কলকাতা ফিরে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিয়ে বিহার পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন সেই সময়। যাওয়ার সময় রেলের লাইনে ডিনামাইটের ষ্টিক ছড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটালেও ট্রেন চলে যায় নিজের গতিতে। আবার ফিরবার পথেও একই জায়গায় একই কায়দায় ব্যর্থতা।

মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ের কাছে তৃতীয়বারের জন্য এই বিস্ফোরণের ব্যর্থতা বিপ্লবী কাজকর্মে এক নিদারুণ যন্ত্রণার কথা। এত শক্তিশালী বোমা ব্যর্থ হবে ভাবাই যায় না। কত কষ্ট করেই না উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরীর ব্যাপারটি আয়ত্ব করেছিলেন। অবশ্য দার্জিলিং-এ প্রথম ব্যবহার করবার আগে যে বোমা ব্যবহার করা হয়নি এমন নয়। ১৯০৭-এর ৬ই মে 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় বোমার ব্যাপারে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখলেন ঃ

> "এটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার এই যে এক ধরণের উন্নতমানের বোমা তৈরী হয়েছে। এর নাম 'কালি মাই'-এর বোম (মা কালির বোম)। এটির পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং সফলতাও লাভ করেছে এবং এটা প্রতিটি বাড়িতেই রাখা উচিত। এই বোমা এতই হাল্কা যে, যে-কেউ হাতে করে নিয়ে অনায়াসেই ঘুরে বেড়াতে পারবে। এতে আগুন ধরানোর প্রয়োজন হয় না। হাতের জোরে ছুঁড়ে দিলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাটি কেঁপে উঠবে।... প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে ছেলে দরকার যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করবে।"

বিশ শতকের শুরুতেই বিপ্লবী কাজকর্ম জোরদার হতে থাকে। বিশেষ করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। প্রথম প্রথম বোমা বানান হত 'সেফটিম্যাচ' তৈরীর উপাদান থেকে। পরে পরে আরও শক্তিশালী বোমা উদ্ভাবন করার কৌশল আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলো যুবকেরা। প্রথম সফল হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র উল্লাসকর দত্ত। উদ্ধত এক ব্রিটিশ অধ্যাপককে জুতো ছুঁড়ে উল্লাসকর কলেজ ছেড়ে বোম্বাইতে গেলেন। সেখানে টেক্সটাইল নিয়ে পড়াশুনার সময় 'যুগান্তর' পত্রিকার কিছু কবিতা পড়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন বোমা তৈরী করার। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পিতার গবেষণাগারে বোমা তৈরীর কৌশল আয়ত্ব করে গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করে বিপ্লবী ছাত্র-যুবকদের তাঁর গবেষণাগারে ডেকে এনে দেখালেন তাঁর উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার ফসল। সেদিনটা ১৯০৭-এর অক্টোবরের কোন এক দিনের সন্ধ্যা। একটা শিশিতে ডিনামাইটের আকর নাইট্রোগ্লিসারিন। অন্য একটা শিশিতে পিকরিক অ্যাসিড থেকে তৈরী বোমার বিস্ফোরক পারদের রশ্মি। সুগায়ক উল্লাসকর বিপ্লবী দলের বোম স্কোয়াডের প্রধান হয়ে উঠলেন।

উল্লাসকরের তৈরী সেই 'বোমা' ও 'ডিনামাইট'-কে ব্যর্থ করেছিল অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের ভাগ্য। দার্জিলিং আর মানকুণ্ডু স্টেশনের ব্যর্থতায় বিপ্লবীরা বুঝলেন লাটসাহেবের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ট্রেনকে উড়িয়ে দেবার জন্য নিশ্ছিদ্র আঁটোসাটো পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য চারুচন্দ্র দত্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বুঝিয়ে ১০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন বোমা নিক্ষেপের সফল প্রয়োগের প্রয়োজনে।

কথা যা কাজ তা। অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার পরিকল্পনা হল — ভারতের বিপ্লব তীর্থ মেদিনীপুরে। ঋষি রাজনারায়ণের ভাইপো সত্যেন্দ্রনাথ বোস তখন এক গুপ্ত সমিতি চালাচ্ছেন মেদিনীপুরে। খবর পাওয়া গেল ভ্রমণ পিপাসু ফ্রেজার পরিকল্পনা করেছেন ওড়িশার বিপদসঙ্কুল জায়গা পরিদর্শনের। উল্লাসকর ৬ পাউণ্ড ডিনামাইট একটি লোহার কড়াইতে রেখে একটি বিস্ফোরক 'মাইন' তৈরী করলেন। সঙ্গে থাকল পিকরিক অ্যাসিড থেকে তৈরী বোমার বিস্ফোরক রশ্মি। দলীয় বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকি আর বিভূতি সরকার নভেম্বরের শেষ কি ডিসেম্বরের শুরুতে পুরী প্যাসেঞ্জার ধরে খড়্গপুর পেরিয়ে বেনাপুরে নামলো। সেখান থেকে হেঁটে দক্ষিণে আরও চার মাইল এগিয়ে নারায়ণগড়-এ খুঁজে পেলেন নিরাপদ স্থান। রেলের এক সিগন্যালারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে এখানে স্পেশাল ট্রেন পাশ করবার সময় গভীর রাত্রি। রাত্রি ৯টার দিকে রেলের লাইন আর কাঠের স্লিপার-এর সংযোগ স্থলের নীচে গভীর গর্ত করে রাখলেন প্রায় ৫ ঘন্টার পরিশ্রমে। হালকাকরে মাটি বুজিয়ে ফিরে এলেন কোলকাতায়।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখে তিনজনে আবার নারায়ণগড়ে পৌঁছলেন। সঙ্গে ডিনামাইট আর বিস্ফোরক পারদের রশ্মি একটি ব্যাগে এবং সংযোগকারী দাহ্য বস্তুকে ভালো করে তুলো জড়িয়ে জুতোর বাক্সে রাখলেন। আগের তৈরী গর্তের মধ্যে ওরা মাইন পুঁতেছিল।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ট্রেন এল না। ভোরের বেলায় তিনজনে চলে এলেন খড়্গাপুরে। দাহ্য পদার্থগুলো সমেত বিভূতি আর প্রফুল্লকে খড়্গাপুরে রেখে বারীন চলে এলেন কলকাতায়। কিন্তু 'ইংলিশম্যান'-এর এক খবরে ফ্রেজার ৫ তারিখ ওড়িশা থেকে ফিরবেন জানতে পেরে বারীন ঐদিন বিকেলে বিভূতি আর প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন ঘটনার কেন্দ্রে। রাত্রি ১১টার মধ্যেই পূর্ব নির্দ্ধারিত জায়গায় 'মাইন' পুঁতে বারীন চলে এলেন নারায়ণগড়ে, হাওড়ার শেষ ট্রেন ধরবার জন্যে। বারীনের ট্রেন চলে যাওয়ার পর ওরা দুজন মাইনে সংযোগকারী বিস্ফোরক পদার্থ লাগিয়ে চলে এলেন খড়্গাপুরের দিকে।

ফ্রেজারকে নিয়ে এগিয়ে আসা ট্রেন লাইনের নীচে রাখা 'মাইন' এর উপর চাপ দিতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। ভীত সন্ত্রস্ত আরোহীরা গাড়ি থেকে নেমে দেখলেন রেলের লাইন তারের মত বেঁকে গিয়েছে। বিস্ফোরণের তোড়ে স্লিপারগুলো টুকরো টুকরো হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে। অনুসন্ধানকারী দল বুঝলেন কি সাঙ্ঘাতিক ধরণে: বুদ্ধি আর কলাকৌশলের সাহায্যে বানানো হয়েছিল এই মাইন।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবার বেঁচে গেলেন অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার। চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেদিনীপুরের পুলিশ লাইন। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনবার মতো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন জেলার পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট মহামান্য মৌলবি মহযারুল হক। পরদিন সকালে (১) নেপাল দোলই, (২) তারু দোলুই, (৩) গোপাল দোলই, (৪) গুপি দোলই, (৫) কুমেদ বারিক, (৬) শিবু দাস, (৭) ফকির দাস, (৮) উমেশ দোলই নামের রেলের এই কর্তব্যরত কুলিদেরকে গ্রেপ্তার করে সদরে চালান দিলেন বিচারের জন্য। বিচার করবেন জেলা জজ ফরেস্টার সাহেব। তুর্কার জমিদার চৌধুরী রাধাগোবিন্দ পাল আর অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টারকে অ্যাসেসার হিসেবে নিয়ে সরকার পক্ষের মামলা চালাতে কোলকাতা থেকে নিয়ে আসা হল আপটন সাহেবকে। তাঁর সঙ্গী স্থানীয় সরকারী উকিল যোগেন্দ্রনাথ হালদার। আসামীদের তরফে দাঁড়ালেন মেদিনীপুরের ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। শাসমলকে সাহায্য করলেন স্থানীয় দুই উকিল— বরেন্দ্রনাথ দেব এবং উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। উভয় তরফে চলল জোর লড়াই। আবার পুলিশের ডেপুটি হক সাহেবও থেমে নেই। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচালনায় গুপ্ত সমিতির আখড়ার উদ্যোগেই এমন একটি ধ্বংসের ঘটনা হয়েছে আন্দাজ করেছিলেন। আন্দাজ সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য হক সাহেব গুপ্ত সমিতির আখড়ার লাঠি খেলার শিক্ষক এবং সত্যেন বসুর সাকরেদ হাজী আবদার রহমানকে হাত করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি দিয়েছিলেন। বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে আবদার রহমান নারায়ণগড় দুর্ঘটনার পরিকল্পনার কথা জেনে নেয় সত্যেন বসুর কাছ থেকে। এমনকি সত্যেন বসুর কাছ থেকে একটা রিভলবার নিয়ে হক-কে দিল। পরে আবার ওয়েষ্টনকে মারবার জন্য বোমা চাইলে সত্যেন বসু কোলকাতার আত্মোন্নতি, অনুশীলন সমিতি সহ অন্যান্য সমিতির ঠিকানাও দিয়ে দিলেন। অরবিন্দ-র গোপন তথ্য সমেত গোপন সমিতির সমস্ত খবর রহমান জানিয়ে দিল হক-কে। হক খবর পাঠালেন কোলকাতায়। কিন্তু কোলকাতার বিচক্ষণ পুলিশ কমিশনার এফ. এল. হ্যালিডে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে এবং

বিপ্লবীরা যাতে কোলকাতায় আগাম সতর্ক হতে না পারে তার জন্য কোন অ্যাকশন না নেওয়াই সঙ্গত মনে করলেন। শুধুমাত্র গোয়েন্দা বিভাগকে আরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিলেন। ফলে দুর্ঘটনার প্রকৃত অপরাধী কারা তা প্রকাশ না হওয়ায় বন্দী রেলের নয়জন কুলির অবস্থা হয়ে উঠল আরও ভয়াবহ। সরকার পক্ষ আর আসামী পক্ষের চাপান উতরান চলল। তবু বুদ্ধিমান ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের যুক্তিজালে অ্যাসেসারদের মধ্যে মুসলমান পুলিশ অফিসার বললেন আসামীরা সকলেই নির্দোষ। অন্য অ্যাসেসার চৌধুরী রাধাগোবিন্দ পাল শুধুমাত্র নেপাল দোলইকে দোষী বলে অভিযুক্ত করলেন। কিন্তু জেলা জজ ফরেষ্টার সাহেবের ফতোয়া হল অন্য রকম। তিনি তাঁর রায়ে বললেন :

> 'শিবু রাজসাক্ষী সুতরাং তাকে ক্ষমা করা হল। অন্য আসামীদের মধ্যে একমাত্র উমেশ দোলই নিরপরাধ বলে মুক্তি পেল। অবশিষ্টের মধ্যে নেপাল পেল ১০ বৎসরের জন্য নির্বাসিন দণ্ড। গুপি দোলই ও কুমেদ বারিকের হ'ল ৭ বৎসর হিসাবে এবং তারু ও ফকির দাসের ৫ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হল।'

বিচারের রায়ে নারায়ণগড় দুর্ঘটনার অন্যতম হোতা মানিকতলার মুরারিপুকুর মামলার ধৃত অন্যতম আসামী বারীন ঘোষ নিরপরাধ ব্যক্তিদের জেল হওয়ায় বিবেকের দংশনে পিষ্ট হয়ে বললেন, "যদি আমরা আমাদের বৈপ্লবিক কার্যাবলী বিবৃত না করি তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এই বৈপ্লবিক কার্যাবলী মিলিয়ে যাবে। যদি আমরা সমস্ত প্রকাশ করে দিই তবে আমরা ফাঁসী গেলেও আমাদের বৈপ্লবিক আয়োজন বেঁচে থাকবে। দেশের লোক আমাদের পরে কাজ ক'রে আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে তুলবে।" তাই তিনি নারায়ণগড় ঘটনার প্রকৃত তথ্য ফাঁস করে দিলেন। বারীনের বিবৃতিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নারায়ণগড় মোকদ্দমার নথি আনিয়ে পড়লেন। আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনলেন। মিথ্যার জালে আটক নিরপরাধ কুলিদের মুক্তির নির্দেশ দিলেন।

নারায়ণগড়ের এই ব্যর্থ প্রয়াস পরবর্তী অধ্যায়ে কতটা ছাপ ফেলেছিল সেটা আবার আলোচনার বিষয়। একটা কথা অনায়াসে বলা চলে ৫ই ডিসেম্বর মধ্য রাত্রির অতর্কিত এই ঘটনা পরের দিন ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে কংগ্রেসের মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন একটা আলাদা মাত্রা পায়। সেদিন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে উদারপন্থীরা যেমন উপস্থিত, তেমনই উপস্থিত অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে চরমপন্থীরা। চরমপন্থীরা দাবী করলেন উদারপন্থী সভাপতি ব্যারিষ্টার কে.বি.দত্ত স্বরাজের পক্ষে ভাষণ দিন। লাগলো দারুণ গণ্ডগোল। উদারপন্থীরা অরবিন্দকে সভায় গণ্ডগোল থামাতে অনুরোধ করলেন। চরমপন্থীরা সম্মেলন বয়কট করে পরের দিন আলাদা করে মিটিং করলেন। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ-এর কথায় 'উভয়পক্ষের রেষারেষি এই শুরু'। মেদিনীপুর সম্মেলনের কয়েকদিন পরে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে যে দক্ষযজ্ঞ বেঁধেছিল, মেদিনীপুরে তার রিহার্স হয়ে গেল।

স্মরণীয় নাম বরণীয় নাম ঃ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

"জীবিতাবস্থায় আমি যে শির কাহারও নিকট অবনত করি নাই, মৃত্যুর পরেও যেন আমার সেই শির অবনমিত করা না হয়' —কথাগুলি মৃত্যুর কয়েক বছর আগে উইলে লিখে গিয়েছিলেন নির্ভীক, তেজস্বী চিরোন্নত শির দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। আমাদের দেশের মনীষীরা মৃত্যুর পরে প্রকৃত সম্মান পেয়ে থাকেন। কিন্তু দেশপ্রাণের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে — কি জীবদ্দশায় কিংবা মহাপ্রয়াণের পরে তিনি তাঁর যথোচিত সম্মান পাননি। বীরেন্দ্রনাথ আজ অবহেলিত। চিরবিদ্রোহী বীরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা যখন তাঁকে সম্মানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিচ্ছে ঠিক তখনই দেশের তদানীন্তন নেতৃবর্গ চক্রান্ত করে বঞ্চিত করেছে তাঁকে বারে বারে। হয়তো আজও সেই চক্রান্তের নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে — ভুলতে বসেছি তাঁকে আমরা। অথচ 'বীরেন্দ্রনাথের যে রকম অসাধারণ কর্মশক্তি, অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, গভীর চিন্তাশক্তি, সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, দুর্জ্জয় সাহস ও সত্যের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ ছিল, তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র ভারতেরও নেতৃত্ব করিবার অধিকারী ছিলেন।' বীরেন্দ্রনাথের অকাল মহাপ্রয়াণের পর জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের এক সংখ্যায় লিখেছিলেন ঃ

> "In 1920, we had worked together and later on, alongwith others. I had welcomed him as the Coming Man in Bengal. We expected uncrowned king of Midnapore to be the uncrowned King of Bengal too."

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় চণ্ডীভেটি গ্রামের শাসমল পরিবারে বীরেন্দ্রনাথের জন্ম। স্কুলের পড়া শেষ করে এফ.এ. পড়ার জন্য এলেন কলকাতায়, ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। বিদ্যাসাগর থেকে এলেন রিপন কলেজে। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময়ই স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হলেন। নিজেও ভাবতেন কি ক'রে সুরেন্দ্রনাথের মত একজন বাগ্মী হ'বেন, দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্য্য লাভের জন্যই বীরেন্দ্রনাথ এলেন রিপন কলেজে, যেখানে সুরেন্দ্রনাথ পড়াতেন ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস। এই কলেজের ছাত্রাবস্থায়ই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে সারা বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হয়েছিলেন এবং মেদিনীপুরের নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। ঐ বছরই কলকাতায় সারা ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হ'লেন। এই রিপন কলেজে পড়াশুনার সময় তিনি ভেবেছিলেন ভালো রাষ্ট্রনৈতিক নেতা হ'তে গেলে এবং দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হ'লে আইন সম্বন্ধে পঠন পাঠন দরকার।

বাড়ীর সম্মতি আদায় ক'রে ইংলন্ডের পথে পাড়ি দিলেন ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য। বিদেশে সদাই চিন্তা করতেন কিভাবে দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করবেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনায় বীরেন্দ্রনাথের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সবাইকে মুগ্ধ করতো — ইংরেজ বন্ধুবান্ধবরা বলতেন 'Black Bull of India', 'ভারতীয় কালো ষাঁড়'। বার-এ্যাট-ল হ'বার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করলেন গণতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন ক'রে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করলেন। কখনও কলকাতা আবার কখনও মেদিনীপুর কোর্টে প্রাকটিস করতেন। কর্তব্যবোধে কখনও ছাড়তে হয়েছে প্র্যাকটিস। সফল ব্যারিষ্টার হিসাবে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার বাইরে। সফল আইন ব্যবসায়ী হলেও বীরেন্দ্রনাথ একজন দেশপ্রেমী। জনগণের দুর্দশায়, তাদের সুখে-দুঃখে একাত্ম হ'তে বীরেন্দ্রনাথের মত এমন করে বোধ হয় আর কেউ পারেন নি। গ্রামাঞ্চলের মানুষও আপনজন ভাবত বীরেন্দ্রনাথকে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে স্বদেশী আন্দোলন হ'ল মেদিনীপুরে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। ১৯০৬ খীষ্টাব্দে তাঁরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মেদিনীপুরে মেদিনীপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ ঘোষের মত রাষ্ট্রনেতারা। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিং-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে মেদিনীপুরের প্রতিনিধি বীরেন্দ্রনাথের ইচ্ছায় পরের বছর ফজলুল হকের সভাপতিত্বে সম্মেলন বসেছিল মেদিনীপুরে। ১৯২০-র সেপ্টেম্বরে কলকাতায় বসল সারা ভারত রাষ্ট্রীয় সম্মেলন — সভাপতি লালা রাজপত রায় আর খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ। এই সম্মেলনেই গান্ধীজির অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার পক্ষে সমর্থন করলেন বীরেন্দ্রনাথ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি বঙ্গীয় স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'লে কিছু কংগ্রেসীর অসুবিধার ফলে তারা চিত্তরঞ্জনকে দেশপ্রাণের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করে তুললেন। তাই 'পরে একদিন চিত্তরঞ্জন শাসমলকে বললেন— ২৫ লক্ষ টাকার ফান্ডে তোমার একার থাকা উচিত নয়। কলকাতার একজন কায়স্থ, একজন মারোয়াড়ী ও একজন মুসলমান থাকা ভাল।' ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বীরেন্দ্রনাথ পদত্যাগ করলেন। বস্তুত এই সময় থেকে হ'ল তাঁর বঞ্চিত হবার পালা।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠল। সরকার মেদিনীপুর জেলাতেই পরীক্ষামূলকভাবে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করেছিল। বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চলল বীরেন্দ্রনাথের। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হ'লেও পরে কলকাতার কংগ্রেসের কার্যকরী সংস্থা তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেই প্রস্তাব বাতিল করে দিল। এমনকি অন্য কোন জেলার নেতারাও প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না। সত্যি কথা বলতে কি তদানীন্তন কংগ্রেসীরা

বুঝতে পেরেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ যদি এই আন্দোলনে সাফল্যলাভ করেন তাহলে তাঁকে কংগ্রেসে একটি বিরাট জায়গা ছেড়ে দিতে হ'বে — তাই তারা সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন নি। কিন্তু নির্ভীক বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলাবাসীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। শুরু হ'ল তাঁর আন্দোলন। প্রকাশ্য সম্মেলনে সহস্র সহস্র লোক শপথ নিল — 'ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেবো না'। কেউ একজনও ট্যাক্স দিল না। বাধ্য হয়েই কর আদায়কারীরা করদাতার সমস্ত মালপত্র ক্রোক করল। ক্রোকের সমস্ত মাল হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন একটিও গাড়ী পাওয়া গেল না, তখন সেগুলি নিলামে বিক্রয় করার কথা ভাবতে লাগলেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কেউ যখন কিনল না তখন বাধ্য হয়েই ফিরিয়ে দিল সমস্ত সম্পত্তি। বঙ্গীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাধ্য হয়েই একদিনে ২৩৫টি ইউনিয়ন বোর্ড মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই সংগ্রাম গান্ধীজির প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম সফল অভিযান। তাই 'যখন কংগ্রেসের পক্ষ হ'তে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কোন কল্পনাই করা হয় নাই তখন বাংলাদেশের মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল হইল।' এই আন্দোলন এক অর্থে মেদিনীপুরবাসীর অভিমতের সঙ্গে প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারের আইনের সংগ্রাম।

এই আন্দোলনের সাফল্যের পরে (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই) চিত্তরঞ্জন দাস বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নির্বাচনের কথা বীরেন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিলেন। নভেম্বরের ১৭ তারিখে ইংলন্ডের যুবরাজের ভারত আগমনে সারা দেশে হরতাল পালন করা হ'ল — ফলশ্রুতি হিসেবে জেলে গেলেন স্বরাজ্যপার্টির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস ও সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি গেলে প্রায় ২ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'দেশপ্রাণ' আখ্যায় ভূষিত করলেন বীরেন্দ্রনাথকে।

'দেশবন্ধুর' স্বরাজ্যদলের সম্পাদক পদপ্রাপ্তির সাথে সাথেই স্বরাজ্যদলের মুখপাত্র 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার অন্যতম ডিরেক্টর হলেন দেশপ্রাণ। স্বরাজ্য দল থেকে ব্যবস্থাপক সভা এবং স্বায়ত্ব শাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রবেশাধিকার ছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হ'য়ে জেলার প্রভূত উন্নয়ন করলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করলেন নির্বাচনের মাধ্যমে। তিনি তমলুক-কাঁথি যুক্তকেন্দ্র আর ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবার উভয়কেন্দ্রেই জয়লাভ করলেন। ব্যবস্থাপক সভায় বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বরাজ্যদলের হুইপ।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল চিত্তরঞ্জন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হ'লে স্বরাজ্য দলের এক সভায় কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদের জন্য বীরেন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেন রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমর্থন করেন নাসিম আলি। প্রধান কর্মকর্তার পদ পেলে ৫০০ টাকা মাইনেতে কাজ করবেন কথাটা চিত্তরঞ্জনের কানে

এলে তিনি বলেছিলেন বীরেন দরখাস্ত করলে আমি বাঁচি। অথচ ভোটের ফল যখন বের হ'ল তার ফলাফল জানাতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের কলকাতা পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

> 'On the command of Mr. C. R. Das, the Mayor, the Swarajist in the Calcutta Corporation at the meeting last week elected Mr. Subhas Chandra Basu, his well-behaved disciple, as Chief Executive Officer on Rs. 1500 per mensem'...So the strong man of Midnapore was pushed out of the way to make room for the Ex-Civil Servant who boldly left the celestials to became a non-co-operator".

আর সুভাষবাবুর এই নিয়োগের কথা চিত্তরঞ্জন একটা চিঠির মারফৎ জানিয়ে দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথকে। যে বীরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তমলুক-কাঁথির যুগ্ম কেন্দ্রটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই চিত্তরঞ্জনের এই হ'ল ন্যায় বিচার বীরেন্দ্রনাথের প্রতি। 'স্বরাজ্য দলের বিশিষ্ট কর্মী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন যে, মফঃস্বলবাসী একজন কলিকাতা নগর সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বময় কর্তা হইবে কলিকাতাবাসী অনেকের ইহা মনঃপুত হইল না।' ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বীরেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে এলেন। বাংলার রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বীরেন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার একস্থানে তিনি লিখেছিলেনঃ 'আপনার Public life (জনসেবার ক্ষেত্রে) হইতে বিদায় গ্রহণ দেশের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্য। কলিকাতা কর্পোরেশনের Chief Executive Officer এর পদ আপনারই প্রাপ্য জানিতাম। কিন্তু স্বরাজ্য দলের কি অভিসন্ধি ছিল জানি না। আপনাকে চালাকী করিয়া ignore করিল।'

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র বোস-সহ অন্যান্য নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ায় নিজেও একদিন গ্রেপ্তার হওয়ার কথাটা জেনে চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকে লিখলেন ঃ "We are now face to face with a crisis and want you badly. I expect you to forgive and forget and rise to the occasion. I may be taken away any day. Now that the conservatives have come in to power. Bengal expects you to lead." কিন্তু বিপ্লববাদীদের সঙ্গে মিলিত হ'তে হ'বে ভেবে গেলেন না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি স্বরাজ্য দলের সদস্যপদ ও বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু মতপার্থক্য সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জনকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করতেন। ১৯২৫-এর ১৬ জুন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর গান্ধীজি বীরেন্দ্রনাথকে চিত্তরঞ্জনের জায়গায় মনোনীত করলেও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ষড়যন্ত্রের ফলে বীরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মনোনয়ন না নিয়েই জিতলেন এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিলে প্রজাদের অনুকূলেই ভোট দিলেন। ঐ বছরের শেষে বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কংগ্রেস মেদিনীপুর লোকাল বোর্ড সমূহের নির্বাচনের ৭৮টি সদস্য পদের ৭৭টি এবং জেলা বোর্ডের ২২টি আসনের ২২টি পদেই জয়লাভ করল। শাসমল সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে দ্বিতীয়বার চেয়ারম্যান নির্বাচিত

হ'লেন। পরে সরকার অবশ্য মনোনয়ন দিয়েছিলেন নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁনকে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে মে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনের সভাপতি হ'লেন বীরেন্দ্রনাথ। ঐ বছরের প্রবল বন্যায় মেদিনীপুরের গ্রামবাসীদের পাশে থাকলেন তিনি। ঐ বছরই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস কমিটি বীরেন্দ্রনাথকে মনোনয়ন দিলেও কংগ্রেসের তৎকালীন নির্বাচন সমিতির সম্পাদক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মনোনয়ন দিয়েছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু দেবেন্দ্রলাল খাঁনকে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শাসমল পুনরায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক হ'লেও পূর্বতন বিপ্লবীদের চাপে পদত্যাগ করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার লাহোর সম্মেলনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পাস হ'ল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হল বাংলার আন্দোলন। চলল বৃটিশ রাজশক্তির অত্যাচার। কংগ্রেস কমিটির একটি কমিশনের সদস্য হওয়ার অপরাধে এবং তিনি মেদিনীপুরে থাকলে জনজাগরণ জোরদার হ'বে এই আশংকায় মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক ১৪৪ ধারা জারী করে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মেদিনীপুর প্রবেশ নিষেধ করলেন। অন্যদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ; অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি বিপ্লবীর হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে আসামী পক্ষ সমর্থন করে তাদের নির্দোষ প্রমাণ করে নিশ্চিত ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা করলেন। ১৯৩১-এ সরকার বিদ্রোহী মেদিনীপুরকে দুইভাগ করার কথা ঘোষণা করলে বীরেন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে নামলেন। প্রত্যেকটি সভায় ঘোষণা করলেন, "I won't allow any Government to cut off any limb of mother Bengal, If it occurs, it will occurs over my dead body."

১৯৩৩-এর কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচনে ২৭ নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটির মনোনয়নে শাসমল ৪২ বৎসরের সদস্য রামতারণ ব্যানার্জীকে হারিয়ে জিতলেন। হ'লেন অল্ডারম্যান এবং চেয়ারম্যান হ'লেন মেয়র নির্বাচন কমিটির। হিন্দু-মুসলিম প্রীতির জন্য তিনি একজন মুসলমানকে মেয়র নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের জন্য তা আর হ'ল না।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্বাচন হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর অনুরোধে কংগ্রেস জাতীয় দলের মনোনয়ন নিয়ে বর্দ্ধমান বিভাগের অমুসলমান কেন্দ্র থেকে দাঁড়ালেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের মনোয়ন নিয়ে শাসমলের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন মেদিনীপুরের উকিল মন্মথ নাথ দাস। ভোটের ফল বেরুল ১৯শে নভেম্বর। বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন বীরেন্দ্রনাথ। বিরুদ্ধবাদীদের বোধ হয় সহ্য হ'ল না। ঐ দিন যখন তিনি মেদিনীপুরে কোর্টের কাজ সেরে ট্রেনে করে কলকাতা আসছিলেন তখন খড়্গপুর ষ্টেশনে কিছুলোক এসে বললেন,— 'আপনি হেরে গিয়েছেন ভোটে'। কথাটি শুনেই আক্রান্ত হ'লেন থ্রম্বসিসে। হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে হাওড়া অভিমুখে ট্রেন

ছুটল। হাওড়ার প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে প্রিয় নেতা বিজয়ী দেশপ্রাণকে ভোটের সাফল্যে অভিবাদন জানাতে। শাসমল বুঝলেন তিনি হারেন নি, — দেশসেবার সুযোগ তিনি পাবেন। কিন্তু না, কয়েকদিন পরে ২৪শে নভেম্বর মধ্য রাত্রে মহাপ্রয়াণ ঘটল মহানায়কের। নিজের বাসনা অনুযায়ী তাঁর চির উন্নত শির উর্দ্ধ দিকে রেখেই কলকাতার আদি গঙ্গার তীরে কেওড়াতলা মহাশশ্মানে তাঁর নশ্বর দেহ ভষ্মীভূত করা হয়। বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের একাংশে স্থান পেয়েছে ঃ "In him Bengal has lost a towering personality who alone was able, if any Bengali is able, to restore the position of the province in the Councils of India".

এহেন ব্যক্তিত্বের অধিকারী দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জন্ম শতবার্ষিকী কেটেছে ১৯৮০-র ২৬শে অক্টোবরে প্রায় নিভৃতে। ২০০১-এর ২৬শে অক্টোবর পেরিয়ে যাওয়া শতবর্ষের আমরা কি একটু ঘ্রাণ নিতে পারি? স্মরণ করতে পারি কি দেশপ্রাণকে?

আইন অমান্য আন্দোলনে জেলা মেদিনীপুর

১৯২১এ 'বেঙ্গল কাউন্সিল'-এর নির্বাচনে মেদিনীপুরের দেবেন্দ্রলাল খাঁন-এর কাছে হেরে গিয়ে কংগ্রেস ছাড়লেন 'বাংলার কালো ষাঁড়' বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। ১৯২৮-এ বেঙ্গল ভলান্টারী গ্রুপের সদস্যরা মেদিনীপুর জেলায় আগত 'সাইমন কমিশন'-এর বিরুদ্ধে জোর বিক্ষোভ দেখাল। ১৯২৯এর ১৩ই সেপ্টেম্বর যতীন দাস লাহোর সেন্ট্রাল জেলে মারা গেলেন। ব্যাপক হরতাল পালন করা হল মেদিনীপুরে। কংগ্রেসে যোগদান করে সুভাষচন্দ্র বসু ডিসেম্বরে মেদিনীপুরে এসে বি. ভি. গ্রুপের এক সভায় বক্তব্য পেশ করলেন। ৩১শে ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল ঐ দিন মধ্য রাত্রি থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য। দুদিন পরেই ১৯৩০-এর ২রা জানুয়ারী 'কংগ্রেস ওয়ার্কি কমিটি' সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল যে ঃ

> "পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার বার্ত্তা ভারতের দূর গ্রাম গ্রামান্তরে বহন করিয়া লইবার জন্য এই সমিতি ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী দেশব্যাপী স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালন করা হইবে, — এই ঘোষণা করিতেছেন।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণায় আরও বলা হল যে,

> "উহা দেখিয়া আমরা মনে করি যে বিদেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে — এমন কি চোর, ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হাত হইতে নিজেদের ঘরবাড়ী, পরিবার রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থ।
>
> "যে শাসন পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই অপরাধ পদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকালও বাস করা আমরা মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মের দিক হইতে অপরাধ বলিয়া মনে করি। একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে। সুতরাং আমরা ব্রিটিশের সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং করপ্রদান বন্ধ এবং অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি হিংসার পথ অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে পারি এবং কর প্রদানে বিরত হই, তবে এই অমানুষিক শাসনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত। অতএব এতদ্বারা আমরা দৃঢ়সংকল্প করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেরূপ নির্দ্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন করিব।"

আসমুদ্র হিমাচলের সমগ্র জাতির পূর্ণ স্বরাজ্যের সুপরিকল্পিত সমবেত প্রচেষ্টাকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমেদাবাদের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন যে, 'তাহাকে তাঁহার অনুগামী ও সঙ্গী এবং আশ্রমবাসীদের সাহায্যে আইন অমান্যের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কংগ্রেস হইতে অনুমতি দেওয়া হউক'। ফলে ওয়াকিং কমিটি ঐ অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত নিল যে,—

"কংগ্রেস কমিটির অভিমত এই অহিংসা-নীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী, পূর্ণ স্বরাজ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তাঁহাদের দ্বারাই প্রবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং যেহেতু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান শুধু এরূপ নরনারী লইয়াই গঠিত নহে, পরন্তু ইহাতে এরূপ লোকও আছেন, যাঁহারা দেশের বর্তমান অবস্থায় অহিংসাই সমীচীন বলিয়া মনে করেন সেই হেতু ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিতেছেন এবং মহাত্মা গান্ধীকে ও তাঁহার যে সমস্ত সহকর্মী উল্লিখিত মত অহিংসা-নীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী, তাহাদিগকে এই অধিকার প্রদান করিতেছেন যে তাহারা নিজেদের বিবেচনা মত সময়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আরম্ভ করিবেন।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার ক্ষমতা অর্পণ করলে তিনি স্থির করেছিলেন যে সবরমতি আশ্রমের আশ্রমিকদের নিয়েই তিনি সবার আগে নিজে লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন। ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতার জন্য যে আকাঙ্খা তারজন্য গান্ধীর সামনে আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ভারতবর্ষের মানুষের আকাঙ্খাকে সম্যক উপলব্ধির জন্য সমসাময়িককালে লণ্ডনের 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় মিঃ এইচ. এন. বেলফোর্ড-এর লেখার প্রতি একটু দৃষ্টি ঘোরান যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন,—

" একটা বিরাট জাতি মনে করিতেছে যে, বিদেশী শাসকের নিকট অধিকতর অবনত হওয়া তাহার আত্মার পক্ষে হীনতা-ব্যঞ্জক'— মিঃ গান্ধী সেই জাতির আত্মসম্মানের প্রতীক। এই পরপদাবনতির অবসান ঘটাইবার জন্য তিনি কোন নৈতিক বিধান ভঙ্গ করিবেন না এবং কোন মানুষের অনিষ্ট করিবেন না।

"তাঁহার অপরাধ শুধু নামমাত্র — লবণের উপর ভারত সরকার যে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার স্থাপন করিয়াছেন, তিনি তাহাই অমান্য করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, এই কর অন্যায়। প্রত্যেক অপ্রত্যক্ষ করই আপত্তিজনক, কিন্তু বড়লাটের ক্ষমতা প্রয়োগে এই কর ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া এই কর দ্বিগুণ আপত্তিজনক । উহা দরিদ্রের পক্ষে দুর্ব্বহ। লবণ, মানুষ ও পশু সকলেরই আবশ্যক, উহা নিতান্ত সুলভ, কিন্তু করের দরুণ এই সহজলভ্য জিনিসের মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পায়।

"ভারতের কৃষক সম্প্রদায় এই করকে ঘৃণা করে। সম্রাটের শাসনের আমলে ফরাসী কৃষকেরাও এইরূপ ঘৃণা করিত। একেইতো এই কর অসঙ্গত, তদুপরি গান্ধী মনে করেন যে, করের দ্বারা দরিদ্র ভারতকে শোষণ করা হয় সাম্রাজ্যের লাভের জন্য।

"ঘটনাচক্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসকগণ এই লোকটিকে কারাগারে পুরিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গী ও অনুচরদিগকে ধরিয়া দলে দলে কারারুদ্ধ করিতেছেন। শাসকগণ জানেন যে, এই সমস্ত লোকের মধ্যে ভারতের উৎকৃষ্টতম নরনারীরা আছেন। যে সাম্রাজ্য তাহার উৎকৃষ্টতম প্রজাদিগের কারারুদ্ধ করে, সে সাম্রাজ্য কি সত্যই নিন্দনীয় নহে?

"মিঃ গান্ধীর আক্রমণের লক্ষ্য শুধু লবণ নহে — তিনি সমগ্র শাসনতন্ত্রকে অনশনে মারিতে চাহেন, রাজকর্মচারীদিগকে বয়কট করিয়া তিনি শাসকদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চাহেন এবং ভারতবাসীদিগকে চাকুরী ত্যাগ করাইতে চাহেন। তাহার চেষ্টা সফল হইলে সমস্ত আদালত বন্ধ হইবে, পুলিশ বাহিনী লোপ পাইবে, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান লোপ পাইবে। শাসক-শক্তি যদি তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে না পারেন, তবে তাহাকে বাধা দিতেই হইবে।

"ভারতের এই অবস্থার মূল কারণ আলোচনা করা বৃথা। আমাদিগকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করিয়া মিঃ গান্ধী কি আমাদের শাসনের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন না? আমাদের শাসন কি প্রত্যেক দিনের যুদ্ধ নহে? আমাদের পুলিশ কি ধন-তন্ত্রের স্বার্থ রক্ষায় নিযুক্ত নহে?

"ভারতের অর্দ্ধেক প্রজার নৈতিক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে শাসনকার্য্য চালাইতে হইতেছে। ভারত সরকার ন্যায় অন্যায় সমস্তই রক্ষা করিতেছেন। একদিকে তাঁহাদিগকে শান্তি রক্ষা করিতে হইতেছে, রাস্তাঘাট তৈয়ার করিতে হইতেছে, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতে হইতেছে,— অপর দিকে লবণ-কর, তাড়ির দোকান, দুর্ব্বহ ভূমি-কর এবং ঘর্ম্মাক্ত শ্রমিকের বিরুদ্ধে ধনীর স্বার্থরক্ষা করিতে হইতেছে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধের জবাব ভারতসরকার দিয়াছেন নাগরিকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া। যে-কোন ব্যক্তিকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা যায় এবং বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা যায়। ভারতবর্ষে থাকিবার জন্য আমরা সাধারনতঃ যে সমস্ত সুবিধার দোহাই দিয়া থাকি, শাসকগন ক্ষমতা রক্ষার জন্য সেই সমস্ত সুবিধা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

"কিন্তু শুধু ভয় দেখাইয়াই কার্য্য হাসিল হয় না, প্রায়শঃই বলপ্রয়োগ করিতে হয়। শত শত জননায়ককে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিতে হয়। লোণা জল জ্বাল দিয়া লবণ তৈরী করিলে নিষ্ঠুরভাবে ১৮ মাস বা ১ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড

দেওয়া হয়। সরকারী সেনারা যখন দাঙ্গাকারী জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে, তখন জনতাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া বা হটাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে না, থাকে হত্যার উদ্দেশ্য।

"এই সবে শুরু। নয় মাস অত্যাচারের পর ভারতের অবস্থা কি হইবে? অমৃতসরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে কি? নিহতদিগকে শতে শতে গণিব না হাজারে হাজারে গণিব?

"ব্ল্যাক এণ্ড ট্যানদের আমলে আয়র্লণ্ডের যে অবস্থা হইয়াছিল ভারতবর্ষের অবস্থা তাহাই। ভারতবর্ষের যুবকেরা হয়তো বা সিনফিনদের মত গরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবে। আয়র্লণ্ডে আমরা এক এক জনের বিরুদ্ধে দশ দশ জন ছিলাম, কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের এক এক জনের বিরুদ্ধে সাত সাত জন আছে। আমরা কাহার উপর, কিসের উপর নির্ভর করিব?

"অবশ্য মুসলমানেরা আছে, কিন্তু পেশোয়ার তো মুসলমান প্রধান স্থান, তথায় তাহারা আমাদের সমর্থন করিয়াছে কি? মডারেটরাই বা কোথায়? তাহারাই বা কতদিন আমাদের সঙ্গে থাকিবে?

"মনে হয় যে, রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্সের রিপোর্ট যে সময় বাহির হইবে, সে সময় ভারতবর্ষের ঘোর দুর্দ্দিন চলিতে থাকিবে। কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত যতই সুচিন্তিত না হউক, সে সময় উহা মন্টেগু-রিফর্ম্মের মতই অগ্রাহ্য হইবে। অধিকন্তু সে সময়ের মধ্যে মডারেটরা সকলেই হয়তো একষ্ট্রিমিষ্টদের সঙ্গে যোগ দিবে।"

"একথা ঠিক যে, একটা শাসনতন্ত্রের সমস্ত কথা হঠাৎ বলা চলে না, কিন্তু শ্রমিক গভর্ণমেন্ট কি অবিলম্বে একটা উদারনীতি ঘোষণা করিতে পারেন না? অন্ততঃপক্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দিতেই হইবে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে কিছু সময় লাগিবেই, কিন্তু সেই সময়টা কি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যায় না? ঐ সময়ের মধ্যে সিভিল সার্ভিস এবং সেনাদল ভারতীয়দিগকে লইয়া গঠন করিয়া ফেলিতে হইবে।

"পার্ণেল যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, সে সময় লর্ড স্যালিসবেরির মত লোকও তাহার সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। সুতরাং গান্ধীর সহিত পরামর্শ করিলে আমাদের গৌরবের হানি হইবে না।

"আপত্তি উঠিতে পারে যে, শ্রমিক দলের গভর্ণমেন্ট দুর্ব্বল, বিরোধী দুই দল মিলিয়া স্বায়ত্বশাসন সুদূরপরাহত করিতে পারেন। রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিলেও হয়তো প্রতিবাদ, পদত্যাগ হইবে। হইতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদল বুঝিতে পারিবেন যে, অবিলম্বে স্বায়ত্বশাসন ভারতের ন্যায্য প্রাপ্য;— বিরোধীদলের বাধা অগ্রাহ্য করিয়াই এই ন্যায্য প্রাপ্য মিটাইতে হইবে।

"আমরা ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র পারিব কি না সে সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে তাহা অবিলম্বে পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। বিরোধী দল যদি উহা দিতে অসম্মত হয়, তবে সেই দিন হইতেই আমরা ভারতবর্ষ শাসনের দায়িত্ব ত্যাগ করিব। এ সম্বন্ধে মন্ত্রিসভা যদি ইতস্ততঃ করেন, তবে তাহাদিগকে ভারতবর্ষ পুনর্জ্জয় করিতে হইবে।"

ভারতবর্ষের এহেন অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের এরূপ উদাসীন মনোভাব সত্বেও প্রকৃত আইন-অমান্য অভিযানের প্রাক্কালে ১৯৩০-এর ২রা মার্চ গান্ধীজি বড়লাটকে একটা চিঠি লিখলেন। ৩রা মার্চ ঐ চিঠিটি তিনি এক ইংরেজ যুবা রেজিনাল্ড রেনল্ডস্-এর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বড়লাটের কাছে। ঐ চিঠিতে গান্ধীজি লিখেছিলেন ঃ

"প্রিয় বন্ধু!

সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার এবং আমি এই কয় বৎসর যে দায়িত্ব লইতে ইতস্তত করিয়াছি, সেই দায়িত্ব লইবার পূর্ব্বে প্রতিকারের জন্য আপনার সমীপস্থ হইতেছি। আমার নিজের বিশ্বাস সুস্পষ্ট। আমি স্বেচ্ছায় কোন প্রাণীর অনিষ্ট করিতে পারি না, মানুষের তো নহেই, আমার প্রতি শত অন্যায় করিলেও আমি মানুষের অনিষ্ট করিতে পারি না, সুতরাং আমি যদিও ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ বলিয়া মনে করি, তথাপি আমি একজন ইংরাজেরও অনিষ্ট করিতে অথবা ভারতবর্ষে যদি ইংরাজের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকিয়া থাকে, তাহা নষ্ট করিতে চাহি না। আমাকে ভুল বুঝিবেন না; যদি আমি ব্রিটিশ শাসন অভিশাপ বলিয়া মনে করি, তথাপি আমি ইংরাজকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীন মনে করি না। অনেক ইংরাজ আমার প্রিয়তম বন্ধু। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত সাহসী ও অকপট ইংরাজ ব্রিটিশশাসন সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে দ্বিধা করেন নাই, তাহাদের লেখা হইতেই ব্রিটিশ শাসনের অন্যায় বুঝিতে পারিয়াছি।

"ব্রিটিশ শাসন অভিশাপ কেন?

আমি ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ বলিয়া মনে করি কেন? উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল শোষণনীতি এবং দেশের পক্ষে দুর্ব্বিসহ সাঙ্ঘাতিক ব্যয়সাধ্য সমর বিভাগ ও শাসন বিভাগ পরিচালনার দ্বারা দেশের লক্ষ লক্ষ মূক জন-সাধারণকে দরিদ্র করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা আমাদিগকে রাজনৈতিক ক্রীতদাস করিয়াছে। ইহা আমাদের সভ্যতার ভিত্তি নষ্ট করিয়াছে। অস্ত্রহীন করিয়া আমাদিগকে মনুষত্বহীন করিয়া ফেলিয়াছে। এই ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণের ফলে আমরা অন্তরের সাহসের অভাবে কাপুরুষের মত অসহায় হইয়া পড়িতেছি।

"রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স

দেশের অন্যান্য বহু লোকের মত আমিও এই আশা করিয়াছিলাম যে, প্রস্তাবিত রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে একটা প্রতিকার হইবে কিন্তু যখন আপনি স্পষ্টই বলিলেন যে, আপনি বা বৃটিশ মন্ত্রীমণ্ডল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের প্রস্তাব সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না, তখনই বুঝিতে পারা গেল, মুখর ভারতবাসীরা জ্ঞাতসারে এবং লক্ষ লক্ষ মূক ভারতবাসী অজ্ঞাতসারে যে প্রতিকার চাহিতেছে, রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্সে সে প্রতিকার পাওয়া যাইবে না। একথা বলা অনাবশ্যক যে পার্লিয়ামেন্টের সম্মতি কথা এক্ষেত্রেই উঠে নাই। পার্লিয়ামেন্টের সম্মতি সাপেক্ষে ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভা কোন বিশেষ নীতি প্রবর্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। দিল্লীতে আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাতে কোন ফল না হওয়ায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং আমার পক্ষে ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা ভিন্ন গতি ছিল না কিন্তু আপনার ঘোষণায় 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন' কথাটি যদি প্রচলিত অর্থে গৃহীত হয়, 'স্বাধীনতা' শব্দটিতে আপত্তির কোন কারণ নাই। বড় বড় ব্রিটিশ রাজনীতিকগণও বলিয়াছেন যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কার্য্যতঃ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু আমার আশঙ্কা এই যে, ঐরূপ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন ভারতবর্ষকে দিবার আশু সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, বিগত কথার আলোচনা করিয়া লাভ নাই।

"আপনার ঘোষণার পর এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা হইতে ব্রিটিশ নীতির ভাবগতিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ভারতের সহিত বাণিজ্যে ব্রিটেনের স্বার্থে আঘাত পড়িতে পারে, অথবা ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটিশের দেনা পাওনা নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করা যাইতে পারে, শাসননীতির এরূপ কোন পরিবর্ত্তন দায়িত্বসম্পন্ন কোন ব্রিটিশ রাজনীতিকই কল্পনা করিতে পারেন না।

"ভারতের রক্ত মোক্ষণ

শোষণনীতি বন্ধ করার জন্য যদি কিছুই না করা হয়, তবে ভারতের রক্ত মোক্ষণ দ্রুততর ভাবেই চলিবে। এই যে এক কলমের খোঁচায় টাকার মূল্য ১৮পেনী ধার্য্য করিয়া ভারতবর্ষ হইতে কয়েক কোটি টাকা শুষিয়া লওয়া হইতেছে, অর্থসচিব মহাশয় তাহাও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মনে করেন এবং অন্যান্য অন্যায়ের মধ্যে এই অন্যায়টি নিরুপদ্রব কার্য্য দ্বারা প্রতীকার করার চেষ্টা হইলেও আপনি পর্যন্ত সে চেষ্টাকে দমন করার জন্য ধনী জমীদারদের সাহায্য পাইবার জন্য সেই শান্তি শৃঙ্খলার দোহাই না দিয়া থাকিতে পারেন না। যাহা ভারতবর্ষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। জাতির নামে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন স্বাধীনতার মূলগত উদ্দেশ্য যদি তাঁহারা বুঝিতে না পারেন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সকলের সম্মুখে প্রকটিত না

রাখেন, তাহা হইলে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পথে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে দেশের শ্রমরত মূক জনসাধারণের নিকট উহার কোন মূল্যই থাকিবে না; অথচ তাহাদের জন্যই উহা লাভ করিতে চেষ্টা করা হইতেছে, এবং তাহাদের জন্যই উহার লাভে সার্থকতা। এই কারণেই আমি কিছুদিন হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি হওয়া উচিত জন-সাধারণের নিকট তাহা বলিয়া আসিতেছি। এই সম্পর্কে কয়েকটি প্রধান প্রধান কথা আমি আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি।

"হৃদয়হীন লবণ শুল্ক

মোট রাজস্বের একটি বড় অংশ হইল ভূমি-রাজস্ব। এই রাজস্বের গুরুত্ব অতি ভীষণ, স্বাধীন ভারতে উহার বিশেষরূপ সংস্কার সাধন করিতেই হইবে। যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এত বড়াই করা হয়, তদ্দ্বারা কয়েকজন ধনী জমিদারেরই মাত্র উপকার হইয়া থাকে। রায়তেরা যেরূপ অসহায় ছিল, সেরূপ অসহায়ই আছে। সে শুধু উঠবন্দী প্রজা মাত্র। তখন যে শুধু ভূমি-রাজস্বই যথেষ্টরূপ হ্রাস করিতে হইবে ইহাই নহে, রায়তের কল্যাণ যাহাতে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তদ্রূপভাবে সমগ্র রাজস্বনীতির সংস্কার সাধন করিতে হইবে। কিন্তু বৃটিশ রীতি তাহার জীবনী শক্তি পিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই যেন পরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। যে লবণ তাহার জীবন ধারনের সম্বল, সেই লবণটুকুর উপর পর্য্যন্ত এমনভাবে শুল্ক বসান হইয়াছে, যাহার ভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পতিত হয় তাহারই উপর। যেরূপ হৃদয়হীন নির্ব্বিচারসহকারে এই কর ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহাতে দরিদ্রের উপরই ইহার ভার অধিক পতিত হয়; কারণ, লবণ জিনিসটা ধনী অপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে উভয়তঃ দরিদ্রকেই অধিক খাইতে হয়। সুরা এবং মাদক দ্রব্যের করও দরিদ্রের নিকট হইতে আহৃত হইয়া থাকে। ইহা তাহাদের স্বাস্থ্য এবং নৈতিক বল উভয়েরই ভিত্তিকে ক্ষুণ্ন করে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মিথ্যা অজুহাতে ইহার পক্ষ সমর্থন করা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর গ্রহণই হইল উদ্দেশ্য।

"অকল্যাণকর শাসন সংস্কার

১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারের প্রণেতৃগণের চাতুর্য্যক্রমে এই রাজস্ব দ্বৈতশাসনের তথাকথিত দায়িত্বপূর্ণ বিভাগে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। এইভাবে আদি হইতেই ঐ শাসন সংস্কারকে কল্যাণ-শক্তিহীন করা হইয়াছে। হতভাগ্য মন্ত্রী যদি এই রাজস্ব তুলিয়া দেন, তাহা হইতে শিক্ষা সম্পর্কিত কার্য্যে তাহার টাকা জুটিবে না; কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ রাজস্ব অন্য কোন নূতন ক্ষেত্র হইতে পাইবার তাঁহার উপায় নাই। উপর হইতে গুরু করভার এইভাবে দরিদ্রকে যেমন পিষ্ট করিতেছে, আর তেমনি তাহার প্রধান অতিরিক্ত উপজীবিকা, অর্থাৎ চরকা ধ্বংস হওয়াতে অর্থাগমের শক্তিও তাহার নষ্ট হইয়াছে।

"ভারতের লবণের দায়িত্ব

ভারতের নামে ঋণ করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিলে ভারতের সর্ব্বনাশের কাহিনী পূর্ণ হয় না। সংবাদপত্রসমূহে এই বিষয়ে সম্প্রতি যথেষ্ট বলা হইয়াছে। কড়াকড়িভাবে ঋণের তদন্ত করিয়া নিরপেক্ষ ট্রিবিউনাল যে সব ঋণ অন্যায় এবং অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন, সেগুলি অস্বীকার করা স্বাধীন ভারতের কর্ত্তব্য হইবে।

"ব্যয়বহুল বৈদেশিক শাসন

যে সব অন্যায় অবিচারের নজীর উল্লেখ করা হইল জগতের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল একটি বৈদেশিক শাসন চালাইবার নিমিত্ত ঐগুলি বজায় রাখা হইতেছে। আপনার নিজের বেতনটাই ধরুন, উহা মাসিক ২১ হাজার টাকারও অধিক, উহা ছাড়া পরোক্ষভাবে ঐ সঙ্গে আরও অনেক সুবিধা আছে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বৎসরে ৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ মাসে ৫৪০০ টাকার কিছু অধিক পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান বাটার হারে আপনি দৈনিক ৭ শত টাকার অধিকার পাইতেছেন, অথচ ভারতবাসীর গড়ে আয়, দৈনিক দুই আনারও কম। ইংলণ্ডের অধিবাসীদের দৈনিক গড় আয় দুই টাকা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী দৈনিক ১৮০ টাকা পাইয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আপনি ভারতবাসীদের গড় আয়ের ৫ হাজার গুণের অনেক অধিক পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্রেট বৃটেনের অধিবাসীদের গড় আয়ের মাত্র ৯০ গুণ অধিক পাইয়া থাকেন। নতজানু হইয়া আমি আপনাকে এই ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছি। একটি কষ্টদায়ক সত্যকে বিশেষরূপে উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কথা উল্লেখ করিলাম। আপনার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে তাহাতে আপনার মনে কষ্ট দিবার ইচ্ছা আমার থাকিতে পারে না। আমি জানি, আপনি যে বেতন পাইয়া থাকেন, আপনার তাহার দরকার হয় না। সম্ভবতঃ আপনার সমগ্র বেতনই দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু, যে শাসন নীতিতে এই সব ব্যবস্থা সম্ভব, নিঃসংশয়িত চিতে তাহা ধ্বংস সাধনের যোগ্য। বড়লাটের বেতন সম্বন্ধে যে কথা সত্য, সাধারণ ভাবে সমগ্র শাসনের সম্বন্ধেও সেই কথা সত্য।

"কেন স্বাধীনতা চাই

সুতরাং রাজস্ব হ্রাস করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে শাসনের ব্যয়ও সঙ্কোচ করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। স্বাধীনতা ভিন্ন জয় অসম্ভব। সুতরাং আমি মনে করি যে, ২৬শে তারিখের অনুষ্ঠানে যে লক্ষ লক্ষ লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যোগ দিয়াছিল তাহাদের নিকট স্বাধীনতার অর্থ এই মারাত্মক ভার হইতে মুক্তি।

"ভারতের সকল লোকের আপত্তি সত্ত্বেও গ্রেটব্রিটেন দিনের পর দিন যে শোষণ করিতেছে তাহা পরিত্যাগ করিতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের কোন দলই সম্মত নহেন।

"গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা

ভারতবর্ষকে যদি জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, অনশনে ধীরে ধীরে মৃত্যুর হস্ত হইতে যদি ভারতের লোককে রক্ষা করিতে হয়, তবে আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত কনফারেন্স নিশ্চয়ই সে প্রতিকার নহে। ইহা যুক্তিদ্বারা বিশ্বাস জন্মাইবার কথা নহে, ইহা শক্তি পরীক্ষার বিষয়। বুঝুক বা না বুঝুক গ্রেটব্রিটেন তাহার ভারতীয় বাণিজ্য এবং স্বার্থ, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রক্ষা করিবে। সুতরাং ভারতবর্ষকেও এই মরণালিঙ্গন হইতে মুক্ত করিবার জন্য শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে।

"অহিংসা-নীতির শক্তি

একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, বর্ত্তমানে যতই অসংহত হউক এবং সামান্য হউক দলবদ্ধ হিংসানীতি প্রসার লাভ করিতেছে এবং নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। আমার উদ্দেশ্য যাহা এই হিংসাবাদীদের উদ্দেশ্যও তাহাই। কিন্তু আমি ঠিক বুঝিয়াছি যে, হিংসানীতি লক্ষ লক্ষ মূক সাধারণের অভিপ্রেত প্রতিকার লাভ করিতে পারিবে না। আমার মনে এই ধারণা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে যে, একমাত্র অনাবিল অহিংসা ভিন্ন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সংহত হিংসা রোধ করার উপায় নাই। অনেকে মনে করেন যে, অহিংসা সক্রিয়শক্তি নহে। আমার অভিজ্ঞতা অবশ্য সীমাবদ্ধ, সেই সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, উহা অতীব ক্রিয়াশীল শক্তি। ব্রিটিশ শাসনের সংহত উপদ্রবশীল শক্তির বিরুদ্ধে এবং হিংসাবাদীদের অনিয়ন্ত্রিত উপদ্রবশীল শক্তির বিরুদ্ধে সেই শক্তি প্রয়োগ করাই আমার অভিপ্রায়।

"চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অর্থ হইবে উপরোক্ত দুইটি উপদ্রব নীতিকেই প্রশয় দেওয়া। অহিংসার শক্তির উপর আমার বিশ্বাস অটল অচল, এমতাবস্থায় অধিককাল প্রতীক্ষা করা আমার পক্ষে পাপ। সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া আমি এই অহিংস নীতি প্রয়োগ করিব। বর্ত্তমানে উহা সত্যাগ্রহ আশ্রমের অধিবাসীদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু যাহারা ঐ নীতির গণ্ডী মানিয়া লইবেন, তাঁহারাও শেষকালে উহাতে যোগ দিতে পারিবেন।

"বিপদকে বরণ

আমি জানি যে, এই অহিংস-সংগ্রাম আরম্ভ করিতে যাইয়া আমি যে বিপদ মাথায় লইতেছি তাহা ভয়ানক বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিপদকে বরণ না করিলে কখনও সত্যের জয় হয় না। যে জাতি জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক

নিজেদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক, অতি প্রাচীন এবং সভ্যতায় ন্যূন নহে এরূপ আর একটা জাতির উপর চাপিয়া বসিয়া আছে, সেই জাতির মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন করার জন্য যে কোন বিপদকে বরণ করা যায়। আমি ইচ্ছা করিয়াই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন কথাটির ব্যবহার করিয়াছি, কারণ, অহিংসার মধ্য দিয়াই ব্রিটিশ জাতির মনোবৃত্তি পরিবর্তন করিতে চাহি, যেন তাহারা দেখিতে পায় যে, কত বড় অন্যায় তাহারা ভারতের প্রতি করিয়াছে।

"অসহযোগের কল্পনা

আমি আপনার দেশের লোকের অনিষ্ট করিতে চাহি না। আমি যেমন আমার দেশের লোকের সেবা করিতে চাহি, তাহাদেরও তেমনই সেবা করিতে চাহি। ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত আমি অন্ধভাবে তাহাদের সেবা করিয়াছি; কিন্তু যখন আমার চক্ষু খুলিল তখন আমি অসহযোগের কল্পনা করিলাম।

"তখনও তাহাদের সেবা করা উদ্দেশ্য ছিল। আমি আমার প্রিয়তম পরিজনের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছি, তাহাদের বিরুদ্ধেও সেই অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমার নিজের দেশের লোকের প্রতি এবং আপনার দেশের লোকের প্রতি ভালবাসা যদি থাকিয়া থাকে, তবে তাহা বেশীদিন গোপন থাকিবে না, আমার পরিজনবৃন্দ বহু বৎসর আমাকে পরীক্ষা করিয়া যাহা স্বীকার করিয়াছেন, আপনার দেশের লোকেরাও তাহা স্বীকার করিবেন। যদি দেশের লোক আমার সঙ্গে যোগ দেয় — আমি আশাকরি যে, যোগ দিবে — এবং ব্রিটিশ জাতি যদি নীতির পরিবর্ত্তন না করে, তবে দেশের লোককে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে, তাহাতে সুকঠিন পাষাণও গলিত হইবে। আমি উপরে যে সমস্ত অন্যায়ের কথা বলিয়াছি, তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্যই সত্যাগ্রহ। আমরা এই সমস্ত অন্যায়ের জন্য ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহি।

"মিটমাট কখন সম্ভব

যদি সমস্ত অন্যায় দূর হয়, তবে পথ সুগম হইবে। তখন মিত্রভাবে আলোচনার পথ খোলা থাকিবে। ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্য যদি ধনলিপ্সা ত্যাগ করিতে পারে, তবে আপনার পক্ষে আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার করা কষ্টকর হইবে না; সুতরাং আমি সবিনয়ে আপনাকে এই সমস্ত অন্যায় দূর করিবার পথ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিতেছি;তাহা হইলেই সমান সমান লোকের মধ্যে প্রকৃত আলোচনা হইতে পারিবে, উভয় জাতি স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ করিতে পারিবে এবং পরস্পরের পক্ষে সমান সুবিধাজনক বাণিজ্য সর্ত্তের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

"সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রধান নহে

দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশ যে সাম্প্রদায়িক সমস্যায় পীড়িত, আপনি অন্যাবশ্যকরূপে সেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর জোর দিয়াছেন। কোন শাসনতন্ত্রের সম্বন্ধে বিবেচনা কালে ঐগুলি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সব সমস্যা অধিক গুরুতর সেগুলির সঙ্গে ঐগুলির সম্পর্ক কিছু মাত্র নাই, কারণ ঐ সব সমস্যা সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে। এ দেশের সকলেই সমভাবে উহার ফলভোগী।

"লবণ বিধি অমান্য

কিন্তু আপনি যদি ঐ প্রতিকার সাধনে অগ্রসর হওয়া উচিত বোধ না করেন এবং আমার এই চিঠি আপনার হৃদয় স্পর্শ না করে, তাহা হইলে এই মাসের একাদশ দিবসে, আমি আশ্রমের যেসব সহকর্মীকে আমার সঙ্গে লইতে পারিব, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া লবণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অমান্য করিতে অগ্রসর হইব। দরিদ্রের দৃষ্টি হইতে আমি ঐ করকে সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন প্রধানতঃ এতদ্দেশের দারিদ্রের স্বার্থেরই জন্য, সুতরাং ঐ অন্যায়কে আক্রমণ করিয়াই ঐ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। আশ্চর্য্য এই যে, আমরা এতকাল পর্য্যন্ত এই হৃদয়হীন একচেটিয়া কারবার মানিয়া লইয়া আসিয়াছি।

"গ্রেপ্তারের রায়

আমি জানি, আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া আপনার পরিকল্পনা নষ্ট করিবার ক্ষমতা আপনার হাতে রহিয়াছে। আমি আশা করি, আমার পরে ঐ কার্য্য সুশৃঙ্খলিতভাবে চালাইবার ভার গ্রহণ করিতে এবং লবণবিধি অমান্য করিয়া যে বিধি দ্বারা কোনদিন দণ্ডবিধির পুস্তক কলঙ্কিত করা উচিত ছিল না, তাহার জন্য দণ্ডগ্রহণে হাজার হাজার লোক প্রস্তুত হবেন। আপনাকে অনাবশ্যক রূপে উত্যক্ত করিবার ইচ্ছা আমার নাই; আমার যতদূর সাধ্য, আমি উহা মোটেই করিতে চাহি না। আমার চিঠির কোন গুরুত্ব যদি আপনি মনে করেন এবং যদি আপনি এই বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার বোধ করেন, কিংবা যদি এই জন্য আমার এই চিঠি প্রকাশ করা স্থগিত রাখা আপনি ভাল মনে করেন, এই চিঠি আপনার নিকট পৌছিবার অনতিবিলম্বে আপনার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে কোন টেলিগ্রাম পাইলে আমি সানন্দচিত্তে ইহা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিব। আপনি আমাকে এই অনুগ্রহ করিবেন যে, আপনি যদি এই চিঠির মর্ম্মাংশে একমত হইতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে আমার পন্থা হইতে বিচ্যুত করিবেন না। কোনরূপ হুমকি দেখাইবার ভাব লইয়া এই চিঠি লিখিত হয় নাই। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীর প্রাথমিক পবিত্র কর্ত্তব্য হিসাবেই এই চিঠি প্রেরিত হইতেছে সেই জন্য আমি আমার একজন যুবক

ইংরেজ বন্ধুর মারফতে ইহা প্রেরণ করিলাম। তিনি ভারতবাসীদের দাবীতে বিশ্বাসী এবং অহিংসায় পূর্ণ বিশ্বাসী; ভগবানই যেন তাঁহাকে এই উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্যই আমার কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। — ভবদীয়

বিশ্বস্ত বন্ধু
এম. কে. গান্ধী

গান্ধীজির ঐ চিঠি পড়ে বড়লাট স্বাভাবিকভাবেই একমত হতে পারেন নি তাঁর সঙ্গে। নিজে উত্তর না লিখে নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে দিয়ে গান্ধীজির চিঠির উত্তর পাঠিয়ে দিলেন। ৭ই মার্চ তারিখের চিঠিতে প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখলেন ঃ

"বড়লাট বাহাদুর আপনার ২রা মার্চ তারিখের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। বড়লাট বাহাদুর একান্ত দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে, আপনি এমন এক কার্য্যপদ্ধতির কথা চিন্তা করিতেছেন, যাহা দ্বারা আইন অমান্যের এবং জনসাধারণের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার স্পষ্ট ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে।"

বড়লাট গান্ধীজির শেষ অনুরোধ শুধু প্রত্যাখ্যান ই করেছিলেন এই নয়, সেই সঙ্গে সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য করে বোরসাদ তালুকের রাস গ্রামে বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে ৭ই মার্চ তারিখে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ শত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। পরপর এই দুই ঘটনার পর 'বন্ধন ভয়জর্জর শান্তিকে বিকৃত হইতে উদ্ধার করিয়া আত্মশক্তিকে অটল নির্ভয় পদে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতকে আহ্বান করিয়া স্বয়ং সত্যাগ্রহ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করিলেন।' অস্ত্রবলে বলীয়ান পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শক্তিকে সমরে আহ্বান জানিয়ে 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি, সত্য ও অহিংসার জীবন্ত বিগ্রহ, কটিমাত্র কৌপীন সম্বল, তপঃশীর্ণ ঋজু, দেহযষ্টি 'ক্রশবিদ্ধ পরিত্রাতার' ন্যায় মহান মহাত্মা গান্ধী ১২ই মার্চ সবরমতি আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়লেন জালালপুর-এর উদ্দেশ্যে, সেখানে ৬ই এপ্রিল লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য। গান্ধীজি নিজে প্রস্তুত। দেশবাসীও প্রস্তুত। দিল্লীর আইন মজলিসে স্যার ক্ররার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নিরস্ত্র প্রজার এ স্পর্দ্ধিত অবহেলা গভর্ণমেন্ট সহ্য করিবেন না।'

ব্রিটিশ শক্তি হুঙ্কার ছাড়লেও আমেরিকায় চিকাগো শহরের 'ইউনিটি' পত্রিকা গান্ধীজির লবণ আইন-অমান্য অভিযানের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে লিখল ঃ

"মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্য আমেদাবাদ হইতে সমুদ্রের দিকে অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন; — আজ তাহাকে প্রধানতম জননায়ক বলা যায়। ইতিপূর্বে কদাপি এরূপভাবে বিপ্লব আরম্ভ হয় নাই,— বিপ্লবের প্রারম্ভে চিরদিনই আমরা কাটাকাটি মারামারি দেখিতে অভ্যস্ত। কোন কোন সময়ে

বিপ্লবের প্রারম্ভে মিছিল বাহির হইয়াছে সত্য — কিন্তু সে সমস্ত মিছিলে থাকিত সৈনিকগণ, রণ-পতাকা এবং সমর-সঙ্গীত, কিন্তু আজ ভারতে কি দেখিতেছি? ক্ষীণকায় খর্ব্বাকৃতি একটি লোক ৭৯ জন সঙ্গী সহ সমুদ্রের দিকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন — তাঁহাদের মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য, পদতলে ধুলিসমাচ্ছন্ন দীর্ঘ পথ। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহারা ইংরাজ রচিত আইন অমান্য করিয়া লবণ প্রস্তুত করিবেন। আপাত দৃষ্টিতে এতদপেক্ষা হাস্যকর ও ব্যর্থনীতি কল্পনা করা অসম্ভব। তথাপি এই আরম্ভ একটা সাম্রাজ্যের শক্তিকে উপেক্ষা করিতেছে, সুতরাং সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গান্ধী নাটকীয়ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন — ভারতের কোটি কোটি নর-নারীর চক্ষু খুলিবার জন্য। গান্ধী প্রকাশ্যে তাঁহার নীতি ঘোষণা করিয়াছেন — ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষর লোককে শিক্ষা দিবার জন্য। অদ্ভুৎ কল্পনা-শক্তির বলে তিনি ভারতের প্রতি ঘরে, ভারতের প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিতেছেন। তিনি স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে চলিয়া দেশবাসীকে দেখাইতেছেন কোন্ পথে চলিতে হইবে। অহিংসা-নীতি ইতিপূর্ব্বে এরূপ ব্যাপকভাবে ও এরূপ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই। এই ভয়ানক শান্ত ব্যক্তিটির প্রতাপে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, ইহাতে গান্ধী-নীতির শক্তি উপলব্ধি করা যায়। শাসক-শক্তি উহা চলিতে দিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে সমগ্র ভারতে অ-শস্ত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। তথাপি তাঁহারা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিতে এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন।

"ভগবান যীশুর সঙ্গিগণ সহ জেরুজালেমে যাত্রার পর পৃথিবীতে এরূপ দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। তাই স্তম্ভিত-বিস্ময়ে আমরা মহাত্মা গান্ধীর এই অভিযানের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতেছি।"

১২ই মার্চ সকাল ৬-৩০ মিনিটে ৭৮ জন সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে জালালপুরের পথে ১৬ই মার্চ কয়রা জেলার আনন্দগ্রামে বক্তৃতা করার সময় গান্ধীজি এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে সমগ্র দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন,—

'এ পর্যন্ত আমি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার সম্বন্ধে গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর কোন গণ্ডী রাখিতেছি না। আপনারা যেখানে ইচ্ছা করেন, আইন অমান্য করিতে পারেন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সর্ব্বত্র সংগ্রাম আরম্ভ করুন। আমার মতে শুভকাল আগত। আইন অমান্যের পক্ষে বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এখন যদি আপনাদের শক্তি না থাকে শক্তি কোনও দিনও আসিবে না।'

গান্ধীজির উদাত্ত আহ্বানে জেগে উঠল ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ। তুলনায় বেশী জেগে উঠেছিল বাঙলার মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্বাংশের দুটি মহকুমা, তমলুক এবং কাঁথি।

আন্দোলনে তমলুক মহকুমা ঃ

গান্ধীজির লবণ আইন-অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের মেদিনীপুর জেলার রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি মহেন্দ্রনাথ মাইতি-র সভাপতিত্বে তমলুকে একটি আইন অমান্য সমিতি গড়ে উঠেছিল, যেমনটি বেঙ্গল কংগ্রেসের কমিটি (বি.সি.সি) 'অলবেঙ্গল কাউন্সিল ফর সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স গঠন করল'। এই সমিতির সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অন্যান্য সদস্যরা হলেন জীবেশচন্দ্র দেব, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিক চন্দ্র ভৌমিক, গৌরহরি ভট্টাচার্য্য এবং চণ্ডীচরণ দত্ত। এই সমিতি ১৯৩১-এর ৩০ মার্চ থেকে অবিভক্ত তমলুক মহকুমার সর্বত্র মিটিং মিছিল করে স্বেচ্ছাসেবক এবং অর্থসংগ্রহের কাজ শুরু করে দেয়। শুরুর দিন দেউলপোতা, বালুঘাটা এবং নন্দকুমার— এই তিনটি জায়গায় সভা করে। ৬ই এপ্রিলের আগেই কয়েকদিনের চেষ্টায় জোগাড় করেছিল প্রায় ১৫,০০০ স্বেচ্ছাসেবক। আইন অমান্য করার জন্য সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে কলকাতা থেকে তমলুকে এসে জনসভা করেছেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, ক্ষেমঙ্করী দেবী, চারুশীলা দেবী, অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ সোম, মকসুদ হোসেন এবং প্রভাত কুমার গাঙ্গুলী। লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য তমলুকের এই সমিতিকে বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ স্বেচ্ছাসেবক এবং অর্থ সাহায্যও দিয়েছিল। এরা প্রথমে সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অজিত কুমার মল্লিককে পাঠিয়ে ছিলেন আইন অমান্য করবার উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করবার জন্য।

তমলুক শহর থেকে ১২ মাইল দূরের নরঘাট-এর নদীতীর আইন অমান্যের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। তমলুকের রাজবাড়ির সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর একটি বাড়ি আইন অমান্য শিবির পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবকদের থাকবার জন্য ছেড়ে দেন। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শুধু মেদিনীপুরের মানুষই নয়, কলকাতা, ২৪ পরগণা ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিং-এর অগণিত মানুষ যোগ দিয়েছিলেন এই শিবিরে। শিবিরের আচার্য্য হলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। তমলুক থেকে নরঘাট এই পথপরিক্রমার পর নরঘাট পৌঁছে লবণ আইন ভঙ্গ করার মিছিলের তদারকি করার জন্য ৫ই এপ্রিল তমলুকে এলেন বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের প্রতাপচন্দ্র গুহরায়। তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের অদূরে এক নারকেল বাগানে বিশাল জনসভায় আড়াই ঘন্টারও বেশী সময় নিয়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সকলকে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার আহ্বান জানালেন। এগিয়ে এলেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত, ভবদাস, রজনীকান্ত প্রামানিক, সুশীল ধাড়া সহ আরও অনেকেই। ৬ই এপ্রিল বেলা ১০টার সময় প্রায় ৭ হাজার মানুষের মিছিলের শোভাযাত্রায় হংসধ্বজ মাইতির নেতৃত্বে ৩০ জন সত্যাগ্রহী তমলুকের রাজবাড়ি অঙ্গনের শিবির থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নরঘাটের উদ্দেশ্যে। মহিলারাও বাদ যায় নি। কিছুপথ সঙ্গী হয়েছিলেন প্রায় শ-দুই মহিলা। মিছিল নরঘাট পৌঁছল বেলা ৩টায়। বিকেল ৪টায় ৫ সদস্যের প্রথম স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা

হংসধ্বজ মাইতি ও তাঁর অপর ৪ সঙ্গী ইন্দ্রজিৎ সিংহ, রাখালচন্দ্র নায়ক, ক্ষুদিরাম ডাকুয়া এবং কুঞ্জ বিহারী মাইতি লবণ আইন ভাঙতে এগিয়ে গেলেন। ওদের তৈরী লবণ ১ তোলা ৫০০ টাকায় বিক্রি হলেও সমস্ত লবণ কেড়ে নিয়ে গেল পুলিশ। লবণ তৈরির সরঞ্জাম ভেঙে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালালো পুলিশ বাহিনী। অত্যাচারের ভয়াবহতার প্রতিবাদে সরকারী কাজে ইস্তফা দিলেন সরবেড়িয়া গ্রামের ভূষণচন্দ্র সামন্ত।

মেদিনীপুরের জেলাশাসক মি. পেডি নরঘাটে উপস্থিত হলেন ১৫ই এপ্রিল। ঐ দিন বেলা ২টার সময় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়কে পুলিশের বিরাট বাহিনী তমলুক থেকে গ্রেপ্তার করে মোটরে চড়িয়ে নরঘাটে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করল। ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। অপরাধ তিনি আগে থেকেই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রদক্ষিণ করে সাধারণ মানুষকে সত্যাগ্রহে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই গ্রেপ্তার এবং কারাদণ্ডের প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তমলুকের মানুষ। পরদিন ১৬ই এপ্রিল তমলুক শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হলেও ১৫ই এপ্রিল দুপুর থেকেই শহরে হরতাল-এর মেজাজ;বিশেষ করে তমলুক আদালতের আইনজীবিদের মধ্যে। কারণ, গ্রেপ্তার হয়েছেন তমলুকের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র জননায়ক অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। হরতাল আর আন্দোলনের জেরে তমলুক কোর্টের তরুণ আইনজীবি ধীরেন্দ্রনাথ মালাকার ১৫ই এবং ১৬ই এপ্রিল সঙ্গী সাথীদের নিয়ে কোর্ট বয়কট করে রাজ-রোষে পড়লেন। ১৮৭৯-এর লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাক্ট-এর ১৩(বি) ধারা মতে বাবু ধীরেন্দ্রনাথ মালাকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য চার্জ গঠন করে তমলুক মুন্সিফ আদালতের ৪র্থ কোর্টের মুন্সিফ পি.এন.লাহিড়ি (?) ১৯৩০-এর ২৪শে মে সকাল ৭টায় বিচারের দিন ধার্য্য করে লিখলেন :

"To

Babu Dhirendranath Malakar
Pleader,
Munsif's Court, Tamluk

Please take notice that the accompanying charges under sec. 13(b) & (f) of the Legal Practitioners' Act has been framed against you and it will be taken into consideration on saturday the 24th May, 1930, at 7 A.M.

Dated : Tamluk
the 5th May, 1930

Sd/- P. N. Lahiry
Munsif, 4th Court
Tamluk

Seal

Charges 69/30

Whereas you Babu Dhirendranath Malakar being a pleader of this Court joined the Hartal and did not atte[n]d the Court along with other members of the local Bar in furtherance of the common object of the boycott of Courts on the 15th and 16th April, 1930, and whereas you were engaged as a pleader in the marginally noted suit [no. 621/29 dt. 16.1.30 Saday Dey Agy. vs. Hari Das & others dffs.] pending in this Court, that were fixed for hearing of for orders on the date and for the party mentioned against it and whereas you wilfully neglected your client's work and acted to the prejudice of their interest by absenting yourself from the Court on that date, you hereby committed grossly improper conduct in the discharge of your professional duty by neglecting your client's work and acting to the prejudice of his interest under section 13 (b) of the Legal Practitioners' Act (act XVIII of 1879) and you have further been guilty of misconduct by joining the said movement to boycott Courts and paralyse the work of the Courts and absenting yourself from the Court on the 15th and 16th April, 1930, without any lawful excuse, under section 13 (f) of the said Act.

Dated : the 5th May, 1930 Sd/- P. N. Lahiry

Munsif, 4th Court, Tamluk"

পরের দিন ১৬ই এপ্রিল গ্রেপ্তার হলেন ঐ প্রথম দিনের দ্বিতীয় দলের নায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত। ১৮ই এপ্রিল গ্রেপ্তার হয়ে ৬ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন কংগ্রেস নেতা কুমার চন্দ্র জানা এবং ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন ললিত কুমার ধাড়া। জনতার রুদ্ররোষকে রোধ করবার জন্য ঐদিন পেড়ি নরঘাটে ১৪৪ ধারা জারি করলেন। ১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করে আইন অমান্য করলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, ক্ষেমঙ্করী দাসী আর চারুশীলা দেবী। পুলিশ ২০শে এপ্রিল গ্রেপ্তার করে নিল তমলুকের আইন অমান্য পরিষদের সভাপতি মহেন্দ্রনাথ মাইতি (১৫ মাসের কারাদণ্ড), সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (১৮ মাসের কারাদণ্ড), চণ্ডীচরণ দত্ত এবং তমলুকের রাজবাড়ির রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় আর অজয় মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে।

গ্রেপ্তার আর আইন-অমান্য করে লবণ তৈরির মাঝেই মে মাসের মধ্যে সমগ্র তমলুক মহকুমার আইন ভাঙার জন্য ৯টি কেন্দ্র খোলা হল — নরঘাট, রাউতুড়ি, তমলুক, ডিহিগুমাই, রাজারামপুর, বাড়বাসুদেবপুর, রাসগাছতলা, কেশাপাট আর বাবুপুরে। এর মধ্যে বাবুপুর গ্রামের বাসিন্দারা স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তা করলে ১০০ জন পুলিশের এক নির্দয়বাহিনী গ্রামবাসীদের ওপর খুব অত্যাচার করল।

পুলিশী অত্যাচারের ভয়ে গ্রামবাসীরা কেউ সাহায্য না করায় স্বেচ্ছাসেবকরা অনাহারে দিনাতিপাত করতে থাকলে গান্ধীজির সেক্রেটারি কৃষ্ণদাসজি বাবুপুরে ৩ দিন অনশন করেন।

Notice under Section 14 of the
Legal Practitioners' Act (XVIII of 1879

To

Babu [illegible]

Pleader
Munsif's courts,
Tamluk.

Please take notice that the accompanying charge under sec. 13(b) & (f) of the Legal Practitioners' Act has been framed against you and it will be taken into consideration on Saturday the 24th May, 1930, at 7 A. M.

[illegible] [illegible]

Munsif, [illegible] Court,
Tamluk.

CHARGE.

Whereas you Babu [illegible]

being a pleader of this Court joined the Hartal

of the local Bar in furtherance of the common object of the boycott of Courts on the 15th and 16th April, 1930, and whereas you were engaged as a pleader in the marginally noted suits and pending in this Court, that were fixed for of for orders on the date and for the party mentioned against them, and whereas you wilfully neglected your client's work and acted to the prejudice of their interest by a[illegible] from the Court on that date, you thereby committed grossly improper conduct in the discharge of your

section 13(b) of the Legal Practitioners' Act (Act XVIII of 1879) and you have further been guilty of misconduct by joining the said movement to boycott Courts and paralyse the work of the Courts and absenting yourself from the Court on the 15th and 16th April, 1930, without any lawful excuse, under section 13(f) of the said Act.

Dated the 5th May, 1930.

Munsif, 4th Court
Tamluk.

এর পরে গ্রেপ্তার হয়ে ৬ মাসের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। আইন অমান্য সমিতির কাজের জন্য সুতাহাটা থানার বাসুদেবপুরের কুমার চন্দ্র জানা, বাড়বাসুদেবপুরের ননীগোপাল কুইতি, পাঁশকুড়া থানার রাসগাছতলার শ্রীনাথচন্দ্র পাত্র, কেশবপাটের চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কালিদানের যতীন্দ্রনাথ সাঁতরা নিজেদের বসতবাড়িগুলো দান করে দিলেন। মহিষাদল থানার সরবেড়িয়া গ্রামের শ্রীপতিচরণ বোয়াল নতুন বাড়ি তৈরি করে দিলেন।

জুন মাসে আইন অমান্য কেন্দ্র থেকে ভিন্নধর্মী আন্দোলন হয়। মহকুমার প্রায় সর্বত্র মদ, গাঁজা আর তাড়ির দোকানগুলোতে পিকেটিং হল। ফলে অনেককেই কারাবরণ করতে হয়েছিল। ১৫ই জুন রাত্রি তিনটেয় আইন অমান্য-র অন্যতম দুটি কেন্দ্র বর্গভীমার মন্দির এবং হ্যামিলটন স্কুল ঘেরাও করে পুলিশ ১১ জন সত্যাগ্রহীকে তুলে নিয়ে গেলেও বিকেল ৪টার সময় সবাইকে ছেড়ে দেয়। স্কুলগুলো থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সদর মহকুমার খেরাই গ্রামে এক গর্ভবতী মহিলাকে বেদম প্রহার করল পুলিশ। গুলিচালিয়ে ১০ জনকে মেরে ফেলল ওরা। আহত হলেন ৫০ জন।

জুন মাসের শেষের দিকে মহকুমার চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন পুনরায় শুরু হয়। ২২শে জুন পাঁশকুড়া থানার চৌকিদার গোবর্দ্ধন দাস চাকরি থেকে পদত্যাগ করলে আরও অনেক চৌকিদার পদত্যাগ করে নিজেদের পোষাকগুলো এস.ডি.ও.-র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা হলেন,—

নাম	গ্রাম	থানা
গোবর্দ্ধন দাস	—	পাঁশকুড়া
ক্ষেত্রমোহন মাইতি	হিজলবেড়্যা	তমলুক
মহেন্দ্রনাথ মাইতি	কুরপাই	তমলুক
গোপাল চন্দ্র বেরা	কুরপাই	তমলুক
শিব দাস	জয়কৃষ্ণপুর	তমলুক
চিন্তামনি মণ্ডল	—	তমলুক
অমরনাথ বাড়ি	খামারচক	তমলুক
সন্ন্যাসী সিংহ	হরশঙ্কর	তমলুক
চরণ মণ্ডল	—	তমলুক
কৃত্তিবাস দয়ালী	—	তমলুক
বিপিন চন্দ্র শাসমল	গড়কিল্লা	তমলুক
সারদা প্রসাদ দাস	টুল্যা	তমলুক
শশীভূষণ বর	খামারচক	তমলুক
ধরণী মণ্ডল	রাজহাটী	তমলুক
হারু দাস	রসিকপুর	তমলুক
কৃষ্ণ দাস (দফাদার)	মিরিকপুর	তমলুক

নাম	গ্রাম	থানা
মহেন্দ্র নাথ মাইতি	—	তমলুক
সারদা ঘড়া	ঘাটোয়াল	মহিষাদল
গোবর্দ্ধন ঘড়া	টিকারামপুর	মহিষাদল
চৈতন্য মণ্ডল	ইচ্ছাপুর	মহিষাদল
অমরফকির জানা	কাঞ্চনপুর	মহিষাদল
সতুদ্দিন মিঞা	লাইকুড়ি	মহিষাদল
হারাধন সামন্ত	রাউতুড়ি	মহিষাদল
গোপালচন্দ্র দিণ্ডা (সহকারী পঞ্চায়েত)	রাউতুড়ি	মহিষাদল
যোগী দাস	বাড়বইচবেড়িয়া	মহিষাদল
৪নং ইউনিয়নের ১০ জন চৌকিদার	—	মহিষাদল

চৌকিদারদের পদত্যাগের ফলে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের জন্য জেলার অন্যান্য জায়গা থেকে ৫০০ জন পুলিশ আমদানী করা হল তমলুক মহকুমায়। অক্টোবরের প্রথমদিকে চাউলখোলা গ্রামের একজন চৌকিদার চাকরী ছেড়ে দিলে সুতাহাটার বড় দারোগা ঐ চৌকিদারকে ধরবার জন্য একজন পুলিশ নিয়ে গ্রামে ঢুকলে শঙ্খধ্বনী শুনে কাতারে কাতারে মানুষ বাধা দেওয়ার জন্য জমায়েত হয়। পুলিশ সবাইকে ওখান থেকে সরে যেতে বলে। পুলিশের আদেশ অমান্য করার অপরাধে পুলিশ জনতার উপর গুলি চালিয়ে দিল। ১০-১২ জন আহত হয়েছিল, এর মধ্যে ৩ জন আহত হয়েছিলেন গুরুতরভাবে।

১৯৩১-এর ৬ই এপ্রিল থেকে সারা বছর ধরে ব্যাপকভাবে পুলিশি অত্যাচার চললেও ১৯৩২-এর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় মহাসমারোহের সঙ্গে সারা তমলুক মহকুমায় — সুতাহাটা থানার বাড়বাসুদেবপুর, নন্দীগ্রাম থানার নন্দপুর, পাঁশকুড়া থানার কালীদান, ময়না থানার পরমানন্দপুর, মহিষাদল থানার রাউতুড়ি আর ব্যবর্ত্তারিহাট এবং তমলুক থানার ডিমারীহাটে। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে তমলুক শহরে ৪০০০ লোকের একটি সমাবেশ শহর প্রদক্ষিণ করে তমলুক আদালতের সামনে পতাকা উত্তোলন করে। পুলিশ লাঠি চালায়। ৩০০ জন লোক গুরুতর আহত হল। ১০০ জনকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। এর মধ্যে ৪০ জন আন্দোলনকারীর জেল হল দেড় মাস থেকে তিন মাস।

আন্দোলনে কাঁথি মহকুমা ঃ

তমলুক মহকুমার মত কাঁথি মহকুমাও পিছিয়ে থাকল না এই আন্দোলনে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্টের ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের চেষ্টা ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল-এর নেতৃত্বে এর গঠনের বিরোধিতা এবং ট্যাক্স দেবো না আন্দোলনে দুই মহকুমার মানুষের যোগদানে

মেদিনীপুর জেলায় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক জোয়ার এসেছিল। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি গতি সঞ্চার করেছিল ত্রিশের দশকের আইন অমান্য আন্দোলনকে। আনন্দবাজার পত্রিকার আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হল,

> 'শ্রীযুক্ত শাসমল মহাশয়ের অপূর্ব সংগঠনের কৌশলে, মন্ত্রসিদ্ধির জন্য একাগ্র সাধনা ও অনাড়ম্বর অদ্ভুৎ কর্ম্মশক্তিতে কাঁথি ও তমলুকবাসীরা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। সরকার মালক্রোক করিয়া খরিদ্দার পান নাই, কিছুতেই তমলুকবাসীদের দমাইতে পারেন নাই। কাঁথি ও তমলুকবাসী জয়ী হইল। এক মুহূর্ত্তে তাহাদের চক্ষু খুলিল, নিজ শক্তিতে অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিল। সংগ্রামের সিদ্ধির দিক নির্ণয় হইল।'

সারা দেশজুড়ে লবণ আইন অমান্য করার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের পর কাঁথি মহকুমাতেও ছড়িয়ে পড়ল আন্দোলনের আগুন। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি, ঈশ্বরচন্দ্র মাইতিকে সম্পাদক, সতীশচন্দ্র জানা, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি প্রভৃতিকে নিয়ে কাঁথি মহকুমা আইন অমান্য পরিষদ তৈরি হল মার্চ মাসের শুরু থেকেই। এদের সঙ্গে যোগ দিলেন স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ঝড়েশ্বর মাঝি এবং স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বসন্তকুমার খাঁন। সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় আইন অমান্য-র স্থান নির্ণয়ে কাঁথি এলেন বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের সম্পাদক প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। ৬ই এপ্রিল লবণ আইন ভাঙার জায়গা স্থির করলেন পিছাবনীতে। আর পরিচালনার শিবির হয়ে উঠল কাঁথির জাতীয় স্কুল। ৫ই এপ্রিল সন্ধ্যেবেলাতেই বাঁকুড়া থেকে ৩৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে পদব্রজে কাঁথি পৌঁছে গেলেন বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের সভ্য শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলে ও পায়ে হেঁটে বিভিন্ন জায়গা থেকে সভ্যরা জড়ো হলেন কাঁথির আইন অমান্য শিবিরে।

৬ই এপ্রিল থেকে ১০ই এপ্রিল পিছাবনী কেন্দ্রে লবণ আইন অমান্য করার কাজ চলল। ১১ই এপ্রিল গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর মাঝি, বসন্তকুমার দাস। ১৩ই এপ্রিল গ্রেপ্তার হলেন প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র মাইতি, সতীশচন্দ্র জানা এবং নিকুঞ্জবিহারী মাইতি। গ্রেপ্তার সত্যাগ্রহীদের উৎসাহিত করে তুলল। ফলে গ্রেপ্তারের বদলে দমননীতিকে কঠোর করে তুলল ব্রিটিশ প্রশাসন। 'চপেটাঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া লাঠির ও বেতের ঘা, বুটের ঠোক্কর, সবুট পদতলে নিষ্পেষণ, গুহ্যদ্বারে লাঠি প্রবেশ ও মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ পর্য্যন্ত সর্বপ্রকার অত্যাচারে সত্যাগ্রহীরা জর্জরিত হইয়াছিল ...' তবু হাটে বাজারে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রি হতে থাকল। তাই আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাঙ্গলার আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাসে কাঁথি ও তমলুকের স্থান শীর্ষদেশে।'

'লাঠি হার মানিল; বেড়াজালে ধরা ব্যর্থ হইল বাকি রহিল গুলি চালান।' এই গুলিই চালিয়ে দিল পুলিশ পটাশপুর থানার প্রতাপদীঘিতে ১লা জুন রবিবার। বাগমারীর রামকৃষ্ণদাস (২৫ বছর বয়স) এবং শ্রীরামপুর গ্রামের কার্ত্তিক চন্দ্র মিত্র (১৭ বছর বয়স) মারা গেল পুলিশের গুলিতে।

জুন মাসে বর্ষার কারণে নুন তৈরি বন্ধ করা হল। ফলে আইন অমান্য অন্তর্হিত হলে তার জায়গায় এল ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন। এই ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটল এগরা থানার চোরপালিয়ায়। ঘরশত্রু বিভীষণের মতই স্থানীয় এক ব্যক্তির মিথ্যা স্তোকবাক্যে চোরপালিয়া-র অদূরের গ্রামগুলোর মানুষেরা যখন ভালো মানুষের মত পুলিশের কাছ থেকে ট্যাক্স সম্পর্কে কিছু বুঝবার জন্য একটি পুকুরের পাশে দিয়ে সংকীর্ণ পথে হেঁটে আসছিল, তখন ক্ষীরোদ জানা আর ব্রজ পণ্ডার বাড়িতে লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র পুলিশ ট্যাক্স চেয়ে বসল। পুকুরের টইটুম্বর জলে মানুষগুলো পড়ে গেল পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে। বাঁচা আর হল না। ভয়ে জলে ডুবে মারা গেল বৈকুন্ঠপুরের কনক জানা (১৮), সুরিষার গোপীনাথ দাস (২৬), কুটিগিরির দিবাকর বেরা (২৫), বরদার রুদ্র শাসমল (৩০) এবং জগুলিয়ার কার্ত্তিক রাণা (১৪)।

তমলুক বা কাঁথি মহকুমার মত এই এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার পিংলা থানার ক্ষীরাই গ্রামে ও তার আশপাশের অঞ্চলে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন দমনের জন্য পিংলা থানার বড়দারোগা, খড়্গপুরের বড় দারোগা আর সদর থানার দারোগা ৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ এনে মোতায়েন করে গুলি চালানোর ভয় দেখাল গ্রামবাসীদের। প্রত্যুত্তরে আন্দোলনের নেতা ভীম জানা এবং তাঁর সহকর্মীরা বক্ষোন্মচন করে বলেছিলেন, 'গুলি করিবেন করুন, প্রাণের ভয়ে পালাইব না। তবে জানিয়া রাখুন আমরা মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত, অহিংসা আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ধর্ম্মযুদ্ধে নিরত।' সাধারণ মানুষের এত সাহস, পুলিশের আদেশ এমনভাবে অবহেলা করবার মত স্পর্দ্ধা দেখে পুলিশ মুহূর্ত্তকাল মোহাবিষ্টের মত থেকে পর মুহূর্ত্তেই গুলি চালিয়ে দিল।

'ভীমা জানা অপর দশজন দেহের পুরোভাগে গুলিবিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইল। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় নিহত ব্যক্তিদের কেহই বুক বা দেহের সম্মুখ ভাগ ছাড়া পশ্চাৎভাগে বিদ্ধ হয় নাই।' যে বার জন সেদিন প্রাণ দিলেন তাঁরা হলেন,—

ভীমচন্দ্র জানা (১৫)	৭। শ্রীমন্ত চরণ মাইতি
অদ্বৈত চরণ ধাড়া	৮। মহেশ্বর মাইতি
গুণীন্দ্র নাথ খাঁড়া	৯। অধর সিংহ
নরেন্দ্র পাড়ুই	১০। বাবুলাল জানা
নরেন্দ্র নাথ দাস	১১। পূর্ণানন্দ ঘোড়ই
বিপিন চন্দ্র খাটুয়া	১২। ধরণীধর জানা

সরকারী নির্যাতনের চূড়ান্ত সীমার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী বললেন, —

'লোকেরা অহিংস লবণ আইন ভঙ্গ করার শাস্তি তাঁহারা ভোগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু গভর্ণমেন্ট নির্যাতন আরম্ভ করিয়াছেন। লোকে ভাঙ্গিতেছে কেবল লবণ আইন, আর গভর্ণমেন্ট ভাঙিতেছেন সমস্ত আইন — এমনকি মনুষ্যত্বের আইন।'

স্বাধীনতার যুদ্ধ ঃ রণাঙ্গণ চেচুয়াহাট

না, এটা কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণ নয়। রামায়ণের যুদ্ধক্ষেত্র নয়। নয় অশোকের ওড়িশার ধৌলির রণাঙ্গণ। পলাশীর প্রান্তরও নয়। এই রণাঙ্গণ চেচুয়াহাট। পাঁশকুড়া-ঘাটাল রাস্তার বাস স্টপেজ গৌরা। গৌরা-র খুব কাছে চেচুয়াহাট। মোহনখালি খাল-এর পাশে সবুজ বনানী ছায়ায় স্নিগ্ধ পরিবেশে মেদিনীপুর জেলারই ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার হাট। গ্রামের নামেই হাট। লোকে আদর করে 'চেঁচোর হাট'-ও বলে।

সেদিন জুন মাসের ৫ তারিখ, ১৯৩০। সূর্য্য পাট ভেঙে সবুজ বনানী ডিঙিয়ে সবে এগিয়েছে। প্রায় ৮টার কাছাকাছি। চেচুয়াহাটের আকাশে বাতাসে হঠাৎই বন্দুকের আওয়াজ — গুড়-ডুম-গুড়ুম-গুড়ুম। গুলি চালিয়েছে স্বয়ং অতিরিক্ত জেলাশাসক করিম সাহেব। পুলিশ খুনের তদন্তে জেলার আরও এক পদস্থ অফিসার এস. কে. ঘোষ (সম্ভবতঃ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) আর ১৮জন সশস্ত্র পুলিশকে সঙ্গী করে চেচুয়াহাটে এসে দেখলেন পাশের শুকনো খাল-এর বাঁধের ওপর শাঁখ বাজানোর শব্দ আর বাঁশীর আওয়াজের যাদুমন্ত্রে প্রায় ৬০০০-এরও বেশী লোক লাঠি-সোঁটা হাতে নিয়ে জমায়েত হয়ে ঘিরে ফেলেছে খুনের তদন্তকারী দলকে। জনতা এতই ক্ষিপ্ত যে ভয়ে তদন্তে আসতে পারেননি ঘাটালের মহকুমা শাসক। বাধ্য হয়েই এসেছেন করিম সাহেব নিজে। উত্তেজিত জনতার মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজনকে ডেকে সবাইকে সরে যেতে বললেন। দলপতি বিনিময়ে বন্দীমুক্তির দাবি করলেন। আশ্বাস চাইলেন ইংরেজ সেনানীর, নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর গুলি না চালানোর। আশ্বাসের বিনিময়ে করিম সাহেব চাইলেন ভোলানাথ দারোগার খুনীদের নাম। তিন মিনিট সময় দিলেন সুড় সুড় করে স্থান ত্যাগ করার। নতুবা গুলিই চালাবেন তিনি। কিন্তু দলপতির নির্ভীক উত্তর। তিনি বললেন যে, করিম সাহেবের লোক গুলি চালালে তারাও গুলি চালাবে। গ্রামবাসীদের নির্যাতিত না করলে তবেই তারা সরে যাবে। দলপতির আচরণে ক্রুদ্ধ হলেন করিম সাহেব। সশস্ত্রবাহিনীকে গুলি চালানোর আদেশ দিলেন। কিন্তু কাজটা অন্যায় ভেবে আদেশ অমান্য করলেন বাহিনীর লোকেরা। তাই গুলি চালালেন করিম সাহেব নিজেই। ঝরে পড়ল ৮টি তাজা প্রাণ। আহত হলেন ১২ জন। নিজের গুলি চালানোর সাফাই গেয়ে বললেন যে উপস্থিত সশস্ত্র সিপাহীরা গুলি চালনায় বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত নয়। কিন্তু কেন গুলি বর্ষণ?

জেলায় তখন লবণ আন্দোলনের জোয়ার। গণ জাগরণে তমলুকের নরঘাট, কাঁথির পিছাবনী এবং জেলার অন্যান্য জায়গার মতই চেচুয়াহাট-এর ১০ মাইল আশপাশের সোনাখালি, বন্দেরগঞ্জ (?), নন্দনপুর ইত্যাদি গ্রামগুলোর হাজার হাজার মানুষেরা

মাদারিপুরের ভলান্টিয়ারদের এবং যুগান্তর দলের পূর্ণ দাস-এর সহায়তায় পুষ্প চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতিরোধে এক দুর্ভেদ্য বলয় গড়ে তুলেছে। সাধারণ মানুষেরা প্রতিরোধ কর্মীদের বিনা পয়সার খাওয়া এবং বাসস্থানের সুচারু ব্যবস্থা করেছেন। ওরাও লবণ আইন অমান্য করবার জন্য বিলাতি দ্রব্য বর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন সাধারণ মানুষজনদের। মিলিটারি কায়দায় প্রশিক্ষণ দিয়ে ধীরে ধীরে আইন অমান্যয় উৎসাহিত করেছেন স্থানীয় মানুষদের। এই প্রশিক্ষিত লোকজনেরা একদিন চেচুয়াহাট-এ লবণ আইন অমান্যসহ বিলাতী সামগ্রী বর্জন করার চেষ্টা করেছিলেন। সেদিন জুন মাসের ৩ তারিখ, ১৯৩০। সকাল সাড়ে নটা। দাসপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর ভোলানাথ ঘোষ আর এক সাব-ইন্সপেক্টর অনিরুদ্ধ সামন্ত এবং কিছু পুলিশ নিয়ে চেচুয়াহাটে এসেছেন আইন অমান্যকারীদের গ্রেপ্তার করে ওখানে শান্তি স্থাপন করবেন। কিন্তু শান্তির বদলে অশান্তিই করলেন বেশী করে। লবণ আইন অমান্যকারী মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সহ আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করলেন ভোলানাথ ঘোষ। তারপরেই বেধড়ক পেটাতে শুরু করলেন ভলান্টিয়ারদের। গ্রেপ্তার আর মারধোর করার পর একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য হাটের নিবারণ ডাক্তারের চেম্বারের সামনের বেঞ্চে বসলেন। মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যও একই বেঞ্চে বসলেন। আসামী বসবে এই সারিতে! আপত্তি করলেন পুলিশকর্তা ভোলানাথ ঘোষ। মৃগেন্দ্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন যে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের মত তিনিও একজন সম্মানিত ব্যক্তি। কথায় প্ররোচিত হল সাব-ইন্সপেক্টর। উত্তেজিত হয়ে বেত্রাঘাত করলেন মৃগেন্দ্রনাথকে। শুরু হয়ে গেল লড়াই। মৃগেন্দ্রনাথ সাব-ইন্সপেক্টরের হাতেরই বেত ছাড়িয়ে নিয়ে আঘাত করলেন তাকে। অন্য বন্দীরাও অনুসরণ করল মৃগেন্দ্রনাথকে। অগত্যা ভোলানাথ নিজেকে বাঁচাতে আশ্রয় নিলেন নিবারণ ডাক্তারের দোকানের ভেতর। ঘটনার বিবরণ লিখতে বসলেন। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল ৩টা। হঠাৎ স্থানীয় মানুষেরা শঙ্খধ্বনির বিপদসংকেত বাজিয়ে জড়ো করতে লাগলেন আশপাশের হাজার হাজার মানুষকে। ক্ষিপ্ত জনতা নিবারণ ডাক্তারের চেম্বারের মধ্যেই চড়াও হলেন ভোলানাথ ঘোষ এবং তার সঙ্গীসাথীদের ওপর। কিছুদিন আগের শ্যামগঞ্জের ভলান্টিয়ারদের ওপর জঘন্য নিগ্রহের প্রতিবাদে নিবারণ ডাক্তারের চেম্বারেই নৃশংসভাবে খুন করলেন ভোলানাথকে। ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে হত্যা করা হল ভোলানাথকে। তারপর তার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিল ওরা। অপর সাব-ইন্সপেক্টর অনিরুদ্ধ সামন্তের হদিসই কেউ পেল না। পুলিশ রিপোর্ট বলছে অনিরুদ্ধ সামন্তকে চেচুয়াহাট থেকে রবিদাসপুরের পার্বতী দিণ্ডার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পার্বতী, গোষ্ঠ মান্না এবং অন্যান্য ভলান্টিয়াররা ভোলানাথ ঘোষের খুনের কায়দায়ই খুন করেছিল।

এই খুনেরই কিনারা করে খুনীদের ধরতে সঙ্গীদের নিয়ে নিজেই এসেছেন করিম সাহেব। কিন্তু ধরবেন কাকে? সেদিনের ভোলানাথ ঘোষ হত্যাকাণ্ডের ভলান্টিয়ারদের নেতা প্রভাকর রায়, স্কটিস চার্চ কলেজের ছাত্র হরিসাধন মাইতি, ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, সুধাকর

ঘোষ, পুলিন দুয়ারি এবং অন্যান্য ভলান্টিয়াররা নন্দনপুর ছেড়ে ঐদিন রাত্রেই পাঁশকুড়া হয়ে কলকাতায় চলে গেছে। চেচুয়াহাট আর তার আশপাশের অঞ্চলের অবস্থাও খুবই খারাপ। ভয়ঙ্কর উত্তেজক অবস্থা। উত্তেজনার কিছু আন্দাজ করা যায় করিম সাহেবের রিপোর্ট থেকেই। তিনি লিখছেন,

"All the Government work is paralised in this area and I am concerned that if this area is not effectively brought under control soon, the conflagration will spread to other parts. It would be too much to ask officers to go to this parts in the present condition before some effective measures are taken to calm down the locality and unless they are supported with sufficient armed men. The bander volunters' must be uprooted without delay and the organisation at Sonakhaly, Nandanpur, etc destroyed."

এমনই অবস্থায় পৌঁছে গুলি চালিয়েছেন করিম সাহেব। গুলি খেয়ে গোলাবাঘের মতই রে-রে করে তেড়ে এসেছিল অত্যাচারিত গ্রামবাসীর দল। তাড়া খেয়ে পেছন ফিরতে ফিরতে শ্যামগঞ্জ হয়ে ঘাটালে ফিরে এসেছিল করিম সাহেবের দলবল। ঘাটাল ফিরেই ৭ই জুন ওপরের ওই রিপোর্টটি পাঠিয়েছিলেন জেলাশাসক পেডি সাহেবের কাছে। সারা মেদিনীপুর জেলার ভয়াল ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ মিছিলের সামাল দিতে পেডি সাহেব এমনিতেই জেরবার। তবুও উপেক্ষা করতে পারেননি চেচুয়াহাট ঘটনার গভীরতা। তাই একটুও দেরী না করে ৮ তারিখের সন্ধ্যাতেই তিনি ৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে চলে এসেছেন ঘাটালে। ওখানে আগে থেকেই জেলা শাসকের জন্য আরও ৫০ জন আসাম ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস-এর জওয়ান নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল। পেডি ঐদিন রাত্রি আজুড়িয়া সরকারী পরিদর্শন বাংলোয় কাটিয়ে পরদিন রওয়ানা দিলেন কাছেরই 'চেচুয়াহাট'-এ। ওখানেই ঐদিন যোগ দিল ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস-এর আরও ৭০ জন জওয়ান। সম্মিলিত বাহিনী চেচুয়াহাটে পৌঁছতেই জেলাশাসক পেডি কোনরকম দয়ামায়া না করে দেখামাত্রই গুলি করার নির্দেশ দিলেন সশস্ত্র বাহিনীকে। কোন আন্দোলন তিনি বাড়তে দিতে চান না। কারণ তিনি খবর পেয়েছেন যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তখন সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে না থাকলেও কাঁথি অবস্থান করে জেলার আন্দোলনকারীদের ভেতরে ভেতরে পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি জেলায় সবচাইতে ভয় পান শাসমলকে। গুলির নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি দাসপুরে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করার খরচা চালানোর জন্য দাসপুরের জনগণের উপর 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'-এর মত 'পিউনিটিভ ট্যাক্স' বসিয়ে দিলেন। কারণ পুলিশের আই. জি. জেলার জন্য ৩০০ জন সশস্ত্র পুলিশ পাঠাবেন সপ্তাহের মধ্যেই। তার মধ্যে ১০০ জন পুলিশ দাসপুরের জন্য। দাসপুরে থাকা পুলিশের খরচা জোগাতে হবে দাসপুরেরই মানুষকে। কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "The area is a fertile one. The inhabitants grow not only pady but also sugercane, vegetables and jute, and they are able to pay for the 100 additional police".

জেলাশাসক পেডি আর তার সঙ্গী সাথীদের সাঁড়াশী তল্লাসীতে মৃগেন ভট্টাচার্য্য এবং আরও ৪৪ জন ধরা পড়ে গেল। বিচার চলল বিশেষ ট্রাইবুন্যালে। বিচারটি 'দাসপুর হত্যা কেস' নামে বিশেষ পরিচিত। ট্রাইবুন্যালের বিচারে —

১। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন —

নাম	সম্ভাব্য বাড়ি	নাম	সম্ভাব্য বাড়ি
মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	কলোড়া	শীতল ভট্টাচার্য্য	জালালপুর
ভুতনাথ মান্না	শৈলেশ (?)	সুরেন্দ্র বাগ	শাকন্দারী
ব্রজ ভুঁইয়া	গোবিন্দনগর	যোগেন্দ্র হাজরা	তাতারখান
অস্টাম হাজরা	তাতারখান	কালাচাঁদ ঘাঁটি	জালালপুর
জীবন পতি	গোবিন্দনগর	বিনোদ বেরা	সোনাখালি
কালিপদ সামন্ত	সিনচক	কানন গোস্বামী	—

২। ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন —

পার্বতী দিণ্ডা	রবিদাসপুর	যুগল মাল	গুছাতি
প্রবোধ মণ্ডল	রাধাকান্তপুর	যতীন্দ্রনাথ দাস	নন্দনপুর (?)
বংশী দোলই	পাঁচবেড়িয়া		

হাইকোর্টের এক আপীল আদেশে মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এবং কালাচাঁদ ঘাঁটির যাবজ্জীবন দণ্ডাবদেশের বদলে ৭ বছরের কারাদণ্ড হল। জীবন পতি আর কালিপদ সামন্তের যাবজ্জীবনের বদলে ২ বৎসর। বেকসুর খালাস পেলেন পার্বতী দিণ্ডা, বংশী দোলই, প্রবোধ মণ্ডল এবং যতীন্দ্রনাথ দাস। এছাড়াও দলের অন্যান্যদের মধ্যে অভিযুক্ত হয়ে বেকসুর খালাস পেলেন অথবা আত্মগোপন করেছিলেন তারা হলেন —

নাম	সম্ভাব্য বাড়ি	নাম	সম্ভাব্য বাড়ি
তারাপদ মণ্ডল	ক্ষেপুত	অষ্টাম হাজরা	তাতারখান
দুলাল মণ্ডল	গুছাতি	পুলিন দুয়ারি	নন্দনপুর
হরিসাধন মাইতি	নন্দনপুর	যোগীন্দ্র হাজরা	তাতারখান
গোষ্ঠ পাত্র	সোনাখালি	প্রভাকর রায়	নন্দনপুর
ধরণী দোলই	চকবালিয়া	ভূষণ জানা	বাঁশখাল
বৈদ্য পাল	রাধাকান্তপুর	আশুতোষ হাজরা	তাতারখান
অবিনাশ ঘোড়ই	রাধাকান্তপুর	শরৎ পাল	মোহনমাইতিচক
পুষ্প চ্যাটার্জী	মাদারিপুর	হরিপদ মাজী	কলোড়া
জগদীশ চন্দ্র সেন চৌধুরী	—		

অত্যাচারী জেলাশাসক জেমস পেডি এইভাবেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন

চেচুয়াহাটের কংগ্রেস কর্মীদের পাঁজরে। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "দাসপুর ইজ নাউ সেফ"। সেফ যে মোটেই ছিল না তার কারণ — সঙ্ঘবদ্ধ মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে বিশেষ করে দাসপুরকে শায়েস্তা করতে আরও বেশী পুলিশ মোতায়েন করলেন আরও বেশীদিনের জন্য। অন্য জেলার পুলিশী ব্যবস্থা দুর্বল করেও দাসপুরে আনিয়েছিলেন পুলিশ। এত করেও তিনি দুর্ভেদ্য করে রাখতে পারেন নি নিজেকে। যে আগুন তিনি চেচুয়াহাটে লাগিয়েছিলেন তারই স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

সারা জেলার মানুষ শপথ নিল অত্যাচারী এই পেডি নামের দানবটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার। আর চেচুয়া কাহিনীর এক বছরের মধ্যেই চেচুয়া ঘটনার নায়ক ভোলানাথ ঘোষের মতই প্রকাশ্যে দিবালোকে খুন হলেন চেচুয়াহাট রণাঙ্গনের আর এক অন্যতম নায়ক জেলাশাসক জেমস পেডি। সে দিনটা ১৯৩১-এর ৭ই এপ্রিল।

হিজলী বন্দী নিবাসে

রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা। ১৬ই সেপ্টেম্বর। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ, হিজলী জেলের ডেটেনিউ ক্যাম্পের অ্যালার্ম ঘড়িটা হঠাৎ বেজে উঠল। নামেই জেল। আসলে জেলার অন্যান্য জেলগুলি পরিপূর্ণ থাকায় অস্থায়ীভাবে তৈরী হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বন্দীর থাকবার অস্থায়ী বন্দীনিবাস। দরমার দেওয়াল, পাকা মেঝে, শালবল্লীর থাম্বার মাথায় টিনের চালের ব্যবস্থা। কিছুটা অংশ পাকা।

ঘড়িটা বেজে ওঠার কারণ, হঠাৎই ক্যাম্পের ভেতরে গুড়-ডু-ডুম, গুড়-ডু-ডুম, গুডুম, গুডুম বন্দুকের আওয়াজ। রাতের আহার শেষ করে সবে বিছানায় যাওয়া বন্দীরা সচকিত হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। হাবিলদার রহমান খানের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন সশস্ত্র সৈনিক এবং লাঠি ব্যাটন হাতে দু-ডজন সিপাই বন্দীশিবির ঘিরে ফেলে অতর্কিতে ভেতরে গুলি চালিয়েছে। একশ-র কাছাকাছি গুলি ছুঁড়ে দিয়েছে ওরা। শিবিরের ভেতরেই অসুস্থ বন্দীদের জন্য নিৰ্দ্ধারিত কামরাটিকেও (নামে হাসপাতাল) রেয়াত করেনি ওরা। বন্দীনিবাসের মধ্যে এবং কাছাকাছি বাইরে ছড়িয়ে থাকা ৮ চৌকি রাস্তার টহলদারি পুলিশও এক সঙ্গে গুলি ছুঁড়েছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বন্দী বিপ্লবী নেতা সন্তোষ কুমার মিত্র এবং ওপরতলায় দাড়িয়ে থাকা বন্দী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত অসহায় অবস্থায় মারা গেলেন। গুলি করা থেকে মৃত্যু মাত্র ১০ মিনিট সময়। কিন্তু ঘটনার রেশ বড় ব্যাপক। পুলিশ বাহিনীর কম্যান্ডেন্ট মি. বেকার (Mr. Baker) ঘটনার একটা টেলিফোন কল্ পেয়েই দৌড়ে গেলেন ঔষধপত্র নিয়ে। গুরুতর আহতদের নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। বন্দীনিবাসের বাকী বন্দীরা ঘটনাটিকে সম্পূর্ণরূপে, "Unprovoked, unwarranted, premidated and prearranged" হিসেবে দাবি করে জেলাশাসককে বেসরকারীসংস্থাকে দিয়ে অনুসন্ধানের আবেদন জানিয়ে ঘটনার অব্যবহিত পরে আমৃত্যু অনশনে বসলেন। খবর গেল কলকাতায় কংগ্রেস দলের কাছে। আকস্মিক এই ঘটনার ক্রুরতায় সুভাষ চন্দ্র বসু, জে. এম. সেনগুপ্ত, অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সতীশ সেন সহ অনেকেই দ্রুত পৌছলেন হিজলীর বন্দীনিবাসে। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন ম্যাজিস্ট্রেট। অবশ্য মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের পর তিনি ওদের হাতে সমর্পণ করলেন। দিকে দিকে খবর রটে গেল। অন্য জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা হিজলী জেলের বন্দীদের সমর্থনে আমৃত্যু অনশন শুরু করল। ধর্মঘটে সামিল হল স্কটিশচার্চ, রিপন, বঙ্গবাসী ও বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্ররা। কলিকাতা কর্পোরেশন ও লেগিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী হ'ল তোলপাড়।

সংবাদপত্রগুলিও নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠল। ১৯শে সেপ্টেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকা লিখল ঃ

"Are we to believe that excepting opening fire there was no other means of getting unarmed prisoners under control ? Were the prisoners trying to escape or had they invited the sentry to an armed conflict ? It is a mystery which envelopes this intolerable grevious incident."

ঐ একই দিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লেখা হল ঃ

"... the culprits must be brought to book and the Hijli Camp where this terrible tragedy has happened must forthwith be broken up and the detenus released."

কলকাতার দৈনিক পত্রিকা 'নায়ক' একইভাবে ঐদিন লিখল ঃ

"We are surprised to find how all ideals of the civilised world are gradually disappearing from India under British rule ... In the language of law, the murder at Hijli was a deliberate murder or a wilful murder."

প্রথমে জেলাশাসক ডগলাস এবং পরে বাংলার ডেপুটি সেক্রেটারি মিঃ হাচিংস (Hutching) - এর করা তদন্ত সম্পর্কে ২১শে সেপ্টেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকা মন্তব্য করল ঃ

"Does Sir, stanley Jackson think that the sort of enquiry that has been held first behind the back of the detenus is sufficient? One could conceive nothing more farcial than a hide and seek enquiry that is reported to have been held first by Mr. Douglas, District Magistrate, next by Mr. Hutchings, Deputy Secretary to the Government of Bengal."

এরকম বাধ্য হয়েই জনরোষ এড়াতে বাঙলার সরকার বিচারপতি মি. মল্লিক এবং রাজশাহী বিভাগের কমিশনার ড্রুমন্ড সাহেবকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গড়লেন। তদন্ত কমিটির সামনে প্রথমে বন্দীদের প্রতিনিধি সুশীল চ্যাটার্জী কথা বললেন না। পরে অবশ্য কংগ্রেসের নেতাদের কথায় সম্মত হয়েছিলেন। তদন্ত কমিটি তদন্তে এসে সিপাহীদের অভিযোগ যেমন শোনেন নি, তেমনই বন্দীদের অনেক কথাই মানেন নি। তবুও ঘটনার ব্যাপকতা কতখানি ছিল তা জানা যায় ঐ 'তদন্ত কমিটি'র রিপোর্ট থেকেই।

তদন্তে ওঁরা বললেন, ".... Some 29 rounds were fired by the sepoys up on the building itself resulting in the death of two of the detenues and the infliction injures on several others."

তাঁরা তাঁদের ঐ রিপোর্টে গুলি চালনার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, "...there are no justification whatever for the indiscriminate

firing ... There is no justification either for some of the sepoys going into the building itself and causing casualties of various kinds to some others of the detenues." মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস অবশ্য বন্দীদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। সমস্ত দেশ কাপুরুষোচিত এই হত্যাকাণ্ডে গর্জে উঠল। হিজলীর এই বর্বরোচিত অত্যাচারের এক প্রতিবাদ সভা হ'ল কোলকাতায় ১৯৩১-এর ২৬শে সেপ্টেম্বর। লক্ষ লোকেরও বেশী মানুষের উপস্থিতিতে কোলকাতার অক্টারলনি মনুমেন্টের তলায় মানুষের প্রতিবাদ শুনলেন সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ সভায় বললেন ঃ

'এই যে হিজলীর গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

'এত বড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক, কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষক-নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

'যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয় তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত সেখানে প্রজা রক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে সেই সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্র জাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

'এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতার, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি। এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

'আমি আজ উগ্র উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্ক লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে অত উর্দ্ধে আমাদের ধিক্‌কার বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছিতেই পারবে না। এ কথাও মনে রাখতেই হবে যে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিন দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

'উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী আত্মার দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পূণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।'

হিজলীর হত্যাকাণ্ডে সীমাহীন ক্ষোভ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত বিশ্বপিতার কাছে অশ্রুসজল হয়ে প্রশ্ন কবিতায় তিনি প্রশ্ন রাখলেন ঃ

'তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো।'

ঘটনার গুরুত্বে জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, 'The Hijli firing had shaken Bengal from end to end. There, in a camp, was detained a band of educated and respectable young men whose only fault was patriotism. They are not charged with any definite offence and had not been convicted of any crime. The shoot down such people is unchivalrous and impardonable.'

সুভাষচন্দ্র বসু বললেন, 'এই মর্মান্তিক ঘটনার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ঘরের মধ্যে (নিরীহ মানুষদের প্রতি) গুলিবর্ষণের কৌন যৌক্তিকতা নেই এবং (যারা মারা গেলেন এবং আহত হলেন) সেই মানুষগুলি কেউই সাধারণ অপরাধী নয়, চোর-ডাকাতও নয়। সবাই সমাজের বিশিষ্টজন। আর্ন্তজাতিক নিয়মে সবাই যুদ্ধ বন্দী ... দেওয়ালের লিখন পরিষ্কার। অযোগ্য প্রশাসকদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার ইঙ্গিত। তারা দেখেছে সর্বস্তরের গণজাগরণ এবং যে গণজাগরণে তাদের চলার দিনের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে।'

মেদিনীপুরের চন্দ্রাকর ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বললেন, 'আমি নিশ্চিত যে হিজলীর ঘটনার মতো ঘটনা যদি ইংলণ্ডের কোন জেলে ঘটত তাহলে ঐ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ওখানকার জনসাধারণ ছিঁড়ে টুকরো

টুকরো করে দিত।' ঐ সভার সভাপতি হিসেবে দেবেন্দ্রলাল খাঁন যুবকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'দেশের মুক্তির জন্য সন্তোষ এবং তারকেশ্বর-এর মত শহীদের কার্য্যাবলী গ্রহণ করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ কর।'

ডগলাস হিজলী বন্দী হত্যার দায়ভার অবলীলায় বন্দীদের ওপর সমর্পন করলেও বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস গ্রুপের সদস্যরা চন্দ্রাকর ময়দানে শাসমল আর দেবেন্দ্রলালের ভাষণ শুনে উদ্দিপ্ত হয়ে উঠল। নিভৃতে চাপা ক্রোধে চোখের জল ফেললেও প্রতিকারের দীপ্তি চোখে মুখে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ধর্মযুদ্ধের ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ম্যাটসিনির বাণীর মধ্যেই ওরা খুঁজে পেয়েছিল নিজেদের ধর্ম যুদ্ধের প্রেরণা, 'whenever you see corruption by your side and do not strive against it, you thereby betray your duty.' ওরা মনে রেখেছে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেবের কথা —

'অলস হইয়া বসি ভারত-সন্তান,
সাহায্য করিছ ভিক্ষা কোন্ দেবতার,
ওঠ ত্বরা, সাধ কার্য্য, করছে উত্থান,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার।'

(গোবিন্দ দাসের অনুবাদ)

(ভারতের বিপ্লব-ভাবনা ও ধর্ম-চেতনা — ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী)

আসলে এদের কার্যাবলীর জন্যই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী এবং কিছু ইংরেজী কাগজ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে বলতে লাগল যে, 'এসব টেররিস্টদের কার্য-কলাপের যথার্থ বুদ্ধিদাতারা আইনকে ফাঁকি দিয়ে বিনা বিচারে বন্দী হয়ে জেলে বসে আছে। তারাই সেখান থেকে সর্ববিধ বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনা করে। সুতরাং এক একটি ইংরাজের প্রাণ হরণের বিনিময়ে এক একটি অনামী বিপ্লবীকে জেল থেকে বের করে এনে প্রকাশ্য স্থানে গুলি করে মারতে হবে।' এই সব প্ররোচনার সকরুণ পরিণতি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী নিবাসে পুলিশের গুলিবর্ষণ। (পেডি নিধন ও ভিলিয়ার্স-এর উপর আক্রমন ঃ বিমল দাশগুপ্ত)

আসলে এই ইতিহাসেরও আলাদা ইতিহাস আছে। হিজলীর অতর্কিত হানার পেছনে আছে, 'মেদিনীপুর জেলার অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তি এবং মাতৃজাতির সম্ভ্রম লুন্ঠন করার মালিক' জেলা শাসক জেমস পেডি-র মৃত্যু। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল বিমল দাশগুপ্ত আর যতীজীবন ঘোষের গুলিতে মেদিনীপুর ব্রিটিশ পুলিশ আর প্রশাসন টগবগিয়ে উঠেছিল। একদা সুশাসক হিসেবে সুনামের অধিকারী পেডি ক্রমে অস্বাভাবিক অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। জেলার অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে ভেসে যেতে বসেছিল জেলার ব্রিটিশ প্রশাসন। বিশেষ করে ১৯৩০-এর ৩রা জুন সকাল ৯-৩০ মিঃ ঘাটাল মহকুমার দাসপুর

থানার সাব-ইন্সপেক্টর ভোলানাথ ঘোষ এবং তার সহযোগী অনিরুদ্ধ সামন্ত চেচুয়া হাটের অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীদের ওপর অত্যাচার করলে আক্রোশে মানুষ ভোলানাথকে মেরে ফেলেছিল এবং অনিরুদ্ধ সামন্তকে এমন মারল যে শরীরের কোন অবশেষই আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ক্রুদ্ধ অপমানিত পেডি তাই নিজেই উপস্থিত হলেন চেচুয়া হাটের বাজারে। নির্বিচারে গুলির আদেশ দিলেন তিনি। এবং অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে দাসপুরের মানুষদের ওপর জোর করে 'পিউনিটিভ ট্যাক্স' চাপিয়ে দিল। শুধু তাই নয় ১৯৩০-এর ৬ই এপ্রিল নরঘাট-এর লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্রে যখন সত্যাগ্রহীরা লবণ আইন ভাঙতে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মিটিং করতে চাইলেন, তখন ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া জেলা শাসক পেডি মিটিং করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে জ্যোতির্ময়ী দেবীর নেতৃত্বে প্রায় ৮০০ জন মহিলা মিটিং করলেন এবং তাঁদের তৈরী লবণ পেডিকে কিনতে বাধ্য করলেন। উপস্থিত সত্যাগ্রহীরা তখন বন্দোমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত করে দিয়েছিলেন আকাশ-বাতাস। ক্রুদ্ধ পেডি লাঠি চার্জের হুকুম দিয়েছিলেন। কাঁথির পিছাবনী সহ জেলার অন্যান্য কেন্দ্রে লবণ সত্যাগ্রহের উত্তাল জনসমুদ্রে দিশেহারা জেলা শাসক পেডি মরিয়া হয়ে উঠেন। অত্যাচারের চূড়ান্ত করে ছাড়লেন তিনি। অত্যাচারীতেরাও পেডির অত্যাচারকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে লাগল। ফলে বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দিলেন তিনি। দ্বিতীয়ত, আলিপুরের জেলা এবং দায়রা জজ মিঃ গার্লিক হত্যার পর আনন্দে বন্দীরা ২৮শে জুলাই রাত্রিতে হিজলী জেলের মূল ভবনের চূড়ায় আলোক সজ্জা করল আলিপুর জেলে তাঁদের সহকর্মীদের গৌরবময় মৃত্যুর জন্য। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলার কিছু সহযাত্রী খালাস পেয়ে যাওয়ার জন্য। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে হিজলী জেলের বন্দীদের মাসিক বরাদ্দ ভাতা ৩২ টাকা থেকে নেমে এল ২৫ টাকায়। এই অর্ডারের অল্প কয়েকদিনে পরেই মূল জেলভবনের লাগোয়া অস্থায়ী জেলে বন্দীরা আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছিল। আগস্ট মাসেই আরো বার দুয়েক ঘটল আগুন ধরাবার চেষ্টা। বিক্ষিপ্ত এই ঘটনাগুলিকে কড়া হাতে দমন করবার জন্য ৪ জন সিপাহীকে নিযুক্ত করা হল। ৯ ই সেপ্টেম্বর আরও একটি ঘরে (Wash house) আগুন ধরলে আরও বেশী সংখ্যায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বন্দীরা প্রতিবাদ জানাল এই নতুন ব্যবস্থার। আবার ১৫ই সেপ্টেম্বর হিজলী জেল থেকে দীনেশ সেনকে বক্সা ক্যাম্প-এ পাঠানোর সময় তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে গেটের বাইরে আসবার চেষ্টা শুরু হতেই পুলিশ আর বন্দীদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পুলিশ লাইনে খবর যেতেই রে রে করে তেড়ে এল বেশ কিছু পুলিশ, হাতে বন্দুক আর লাঠি। সব ঘটনার ঘনঘটাই হিজলী বন্দী নিবাসের অভ্যন্তরের বিপ্লবীদের মৃত্যু ঘটাতে অতর্কিতে গুলিবর্ষণ। এই গুলিবর্ষণের ঘটনায় যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা, 'প্রশ্ন'। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে/হেনেছ নিঃসহায়ে।'

হিজলীর প্রতিশোধ নিতে বি.ভি. গ্রুপের ভলান্টিয়াররা খুন করলেন হিজলী বন্দী নিবাসের অভ্যন্তরে গুলি চালানোর মন্ত্রণাদাতা জেলা শাসক ডগলাসকে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার বোর্ডের মিটিং পরিচালনা করার সময় প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য আর প্রভাংশু শেখর পালের গুলিতে মারা গেলেন ডগলাস। প্রদ্যোতের পকেট থেকে বের হল একটুকরো কাগজ যাতে লেখা — 'A fitting reply to premeditated & prearranged barborous & cowerdly attempt on the patriotic sons of Bengal.' পরের বছর ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে জেলা শাসক বি. ই. জে. বার্জকে ফুটবল খেলার মাঠে গুলি করে জীবন উৎসর্গ করলেন মৃগেন্দ্র কুমার দত্ত এবং অনাথ বন্ধু পাঁজা।

পরপর তিন বছরে তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এমন খুন বোধ করি আর কোথাও নেই। কি দুর্দম সাহস সঞ্চয় করে মেদিনীপুরের অধিবাসীরা গর্জে উঠেছিল এটা বিস্ময়েরই ব্যাপার কারণ, মেদিনীপুর জেলার এই মানুষজনদের সম্পর্কে জেলার জর্জ ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্ট্রেচি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের এক চিঠিতে জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী জর্জ ডডস্ওয়েলকে বলেছিলেন, 'The bulk of the inhabitants of Midnapore appear to me to have very well preserved their original milk simplicity and innocence. They are less quarrelsome and give less trouble than the natives of neighbouring districts.'

এই সহজ সরল মানুষদের উত্তরসূরীরাই নির্যাতিত নিপীড়িত হতে হতে হিজলী জেল বন্দীদের হত্যার চরম মধুর প্রতিশোধ নিতে পেরেছিল। শালবল্লার থাম্বার হারিয়ে যাওয়া জেলের বুকের ওপর গড়ে ওঠা খড়্গপুর আই.আই.টি-র সুধীজনেরা বারেকের জন্য সেদিনকে স্মরণে এনে শ্রদ্ধা জানায় কি!

তিন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের খুন ঃ ঠিকানা মেদিনীপুর

জেলাশাসক জেমস পেডি-র চেচুয়া হাটের অমানবিক অত্যাচারই মেদিনীপুরের মানুষের মনে নিয়ে এল নিদারুন ঘৃণা আর অপমান বোধ। এই অপমানের প্রতিশোধ নিল ১৯৩১-এর ৭ই এপ্রিল। ঐ দিন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। গোধূলি পেরিয়ে সন্ধ্যা। মেদিনীপুর কলেজ এবং কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা কলেজ আর স্কুল থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তার চকের জটলায় রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে খবর দিয়ে গেল দুজন যুবক তাদের রিভলবার দিয়ে জেলাশাসক জেমস পেডিকে হত্যা করেছে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগেই জেমস পেডি কলিজিয়েট স্কুলের গৃহে এসেছিলেন স্কুলেরই এক শিক্ষা প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘোষণা করতে। প্রদর্শনী কক্ষের পাশেরই এক অন্ধকার কক্ষে লুকিয়ে ছিলেন বিপ্লবী যতীজীবন ঘোষ এবং বিমলকুমার দাশগুপ্ত। যতীজীবনের পিতা যামিনী জীবন ঘোষ মেদিনীপুর কোর্টের উকিল। এদের পূর্বপুরুষেরা থাকতেন দক্ষিন-পূর্ব রেলের বালিচক রেলস্টেশনের ৭ মাইল দূরে বেলুনগ্রামে। আর বিমল কুমার দাশগুপ্ত কবিরাজ অক্ষয় কুমার দাশগুপ্তের তৃতীয় পুত্র। বরিশালের বসন্দা গ্রাম থেকে চলে এসে মেদিনীপুর শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধু যতীজীবন ঘোষ এবং বিমল কুমার দাশগুপ্ত। পেডি প্রদর্শনীকক্ষে আসা মাত্রই দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রিভলবার নিয়ে। প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘোষণা করতে এসে ৫-৬টি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে শেষ হয়ে গেলেন জেলাশাসক পেডি। মেদিনীপুরের গোলকুয়ার চকের লাইট পোষ্টে বাতি জ্বালাতে গিয়ে বাতি জ্বালানোর লোকটি প্রত্যক্ষ করলেন একটা ঘোড়ার গাড়ি খট খট শব্দ তুলে গুলিবিদ্ধ জেলাশাসক জেমস পেডিকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে দ্রুতলয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়ে শহরের সবাই ঘরে ফিরেছে। ফেরেনি যতীজীবন আর বিমলকুমার দাশগুপ্ত। আতঙ্কে শহরের সবাই ঘুমচ্ছে। শুধু ঘুম নেই দুজনের চোখে — যামিনী জীবন ঘোষ আর অক্ষয় কুমার দাশগুপ্তের চোখে। অন্য কেউই বুঝতে পারছে না আততায়ী কারা। সাক্ষী শুধু একজন। রামচন্দ্র মুখার্জীর পুত্র ফনীন্দ্রনাথ মুখার্জী; পেডিকে গুলিবিদ্ধ করে প্রদর্শনী কক্ষ থেকে বেরিয়েই যার সাইকেল নিয়ে দ্রুত পালিয়ে বাঁচলেন দুই পলাতক। সেই সময় মাথা ঠান্ডা রেখে দেশপ্রেম এবং বুদ্ধিমত্তার এক দৃপ্ত স্বাক্ষর রাখলেন ফনীন্দ্রনাথ মুখার্জী। সে দুই বন্ধুকে ধরিয়ে দিতে চায়নি পুলিশের কাছে, আবার পুলিশকেও ঠকাতে চান নি। যতীজীবনের প্রতিবেশী পারিবারিক বন্ধু অ্যাডভোকেট যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ওরফে কান্টুবাবুর পরামর্শে বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশে গিয়ে বললেন দুই অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ী পালিয়ে গেছে। পুলিশকে খবর দিতে দেরী হওয়ার কারণ দেখিয়ে বললেন যে, তিনি 'ঘটনার আকস্মিকতায় অসুস্থতা বোধ করে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

তারপরেই কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর এসেছেন থানায় খবর দিতে।' পুলিশের অতিরিক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট Norton Jones স্বাক্ষীর বিবৃতি নথিভুক্ত করলেও পুলিশ ঘুমিয়ে থাকল না। প্রফুল্ল কুমার ত্রিপাঠীর বাড়ি খানাতল্লাসী চালিয়ে ভলান্টিয়ার্স লিস্ট থেকে বিমল দাশগুপ্তর নাম পেয়ে পুলিশ নিশ্চিত হল যে দুজনের মধ্যে একজন বিমল কুমার দাশগুপ্ত। তখন বিমলকুমার দাশগুপ্ত আর যতীজীবন ঘোষ ফনীন্দ্রনাথ মুখার্জীর সাইকেল চড়ে মেদিনীপুর থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে শালবনী রেলস্টেশনে পৌঁছে মধ্যরাতের ট্রেন পুরুলিয়া-গোমো প্যাসেঞ্জার-এ চড়ে বসেছে। পরের দিন সকালে গোমো স্টেশনে পৌঁছে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক কাটিয়ে আবার ট্রেন ধরে আসানসোল হয়ে কোলকাতা চলে এলেন।

অভিজ্ঞ আইন ব্যবসায়ী পিতা যামিনীজীবন বুঝলেন আদরের পুত্র 'টিয়া' (যতীজীবন) এসে গ্রেপ্তার হলে কেসটা হাল্কা হতে পারে। পরামর্শ মত যতীজীবন মেদিনীপুর ফিরলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হাজতে রাখলো। থানার অফিসার ইনচার্জ আসগর আলি দুজন পুলিশকে মিথ্যা সাক্ষী সাজিয়ে এনে যতীজীবনের বাবার কাছে আর্জি জানিয়ে বললেন, 'দাদা পুত্রকে বাঁচাতে ওকে সব কথা খুলে বলে দোষ স্বীকার করে নিতে বলুন।' কলকাতা থেকে পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসারদের এনে আসগর খাঁ একই উপদেশ দিলেও যতীজীবনের বাবা পুত্রকে বললেন যে, 'তুমি এমন কিছু বলো না যাতে এই মেদিনীপুর শহরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির ছেলেরা ঝামেলায় পড়তে পারে। তুমি তা করলে আমি লোকজনদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।' ফলশ্রুতি জেল। আড়াই মাস জেল খাটার পর ১০,০০০ হাজার টাকা মূল্যের দুজনের জামিন নিয়ে ছাড়া পেলেন যতীজীবন। পরে অবশ্য সাক্ষ্য প্রমানের অভাবে অনেকের সঙ্গে কেস থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি।

যতীজীবনের বন্দী অবস্থাতেই মেদিনীপুর ফিরে এসেছেন অপর হত্যাকারী বিমল কুমার দাশগুপ্ত। পুলিশও খবর রাখে। গন্ধ পেয়ে বাড়িতে হানা দিল পুলিশ। বিপ্লবী পরিবারের লোকজনদেরও অনেক খোঁজ খবর রাখতে হয়। তাই বড়ভাই বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত (মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান) পুলিশের থাবা থেকে ভাইকে বাঁচাতে লাইব্রেরীর আলমারির পিছনে লুকিয়ে রাখল। ফিরে গেল পুলিশ। পুলিশের আনাগোনায় অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতার কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি প্রয়াত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরের ভাই কেঁদোবাবু (ভূপেন্দ্রনাথ বসু)-র শরণাপন্ন হলেন। ট্রেনেই যাত্রা। কেঁদোবাবু বিহারী দুধ বিক্রেতা রঘু গোয়ালাকে ধরে বিমল দাশগুপ্তকে শাড়ি আর গহণা পরিয়ে তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে ট্রেনে করে কলকাতার নিরাপদ ডেরায় পৌঁছে দিলেন। এদিকে রাগে গরগরিয়ে পুলিশ বিমল দাশগুপ্তর আত্মীয় মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী হীরা লাল দাশগুপ্তকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে জেলা ছাড়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু জন্য এত কাণ্ড সেই বিমল কুমার দাশগুপ্ত তখন ঘটিয়ে দিলেন আরও

কাণ্ড। ১৯৩১-এর ২৯ অক্টোবর ৮০ নং গিলান্ডার হাউসের সর্বোচ্চ তলে সকাল ১১-৩০ টার সময় ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ই. ভিলিয়ার্স যখন তাঁর তিনজন ইউরোপিয়ান বন্ধুর সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন, তখনই বিমল কুমার দাশগুপ্ত এক মুসলমান দর্শনার্থীর চেহারায় স্লিপ পাঠিয়ে দেখা করার নাম করে ঘরে ঢুকে দ্রুত ক্ষিপ্রতায় পিস্তল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভিলিয়ার্স-এর উপর। টেবিলের তলায় লুকিয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন ভিলিয়ার্স আর পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন বিমল কুমার দাশগুপ্ত। ভিলিয়ার্সকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে ১০ বছরের দীপান্তর হয়ে গেলেও কলিকাতা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ সাক্ষীর অভাবে পেডি হত্যার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন বিমলকুমার দাশগুপ্তকে।

জেলার আন্দোলনের তীব্র গতিতে জেরবার হিংস্র ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ গর্জে উঠল অমানবিক অত্যাচারে। জেমস পেডির পর এসেছেন রবার্ট ডগলাস। জেলাশাসক ডগলাস পেডি-র মত অতটা অত্যাচারী ছিলেন না। ভয়ে তিনি কালেক্টরেটে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন প্রায়। কদাচিৎ বাংলো থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে ঘেরা ডগলাস ভয়ে ভয়ে রাত কাটাতেন সারাক্ষণ বই পড়ে। এত ভীত হয়েছিলেন যে দক্ষিণের রাজমুন্ডী কলেজের অধ্যক্ষ ভ্রাতাকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন, যে মেদিনীপুর হবে তার কবরস্থান। মেদিনীপুর শহরের অধিবাসীদের জন্য পিউনিটিভ ট্যাক্স বসানো হল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করার জন্য। গোয়েন্দা দপ্তরকে ঢেলে সাজানো হ'ল। বিশেষ বিশেষ বাড়ির উপর নজরদারি বাড়ানো হল। বিপ্লবী যুবকদের গতিবিধির উপর নজর রাখা হল। এত করেও শান্ত রাখা যায়নি মেদিনীপুরের মানুষকে। আড়াল করে নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপে রাখা যায় নি রবার্ট ডগলাসকে। ১৯৩১-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহর থেকে আটমাইল দূরের রেলষ্টেশন খড়্গপুর থেকে স্বল্প দূরে হিজলীর বন্দীনিবাসে রাত্রিতে অতর্কিতে বন্দীদের ওপর পুলিশের গুলিচালানোর অপরাধে আই.জি. মিঃ সিম্পসনকে মহাকরণে হত্যা করলেন বিনয়-বাদল-দীনেশ ১৯৩১-এর ৮ই ডিসেম্বর। আর জেলাশাসক ডগলাস সাহেব গুলি চালানোর তদন্ত করতে এসে (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১) দোষী রক্ষীদের নির্দোষ ঘোষণা করে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন হিজলী জেলের নির্দোষ বন্দীদের। এই ঘটনাই রবার্ট ডগলাস-এর ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৩২-এর ২০ এপ্রিল সন্ধ্যা ছটার সময় মেদিনীপুর জেলা বোর্ড দপ্তরে জেলাবোর্ডের এক সভায় মিটিং পরিচালনা করবার সময়ই তমলুকের মহকুমা শাসক মি. জর্জ, আই.সি.এস এবং আরও দুজন অফিসারকে দিয়ে মোড়া নিশ্ছিদ্র সিকিউরিটি বলয় ভেদ করে সভার সভাপতি রবার্ট ডগলাস-এর ডাইনে বাঁয়ে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য এবং প্রভাংশু শেখর পাল-এর গুলি গর্জে উঠে ঝাঁঝরা করে দিল ডগলাসকে। গুলিতে আহত হয়ে ডগলাস হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ঐ দিন সন্ধ্যাতেই। প্রদ্যোতের কথায়, 'এ স্লাইট রিভেঞ্জ ফর দ্য

হিজলী অ্যাট্রোসিটিজ।' এমন অকল্পনীয় ঘটনার বাস্তব রূপ পেয়েছে দুই বিদ্রোহীর দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে নিঃস্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার অদম্য বাসনায়।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার গোকুলনগর গ্রাম ছেড়ে আসা মেদিনীপুর শহরে একজন তহশীলদার (রেভেনিউ এজেন্ট) ভবতারণ ভট্টাচার্য এবং পঙ্কজিনী দেবীর কনিষ্ঠ সন্তান মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য এবং ঐ মহকুমার খাঞ্জাপুর গ্রামের অধিবাসী আর বিহার উড়িষ্যা সরকারের এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার রায়বাহাদুর প্রসন্ন কুমার পালের নাতি ও ডাঃ আশুতোষ পাল ও লক্ষ্মীমনি দেবীর প্রথম সন্তান প্রত্যয়পূর্ণ এক যুবক শ্রী প্রভাংশু শেখর পাল রাঙিয়ে দিল দেশকে অনন্য এক উন্মাদনায়।

নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ে ডগলাসকে হত্যা ক'রে হল থেকে বেরিয়ে মাত্র ২০০ গজ দূরে যেতে পেরেছিলেন দুজনে এক সঙ্গে। তারপরেই ছাড়াছাড়ি। উত্তর-পূর্বে গেলেন প্রভাংশু পথে রিভলভার-এ গুলি ভরতে ভরতে আর গুলি ছুড়তে ছুড়তে পেছনে ধাওয়াকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে। প্রদ্যোৎ এগিয়ে গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আর পেছন ধাওয়াকারীদের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। একসময় শেষ হয়ে যাওয়া গুলির ব্যাপারটা তমলুক মহকুমা শাসক মিঃ জর্জ-এর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ফলে জর্জ-এর নির্দেশে তেড়ে যাওয়া পুলিশের হাতে মিটিং হল-এর ৫০ গজের ভেতরই ধরা পড়লেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। রক্ষীবাহিনী ক্ষমাহীনভাবে আঘাত করল প্রদ্যোৎকে। প্রদ্যোতের অপরাধ প্রমাণের জন্য মেদিনীপুর শহরের পাহাড়পুর এলাকার বাড়িতে গৃহে অন্তরীণ থাকা আরও এক সক্রিয়কর্মী ফনীন্দ্র কুমার দাসকে ১৯৩২-এর ৩রা মে সন্ধ্যায় ধরে আনল পুলিশ কোতোয়ালী থানায়। কোতোয়ালী থানার পুলিশ শাস্তি দিয়ে মেদিনীপুরের বিপ্লবী সদস্যটির কাছ থেকে নানান গোপন খবর বের করার জন্য ভাড়া করে আনল নারায়ণগড় থানার দায়িত্বে থাকা পুলিশের অমানবিক সাব-ইন্সপেক্টর রহত বক্স চৌধুরীকে। ২ ঘন্টার শাস্তি এতই তীব্র যে ফনীন্দ্রর শরীর ক্রমশই ঠান্ডা মেরে যেতে লাগল। ফনীন্দ্র মারা যেতে পারে এই ভয়ে পুলিশ সুপার মিঃ ইভানস্ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লেন মেদিনীপুর শহরের উত্তরে ৭ মাইল দূরের গোদাপিয়াশাল গ্রামে। বন্ধুবর সিভিল সার্জন মিঃ জে.জি. ড্রুমন্ড (J. G. Drummond) সাহেবকে নিতে। গভীর রাতে থানায় এসে ফনীন্দ্রকে পাঠালেন সদর হাসপাতালে। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেও এমন কি ডগলাস হত্যার দায় থেকেও রেহাই পেলেও গ্রেপ্তার হলেন Bengal Criminal Law Amendent Act -এর বিধি মোতাবেক। আর ডগলাস হত্যা মামলার আসামী ধৃত প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য্য ৫ই জুন থেকে ১৫ই জুন, ১৯৩২ পর্যন্ত বিচারের একটানা শুনানী চলে মৃত্যুদন্ড পেয়েও ১৯৩৩-এর ১২ই জানুয়ারী প্রত্যুষে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের ফাঁসি কাঠে সহাস্যে চুমু খেয়ে আত্মোৎসর্গ করলেন দেশমাতৃকার বেদীমূলে।

ডগলাস হত্যার পর ঘুরে দাঁড়ালো ব্রিটিশ প্রসাশন। মেদিনীপুরের ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্দোলনে জেরবার হিংস্র ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী আরও অত্যাচারী হয়ে উঠল। সঠিক মোকাবিলার কারণে বিশের দশকে মেদিনীপুর জেলার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাজের অভিজ্ঞতা থাকায় জেলা প্রশাসনে অভিজ্ঞ আই. সি. এস. মিঃ বি. ই. জে. বার্জকে মেদিনীপুরের জেলাশাসকের পদে বসানো হল। এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে শহরের পশ্চিমপ্রান্তে একজন ব্রিটিশ অফিসারের নেতৃত্বে গাড়োয়ালী রেজিমেন্টকে রাখা হল। শহর ভরে গেল পুলিশের গোয়েন্দায়, গোপন সংবাদদাতায় এবং ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেদের গোপন উপস্থিতিতে। জেলাশাসক বার্জ মেদিনীপুরের মানুষদের ওপর অতটা কঠিন না হলেও প্রশাসনের ঢেঁকি তাকে গিলতে হল। পুলিশের জেলা সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ ইভানস্ মেদিনীপুরের মানুষজনকে শাস্তি দিতে উস্কানি দিতে লাগলেন বার্জকে। আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে বাংলার গভর্ণর স্যার জন অ্যান্ডারসন মেদিনীপুরে দরবার করতে এসে বললেন —

> ‘মেদিনীপুরের নৈরাজ্যবাদী শক্তিধররা আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তারা একজনও ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে জীবিত রাখবে না। সরকার সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। শহরে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরে মেদিনীপুরে কোন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আন্দোলনকে মিলিটারি নামিয়ে কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে।’

অ্যান্ডারসন মুখে চ্যালেঞ্জের কথা বললেও আসল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল মেদিনীপুর জেলার বিপ্লবীরা। ইভানস্-এর গড়ে তোলা দুর্গে এই শহরেই ১৯৩৩-এর ২রা সেপ্টেম্বর বিকেলে অবিশ্বাস্য খবরটি ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত যে, পুলিশের নাকের ডগায় পুলিশের খেলার মাঠেই নিহত হয়েছেন মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক বার্জ। মেদিনীপুর টাউন ক্লাবের হয়ে ঐ দিন পুলিশমাঠে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল খেলায় অংশ নিতে খেলার মাঠের কাছে গাড়ি থেকে নামতেই মেদিনীপুর কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র মৃগেন্দ্র কুমার দত্ত এবং মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্র অনাথবন্ধু পাঁজার গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন বার্জ সাহেব। হত্যাকারীরা দুজনেই পড়ে মারা গেলেন। হত্যা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় যাঁরা ধরা পড়লেন তারা হলেন ঃ

ধৃত বিপ্লবীগণ	**পিতা**	**পিতৃপরিচয়**	**নিজের পরিচয়**
১। কামাক্ষ্যা ঘোষ	যদুনাথ ঘোষ	মেদিনীপুর সিভিল কোর্টের বড়বাবু	২য় বর্ষের ছাত্র মেদিনীপুর কলেজ
২। ব্রজকিশোর চক্রবর্তী	পণ্ডিত ভূষণ কাব্যতীর্থ	—	২য় বর্ষের ছাত্র মেদিনীপুর কলেজ

৩।	রামকৃষ্ণ রায়	কেনারাম রায়	মেদিনীপুর শহরের আইনজীবি	স্কুলের ছাত্র।
৪।	নির্মলজীবন ঘোষ	যামিনী জীবন ঘোষ	"	
৫।	সনাতন রায়	কিশোরীপতি রায়,	জাড়া-র রাজ পরিবার	মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র
৬।	নন্দদুলাল সিংহ	মনমোহন সিং	—	—
৭।	সুকুমার সেনগুপ্ত	কাকা নৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	—	—
৮।	শৈলেন চন্দ্র ঘোষ	প্রভাত ঘোষ	কালেক্টরেটেব ক্লার্ক	—
৯।	বিনয় কৃষ্ণ ঘোষ	—	—	—
১০।	পূর্ণানন্দ স্যান্যাল	—	—	—
১১।	মনীন্দ্র নাথ চৌধুরী	—	—	—
১২।	সরোজরঞ্জন দাস কানুনগো	—	—	—
১৩।	শান্তি গোপাল সেন	—	—	—

ডগলাস হত্যার সময় যেমন ফনীন্দ্রনাথ দাসকে ধরে এনে থানায় মারা হয়েছিল বার্জ হত্যার সময়ও একই কায়দায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মি. নর্টন জোনস্ থানা হাজতে ধরে আনলেন কামাক্ষ্যা ঘোষকে। চলেছিল নিদারুন অত্যাচার। কামাক্ষ্যা ঘোষ পরবর্তী পর্যায়ে কোর্টে অভিযোগ করেছিলেন থানায় পুলিশ হেফাজতে তাঁর ওপর অত্যাচারের। এমনকি সিভিল সার্জন কামাক্ষ্যা ঘোষের অভিযোগকে সমর্থন করেছিলেন। অ্যাপিল কেসের বিচারক তাঁর রায়ের প্রতিবেদনে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'It cannot be disputed that the treatment which Kamakshya received was in the highest degree reprehensible'.

১৯৩৪-এর ১০ই ফেব্রুয়ারী স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায় বেরুল। ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায় এবং নির্মলজীবনের মৃত্যুদণ্ড হ'ল। কামাক্ষ্যা ঘোষ, সুকুমার সেনগুপ্ত, সনাতন রায় এবং নন্দদুলাল সিংহের দীপান্তর হয়ে গেল। ৯নং থেকে ১৩নং আসামীরা ছাড়া পেল।

মেদিনীপুরে বিপ্লবী মানুষ আরও একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল অ্যাণ্ডারসন সাহেবের কথার। সত্যি সত্যিই মেদিনীপুরকে শান্ত করতে ব্রিটিশ নয় ভারতীয় একজন জেলাশাসক মিঃ বি. আর. সেনকে বসাতে হয়েছিল বার্জ সাহেব হত্যার পরেই। ত্রিশের দশকের শুরুতেই ১৯৩১, ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ পর পর তিন শেতাঙ্গ জেলাশাসককে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছেন বিপ্লবীরা, ভারতবর্ষে এরকম ব্যতিক্রমী জেলা বোধ হয় বাংলার এই মেদিনীপুর।

সুভাষচন্দ্র বসু এলেন তমলুকে

সেদিন মঙ্গলবার। ১৯৩৮-এর ১১ই এপ্রিল। সাত সকালেই হাওড়া রেল স্টেশনে বিন. এন. রেলওয়েজের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে-এ উঠে বসলেন জননেতা সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের বিপ্লবতীর্থ মেদিনীপুর জেলার তমলুকে আসবেন কংগ্রেসের জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য। তাই শুরু হল তাঁর মেদিনীপুর জেলা সফর। সফর সঙ্গী হিসেবে একই কম্পার্টমেন্টে উঠলেন অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, হেমন্ত বসু, জহর বক্সী, মন্মথনাথ দাস, সাতকড়িপতি রায়, প্রমথ ব্যানার্জী, রামসুন্দর সিং, নিকুঞ্জ মাইতি, বসন্ত দাস, ললিত সিনহা প্রমুখ কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

সুভাষচন্দ্র কেন সেদিন তমলুকে এলেন তারও একটি ছোট পটভূমি আছে। কংগ্রেসে তখন একটা গা-ছাড়া ভাব। সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে অনৈক্য আর রেষারেষী। অথচ ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটিশ রাজশক্তির অশোভন আচরণের মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরী। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের অভাব অনুভব করছে তখন। এই রকম একটা সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছে কংগ্রেস। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারির ওয়ার্ধা অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অধিবেশনের সভাপতি জওহরলাল নেহেরুকে দায়িত্ব দিলেন পথ বাতলাতে। কালবিলম্ব না করে জওহরলাল ৩১শে মার্চ সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলোকে বললেন ঃ 'Make a special effort to enrole Muslim Congress members, so that our struggle for freedom may become even more broard-based than it is, and the Muslim masses should take the prominent part in it which is their due...'

এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বাস্তবরূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মসমিতি।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সংহতি ফিরিয়ে আনতে ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রাদেশিক কর্মসমিতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গঠন করলেন ১৯৩৮-এর ১০ই এপ্রিল। সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁকে ছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি ভাবাই যায় না। এখানেও তিনি সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এই কর্মসমিতিতে। নিচের এই কমিটির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে সেকথা।

সভাপতি	ঃ		সুভাষচন্দ্র বসু
সহ-সভাপতি	ঃ	১)	মৌলভি মহিউদ্দিন খাঁন

		২)	লাবণ্যলতা চন্দ্র
		৩)	বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি
সম্পাদক	ঃ		মৌলভি আশরাফউদ্দিন চৌধুরী
সহ-সম্পাদক	ঃ	১)	কমলাকান্তি সরকার
		২)	বসন্ত কুমার দাস
		৩)	কালিপদ মুখার্জি
কোষাধ্যক্ষ	ঃ		দেবেন্দ্রলাল খাঁন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েই সমস্ত ধরণের বিভেদ ভুলে ঐক্যের জন্য আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের সজাগ করে দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু বললেন, 'that bringing the Musalmans and the members of the Schedule Castes within the fold of the congress thy must begin seriously the work of mass contact, which would be gigantic force against the communal dessesions that were eating into the vitals of the country.'

ঐক্যের জন্য ব্যাপক জনসংযোগ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলার সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সুভাষচন্দ্র নিয়ে ফেললেন। কর্ম্মসমিতি গঠনের পরদিনই অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের দেশ মেদিনীপুর জেলার তমলুককেই প্রচারের প্রথম ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন।

কিন্তু জনসভা বললেই তো আর জনসভা করা যায় না। সুভাষের জনসভা তমলুকের রাজময়দানে করার অনুমতি দিল না ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিশ। উদ্যোক্তাদের মাথায় হাত। কোথায় করবেন এই জনসভা। অগত্যা কংগ্রেসের নেতারা তমলুক রাজবাড়ির বর্ষীয়ান পুরুষ রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ-এর শরণাপন্ন হলেন কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য। সুরেন্দ্রনারায়ণ নিজের জমিদারির স্বার্থ ক্ষুন্ন করেও বারবারই ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। পুত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ও কংগ্রেসের সংগ্রামী সৈনিক। তাই ব্যবস্থা হয়ে গেল জনসভার মাঠের। সুরেন্দ্রনারায়ণ রাজবাড়ির মধ্যেকার 'খোসরঙ'-এর আমবাগান রাতারাতি কেটে পরিষ্কার করে দিয়ে সমাবেশের জায়গা করে দিলেন।

রাতভোর পরিশ্রম করে মঞ্চ নির্মাতা হরি দোলই যখন জনসভার মঞ্চ তৈরি শেষ করলেন, তখন ভোর গড়িয়ে সকাল হতে চলেছে। সূর্য তখনও ঘুম ভেঙে ওঠেনি। ছড়িয়ে দেয়নি তখনও তার রক্তিম আভা। সবুজ বনানী ঘেরা তমলুক রাজবাড়ির খাটপুকুরের একদিকের পাড়-এর পাশে খোসরঙ-এর মাঠের জনসভায় শুরু হয়েছে মানুষের ঢলনামা। আশপাশ আর দূরদূরান্ত থেকে আসা নানান রঙের নানান বর্ণের মানুষের উদ্বেলিত জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর ভাষণ শুনতে।

তাঁদের অধীর আগ্রহের প্রতীক্ষা ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। কারণ অন্য কিছু নয়। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ট্রেনটি দ্রুত আসতে পারছে না। প্রায়-প্রতি ষ্টেশনেই অসম্ভব ভীড়। অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাদের প্রিয় নেতাকে। অভিনন্দিত হতে হতেই এক সময় ট্রেন রূপনারায়ণ নদের ব্রীজ গড়িয়ে মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটে এসে থামল। মেদিনীপুর জেলায় সর্বপ্রথম স্বাগত জানালেন জেলারই আইন সভা সদস্য গোবিন্দ ভৌমিক। তারপর ট্রেন এগিয়ে গেল পাঁশকুড়া ষ্টেশনের দিকে। পাঁশকুড়া ষ্টেশনে মাল্যদান করে অভ্যর্থনা জানালেন তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের তরফে শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।

পাঁশকুড়া থেকে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কনভয় এগিয়ে চলল তমলুকের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে জোড়াপুকুরে গুণগ্রাহী ভক্তরা সুভাষচন্দ্রের কনভয় আটকালেন। বাধ্য হয়েই ভক্তদের অনুরোধে ছোট একটি জনসভায় ভাষণও দিলেন। তমলুকে পৌঁছে প্রথমে গেলেন তমলুক পৌরসভায়। ওখানে মাল্যভূষিত করলেন তখনকার পৌরপিতা। এরপর তিনি গেলেন কংগ্রেস নেতা সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (শ্রদ্ধেয় শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের ভগ্নীপতি) মহাশয়ের নিবাস 'বৈকুন্ঠধাম'-এ। ওখানে অভ্যর্থনা জানালেন মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ এবং সভাপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ মাইতি। মহেন্দ্রবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় ঐদিনের তমলুকের ঐ জনসভার আয়োজন সম্ভব হয়েছিল।

'বৈকুন্ঠধাম' থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে ফোর্ড গাড়িটা যখন জনসভার অদূরে রাজবাড়ির ফটকে থামল, বেলা তখন প্রায় ১১টা, সূর্য প্রায় মধ্য গগনে। প্রধান ফটকের দুপাশেই সারিবদ্ধ উদ্বেলিত জনতা সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত। মেয়েরা শঙ্খ হাতে দাঁড়িয়ে বরণ করার জন্য। সামনের সারিতেই কংগ্রেসের অপরাপর নেতৃবৃন্দ সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখার্জী, কুমার চন্দ্র জানা প্রমুখ।

ফটকের গেটে রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থেকে নেমে এলেন সুভাষচন্দ্র। সুরেন্দ্রনারায়ণ মালা, ধানদূর্বা চন্দনে সুভাষচন্দ্রকে বরণ করতেই দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় হাজার মহিলা একসাথে শঙ্খধ্বনি দিয়ে এক অপূর্ব অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। সময় গড়িয়ে গেল বেশ কিছুটা। নেতারা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সুভাষচন্দ্রকে গাড়িতে উঠতে বললেন জনসভার মঞ্চে যাওয়ার জন্য। বর্ষীয়ান সুরেন্দ্রনারায়ণকে দেখিয়ে সুভাষচন্দ্র নেতাদের বললেন, যে পিতার বয়সী লোক যখন হেঁটে যাচ্ছেন তখন তিনি কয়েক ফার্লং দূরের সভামঞ্চে হেঁটেই যাবেন। অগত্যা হাঁটা। এই হাঁটাপথের বাঁদিকে শহরের উপান্তের রাজবাড়ির ভগ্নপ্রাসাদ দেখে তিনি একটু দাঁড়ালেন। শ্রদ্ধা জানালেন দেশের স্বাধীনতায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্যতম এই তীর্থক্ষেত্রটিকে। সুভাষচন্দ্র জানতেন এই ভগ্ন ভাড়িটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আর্থিক আনুকূল্যেই এই বাড়িতেই মেদিনীপুর জেলার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এক বড় শিবির খোলা হয়েছিল। তিনি জানতেন কিভাবে জেলার পুলিশের সুপার হাসকিন সাহেবের অত্যাচারী হাতের বেতকে সহ্য করে মহেন্দ্রনাথ মাইতি, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখার্জী ও সুশীল ধাড়ার

তত্ত্বাবধানে এবং হংসধ্বজ মাইতির নেতৃত্বে, অবিস্মরণীয় পুরুষ ক্ষুদিরাম ডাকুয়া, কুঞ্জবিহারী মাইতি, ইন্দ্রজিৎ সিংহ, রাখালচন্দ্র নায়ক ও প্রতাপচন্দ্র গুহরায় সহ মেদিনীপুর, কলকাতা, ২৪ পরগণা, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মন সিং জেলার প্রায় আট হাজার মানুষের মহামিছিল পায়ে পায়ে কুড়ি মাইল দূরের লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্র 'নরঘাট'-এ আইন ভাঙতে শোভাযাত্রা করে বের হয়েছিল রাজবাড়ির এই শিবির থেকে।

তমলুকের মানুষদের সেদিনের সেই গৌরবময় অতীতের কথা তার আত্মত্যাগের ভূমিকা মনে রেখে স্মৃতির রাজপথ ধরেই তিনি এগিয়ে এলেন 'খোসরঙ'-এর জনসভার মঞ্চে। মঞ্চে আসামাত্রই উপস্থিত কয়েক সহস্র দর্শনার্থীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সভায় মাল্যদান করে স্বাগত জানালেন তমলুকের পৌরসভা, মেয়েরা, শ্রমিকশ্রেণী সহ শহরের সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং হরিজন সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এক অবর্ণনীয় মাদকতা সকলের চোখে মুখে। উন্মাদনায় অস্থির সকলেই তাদের প্রিয় নেতাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে। দৃষ্টান্তমূলক এই হার্দিক ভালবাসার প্রত্যুত্তরে সেই জনসভায় সুভাষচন্দ্র বসু মেদিনীপুরের, বিশেষ করে তমলুকের সংগ্রামী মানুষদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অত্যন্ত সাহসী এবং অনুকরণীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। দৃষ্টান্তমূলক সেই ভূমিকার কথা স্মরণ করে তিনি তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ হরিজনসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনকে কংগ্রেসের পতাকাতলে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তুলতে আহ্বান জানিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসা মেদিনীপুরের মানুষদের জন্য পাঠানো গান্ধীজির বার্তা সেই সভায় পড়লেন। বার্তায় গান্ধীজি বলেছেন, 'I hope that Midnapore will show that it stands for unadulterated non-voilence. In my opinion that is our greatest need.'

গান্ধীজির বার্তাটি পড়েই তিনি জনসভায় সহর্ষে ঘোষণা করলেন যে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থার উপর থেকে আরোপিত সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন।

সভার কাজ শেষ করে সুভাষচন্দ্র সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শহর পরিদর্শনে। প্রথমেই শ্রদ্ধা জানালেন তমলুকের নগরদেবী 'বর্গভীমা'-কে। ওখান থেকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে মিশনের স্নিগ্ধ ও শান্ত পরিবেশ আকর্ষণ করল সুভাষচন্দ্রকে। মনোমুগ্ধকর পরিবেশে কাটিয়ে প্রীত হয়ে তিনি মিশনের পরিদর্শনের খাতায় লিখলেন ঃ 'তমলুকে আসিয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। যেরূপ শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার সহিত জনসেবা করা হয় তাহা প্রশংসনীয়। প্রত্যেক সহরে যদি এইরূপ প্রতিষ্ঠান থাকিত তাহা হইলে কত উপকার না হইত। এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আমি কামনা করি।'

মিশন থেকে তিনি এলেন 'বৈকুণ্ঠধাম'-এ। এখানে মিলিত হলেন কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে। সন্ধ্যায় আর একবার রাজবাড়ির পাশের মন্দিরের আটচালায় এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হলেন রাজবাড়িসহ শহরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে। রাত্রিবাস করলেন 'বৈকুণ্ঠধামে।'

পরদিন সকালে আবার রাজবাড়িতে গিয়ে রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সঙ্গে দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রওয়ানা দিলেন কাঁথির দিকে। পথে মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর হাইস্কুলের সামনের জনসভায় ভাষণ দিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিরজাচরণ নন্দ বরণ করেছিলেন দেশবরেণ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে। তারপর তিনি গেলেন কাঁথি।

সুভাষচন্দ্র বসু সেদিন তমলুক থেকে চলে গেলেন। চলে গেলেও তমলুক তাঁর স্মৃতি ধরে রেখেছে তিনটি জায়গায় — পৌরসভা আজও গুছিয়ে রেখেছে তাঁর ব্যবহৃত চেয়ারটিকে, রামকৃষ্ণ মিশন রেখেছেন তাঁদের অভিমত বইতে তাঁর রেখে যাওয়া মূল্যবান মতামত আর মানস কুমার মাইতি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া পার্কার কলমটি।

বীরাঙ্গনা কাহিনী ঃ ঠিকানা মেদিনীপুর

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্মরণীয় ভূমিকার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভারতের অন্যান্য প্রান্তের নারীদের মতই মেদিনীপুর জেলায় বিশেষ করে অবিভক্ত তমলুক মহকুমা এবং কাঁথি মহকুমায় নারীরা যেভাবে স্বাধীনতা লড়াইয়ে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

ভারতের ব্রিটিশ আধিপত্যের শুরু থেকেই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল মেদিনীপুর জেলা। এই বিদ্রোহের মনোভাব থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্খার বীজ বপন করে দিয়েছিলেন মহীয়সী এক নারী — তমলুক রাজবাড়ির রানী কৃষ্ণপ্রিয়া। মীরকাশিম ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নবাবীর বিনিময়ে যখন চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে মেদিনীপুরকেও তুলে দিয়েছিলেন ইংরেজদের হাতে, ঠিক তারই কিছুদিন পরে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণপ্রিয়া। পারিবারিক এক বিবাদের জেরে নিজের জমিদারী রক্ষার প্রশ্নে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে অসাধারণ দৃঢ়তা এবং সাহসের পরিচয় তিনি দেন তাতে নিজের হার হলেও তা ছিল বীরত্বব্যঞ্জক। কৃষ্ণপ্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিছকই ইংরেজদের সঙ্গে পেয়েছিলেন বলে জ্ঞাতি রাজা আনন্দমোহন রায় ইংরেজ কোম্পানির লবণ উৎপাদনের জন্য ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সল্ট এজেন্ট উইলিয়ম ডেন্টকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে তমলুক শহরের কোর্ট কম্পাউন্ড লাগোয়া আবাসবাড়ির বাণ-পুকুরের পাড়ে প্রায় ১৭ একর জমি লিজ দিয়েছিলেন লবণের কাছারিবাড়ি তৈরী করার জন্য।

ব্রিটিশ আমলের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী হলেন মেদিনীপুর শহরের অনতিদূরের কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিং-এর বিধবা পত্নী রাণী শিরোমণি। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতেই ঘাটশিলা-র সংলগ্ন মেদিনীপুর প্রান্তসীমায় প্রায় ২০০ ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল-মহল মাটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে লোধা, মাঝি, কুড়মি, ভঞ্জ, কুড়য়ালি, কোরা, বাগদি, মুণ্ডারী গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষেরা স্বাধিকার রক্ষার প্রশ্নে ইংরেজ শাসনের শোষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত যে সংগ্রাম করেছিলেন, সেই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় রাণী শিরোমণি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। অতিরিক্ত করের বোঝার দায়ভার কমানোর জন্য রাণীর এই বিদ্রোহের শুরুতেই তাঁর জমিদারি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন জেলার কালেক্টর। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশের অত্যাচারে জর্জরিত প্রজাদের সাহায্য করার জন্য ইংরাজ সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁর সাহস, দৃঢ়তা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হলেও তাঁর এই সংগ্রামের ক্রিয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

এইভাবেই লবণ তৈরীর উপর নির্ভরশীল জেলার মলঙ্গীদের ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের বগড়ি রাজ্যের (গড়বেতা, মেদিনীপুর) গণগনিমাঠের নায়েকদের বিদ্রোহের মতো খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহগুলির মধ্য দিয়েই জেলার অধিবাসীরা যে সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, তারই ফলে বাঙলার নবজাগরণ পর্বে মানুষের মধ্যে স্বাদেশিক চেতনাও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহগুলি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় ফলবতী হচ্ছিল না। নতুন স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ ব্রিটিশের শোষণ আর বঞ্চনার থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে তুললেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এরও পাঁচ বছর পর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন দুইজন বাঙালি মহিলা — একজন কংগ্রেস নেতা জগন্নাথ ঘোষালের স্ত্রী ও ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অন্যজন দেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার এবং অধিবেশনে প্রথম মহিলা ডেলিগেট কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। পরের বছরের কলকাতা অধিবেশনে এই দুজনেই প্রতিনিধি ছিলেন। ঐ সভায় কাদম্বিনী দেবী স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের ভূমিকা কী, এবং ভারত স্বাধীন হলে মহিলাদের সামাজিক জীবনের যে যথেষ্ট উন্নতি হবে সেই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী মেয়েদের জন্য সখিসমিতি তৈরী ক'রে (১৮৮৬) বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনে সমস্ত মানুষদের যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন সভায় নিজের লেখা গান গেয়ে সাধারণ মানুষদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলতেন। তিনি গাইতেন—

'শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম
মায়ের রাখিব মান লয়েছি মহাব্রত
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর ঐ শিক্ষা
ঐ মন্ত্র, ঐ দীক্ষা, ঐ জপ অবিরত
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য না লব বিদেশী পণ্য
ঘুচাব মায়ের দৈন্য, করিলাম এ শপথ
পরিচ্ছন্ন দেশী সাজ মানি ধন্য ধন্য আজ
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর পরাহত
ঐ আমাদের ধর্ম, ঐ জীবনের কর্ম
ঐ বস্ত্র ঐ ধর্ম, আমাদের মুক্তধন
নম নম বঙ্গভূমি মোদের জননী তুমি
তোমার চরণে নমি নরনারী মোরা যত।'

এই দুইজনের কর্মকাণ্ডে মেদিনীপুরের মেয়েরা যেমন আকৃষ্ট হতেন, তেমনিভাবে জেলার তমলুক শহরের রক্ষিত বাড়িরই ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চার আড়ালে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, পূর্ণচন্দ্র দাস, যোগজীবন ঘোষ প্রভৃতির বিপ্লবী কাজকর্ম এবং মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলকে কেন্দ্র করে রাজনারায়ণ বসু —

ও তাঁর ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু-র প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর মতো সংগ্রামীরা জেলার গুপ্তসমিতির মাধ্যমে বৈপ্লবিক কাজকর্মের পরিকাঠামো তৈরী করতেন আর তাতে যোগদানের জন্য জেলার সমস্ত মানুষেরাই উন্মুখ হয়ে থাকতেন। ১৯০৫-এর লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সারাবাংলার মানুষের সঙ্গে জেলার সর্বস্তরের মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেদিনও জেলার সবার কণ্ঠে আওয়াজ ছিল — 'বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন/এক হউক এক হউক হে ভগবান।' সত্যি বলতে কী, এই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবই বাংলার মেয়েদের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রথম সারিতে টেনে নিয়ে এসেছে।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী মহিষাদলের নীলমনি হাজরার স্ত্রী লক্ষ্মীমনি হাজরা। তিনি বিভিন্ন সময়ে পাশের গ্রামের মেয়েদের স্বাধীনতার কাজে উদ্বুদ্ধ করতেন। তমলুকের কাছে ব্যবত্তার হাটে চারণকবি মুকুন্দদাসের গান শুনে অনুকূল ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী তরুলতা ভট্টাচার্য্য স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর শহরের মির্জাবাজারের স্বাধীনতা সংগ্রামী নর্মদাচরণ চক্রবর্তীর কন্যা তরুলতা দেবী বাপের বাড়িতে পিতার কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করলেও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করলেন মুকুন্দদাসের গান শোনবার পর। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের পুত্রবধূ হলেও সংগ্রামী মনোভাবের ব্যাপারে কারও সঙ্গে আপস করতেন না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমস্ত স্তবের মানুষকে স্বাধীনতার কাজে অংশ নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালি মেয়েদের গৌরবময় ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে স্বামীর সঙ্গে ভারতভ্রমণে এসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোন্যাল্ড-এর স্ত্রী বলেছিলেন, 'One feels there is a tremendous movement going on amongst the women. We are fond of labelling the Indian aspirant as seditious when if they are amongst ourselves we should call them patriotism.'

বিপ্লবীদের সহায়তা করবার জন্যে ভগিনী নিবেদিতা এসেছিলেন মেদিনীপুরে। নিবেদিতার সংস্পর্শে এসে মেদিনীপুরের বিপ্লবী দলের নারায়ণগড় থানার রাধানগর গ্রামের হেমচন্দ্র দাস কানুনগো বোমা তৈরীর কৌশল রপ্ত করতে ছবি আঁকা শেখার অজুহাতে প্যারিস চলে গেলেন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। ওখানে মিলিত হলেন মাদাম কামার সঙ্গে। ওখানে থাকাকালীন তৈরী করলেন ভারতবর্ষের প্রথম ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। ১৯০৭-এ জার্মানীর স্টুটগার্ডে ইন্টারন্যাশন্যাল সোস্যালিস্ট কনফারেন্সে সেই পতাকাই উড়িয়ে দিলেন মাদাম কামা।

ইতিমধ্যে মহিলা সমিতির কাজ সরকার বিরোধী হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভগিনী সুরবালা বসুকে মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রতিবাদে জ্বলে উঠেছে সারা মেদিনীপুর জেলা। কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর থানার মুগবেড়িয়ায় দিগম্বর নন্দর বাড়ি

থেকে কাঁথি মহকুমার বিপ্লবীদের উজ্জীবিত করেছেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। পরের দুটো ঘটনাই ছিল বিপ্লবীদের ব্যর্থ প্রয়াস। প্রথমটি ১৯০৭-এর ৫ই নভেম্বর নারায়ণগড় আর খড়্গপুরের মাঝে রেললাইনের তলায় ডিনামাইট রেখে ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং দ্বিতীয়টি ক্ষুদিরামের মজঃফরপুরে বোমা ছোঁড়ার ব্যর্থতা। কিন্তু দুটো ঘটনাই ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত নড়িয়ে দিতে পেরেছিল।

আবার কংগ্রেসে যোগদান করে অ্যানি বেসান্ত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর হোমরুল লিগ মুভমেন্ট শুরু করে মেদিনীপুরে এসেই জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতায় মুগ্ধ হলেন। তাঁর এই আগমন জেলার মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করার জন্য। বিশের দশকে গান্ধীজি যখন অসহযোগ শুরু করলেন সেই আন্দোলন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রচেষ্টায় সার্থকরূপ পেয়েছিল মেদিনীপুর জেলায়। গান্ধীজির অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জেলার মানুষ নির্ভরতা খুঁজে পেলেন কাঁথির চণ্ডীভেটি গ্রামের দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মধ্যে। শাসমলের নেতৃত্বে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় 'চৌকিদারি ট্যাক্স' দেব না আন্দোলনের সাফল্যে পিছু হঠল ইংরেজ প্রশাসন। মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচারের আত্মগ্লানিতে দেশীয় পুলিশ নিজেদের ব্রিটিশ পোশাক খুলে পুড়িয়ে দিল আগুনে। আর ১৯২২-এ মেদিনীপুরের ব্রাডলিবার্ট হলের এক জনসভায় সরলা দেবী চৌধুরী চরকায় সুতো কাটার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ব্যাপকভাবে। ঐ বছরেই ৯ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় খদ্দর বিক্রির সময় বাসন্তীদেবী, উর্মিলাদেবী এবং সুমিতাদেবীর গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় জেলার সমস্ত মেয়েরা গর্জে উঠেছিল একসঙ্গে।

অসহযোগ পেরিয়ে গান্ধীজি ঢুকে পড়লেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। লবণকে কেন্দ্র করেই এই আন্দোলন। ইংরেজের লবণ আইন অমান্য করার জন্য গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযানের ঢেউ আছড়ে পড়ল মেদিনীপুরের তমলুক এবং কাঁথি মহকুমার সর্বত্র অতি সহজেই। কারণ, লবণ এই দুই মহকুমার বহু মানুষের জীবিকা। এই লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার মেয়েদের পূর্ণ আত্মপ্রকাশ যার ধারাবাহিকতা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত। চরম অত্যাচার উপেক্ষা করে তারাও রুখে দাঁড়িয়েছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, সাধারণ মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হওয়ার জন্য। প্রকৃতপক্ষে মহিলারাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। ১৯৩০-এর ১৩ মার্চ কলকাতায় উর্মিমালাদেবীর সভাপতিত্বে 'নারী সত্যাগ্রহ কমিটি' যেমন তৈরি হয়েছিল, ঠিক তেমনই গড়ে উঠল বিভিন্ন জেলায়।

মেদিনীপুর জেলায় মহিলাদের নেতৃত্বে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন নতুন এক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। সঠিকভাবে আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রতি মহকুমায় এবং থানায় একজন করে ডিরেক্টর পদে নির্বাচিত হতেন। তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলে আর একজনকে সেই

পদে নির্বাচন করা হত। তমলুক মহকুমার যে সব মহিলারা পর পর নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন ঃ

প্রথম ডিরেক্টর ঃ সুহাসিনী দেবী। প্রাক্তন বিপ্লবী ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের বড় দিদি, কাঁচিদি নামেই অধিক পরিচিতা। এই মহিলা, দলের জন্য চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে গোপন মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, গোপন খবর দলের অন্যান্যদের পৌঁছানো এরকম নানা কাজে যুক্ত ছিলেন। লবণ আইন ভঙ্গের জন্য কারাবরণ করেছিলেন ৬ মাস।

দ্বিতীয় ডিরেক্টর ঃ ইন্দুমতী ভট্টাচার্য। জেলার বিভিন্ন মহিলা সমিতির কর্ণধার। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন স্বাধীনতার নানান কাজে। সবার কাছেই পরিচিতা 'মাসিমা' হিসেবে।

তৃতীয় ডিরেক্টর ঃ লক্ষ্মীমনি মুখোপাধ্যায়।

চতুর্থ ডিরেক্টর ঃ নিত্যবালা গোল।

পঞ্চম ডিরেক্টর ঃ সুবোধবালা কুইতি। জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতমা। তমলুক মহকুমার মহিলা আন্দোলনকারীদের নেত্রী। স্বয়ং জেলাশাসকের উপস্থিতিতে এবং চরম অত্যাচারেও তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের জন্য বিক্ষোভকারী অসংখ্য মানুষ মহিষাদলরাজের রথের দড়ি টানেনি। এই অপরাধের জন্য পুলিশ তাঁকে চুলের মুঠি ধরে থানায় নিয়ে যায় এবং এই অপরাধেই তাঁর একবছরের কারাদণ্ড হয়। অত্যন্ত সৎ, সাহসী ও দৃঢ়চেতা মহিলা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের জন্য কাজ করে গেছেন।

থানায় যাঁরা ডিরেক্টর ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ

তমলুক থানা ঃ রাজলক্ষ্মী সিং

মহিষাদর থানা ঃ লক্ষ্মীমনি হাজরা। (স্বাধীনতা সংগ্রামী নীলমনি হাজরার স্ত্রী)।

সুতাহাটা থানা ঃ প্রভাবতী সিংহ।

ময়না থানা ঃ প্রভাবতী মাইতি (স্বাধীনতা সংগ্রামী রাখালচন্দ্র মাইতির স্ত্রী)।

পাঁশকুড়া থানা ঃ কিরণবালা দেবী।

নন্দীগ্রাম থানা ঃ চিকনবালা জানা

এই ডিরেক্টররা ছাড়াও আরও অনেক মহিলা ছিলেন, আন্দোলনে যাঁরা যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নেতৃস্থানীয়ারা হলেন —

১। মেদিনীপুর হিন্দু গালর্স স্কুলের শিক্ষিকা চারুশীলা দেবী।

২। অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটোবোন পুষ্পরাণী ব্যানার্জী (পুটুদি)।
৩। উমা সেন।
৪। কংগ্রেস নেতা সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর স্ত্রী ইন্দুপ্রভা চক্রবর্তী।
৫। কংগ্রেস নেতা কুমারচন্দ্র জানার স্ত্রী চারুশীলা জানা।

নেতৃস্থানীয়া এই মহিলারা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মিটিং মিছিল করে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা, সভাসমিতিতে ভাষণ দেওয়া, গোপনে দলের খবর অন্যান্যদের জানানো, চাঁদা তোলা, লবণ আইন ভঙ্গ করে দেশীয় প্রথায় লবণ তৈরী, চরকায় সুতাকাটা, স্বদেশী জিনিস গ্রহণ আর বিদেশী বর্জনের জন্য মানুষকে অবহিত করা ইত্যাদি নানাবিধ কাজের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, অনেক অমানুষিক অত্যাচারও সহ্য করেছেন। তবু এই নেতৃস্থানীয়ারা ছাড়াও অসংখ্য মানুষের মিছিলে হাজার হাজার মা-বোনেরা সরাসরি কিংবা গোপনে কাজ করে গিয়েছেন।

তমলুক থানা কৃষ্ণগঞ্জ সমর পরিষদের সুখদা দেবী ১৯৩২-এর ১৮ই এপ্রিল পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও নির্ভীকভাবে তা উপেক্ষা করে তখনকার জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন তমলুকের দেওয়ানি আদালতের ছাদে। নির্ভীকতা এবং অদম্য সাহসে ভর করেই অত্যন্ত দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে জেলাশাসক পেডি-র অত্যাচারকে উপেক্ষা করে তমলুকের নরঘাট এবং কাঁথির পিছাবনী ছাড়াও সমগ্র জেলার বিভিন্ন লবণ আইন-ভঙ্গ কেন্দ্রে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা ছিলেন এগিয়ে। তাই দেখি ১৯৩০-এর ৬ই এপ্রিল তমলুকের রাজবাড়ির মূল সত্যাগ্রহ শিবির থেকে ৮ হাজারেরও বেশি মানুষের মিছিল যখন বাংলার ডাণ্ডি 'নরঘাট'-এ আইন অমান্য করার জন্য পৌঁছল, চরম অত্যাচার করল পেডি-র পুলিশ। তবুও আইন অমান্য করল মিছিলের লোকজন। মহিলাদের ভূমিকাও এখানে গর্ব করার মতন। চারুশীলা দেবী এবং জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী যখন আইন ভাঙার আগে মিটিং করতে চাইলেন, ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা জেলাশাসক পেডি মিটিং করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে জ্যোর্তিময়ী দেবী বললেন যে, 'যারা দেশমাতৃকার জন্য রক্ত দিতে প্রস্তুত তাঁরা মিটিং এ থাকবেন, বাকিরা মিটিং-এর স্থান থেকে চলে যেতে পারেন।' তাঁর এই কথায় কেউ ফিরে গেলেন না। শুধু তাই নয় তিনি তাঁদের তৈরী লবণ, জেলাশাসক পেডিকে কিনতে বাধ্য করেছিলেন। সেই সময় সত্যাগ্রহীরা বন্দোমাতরম ধ্বনিতে-বাতাস মুখরিত করেছিল। আর ক্রুদ্ধ পেডি লাঠি চার্জের হুকুম দিয়েছিলেন।

শুধু তমলুকই নয়, কাঁথির পিছাবনীর লবণ-সত্যাগ্রহ কেন্দ্রেও বহু মহিলা সদস্যা জনসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। খেজুরীতে কংগ্রেস নেতা নিকুঞ্জ মাইতি-র স্ত্রী অহল্যা মাইতি এবং বসন্ত দাস-এর স্ত্রী তরঙ্গিনী দাস ও আরও অনেকেই। কাঁথির রাজবালা দেবী এবং তিলোত্তমাদেবী ১৯৩২-এ কাঁথির মহকুমা শাসককে আগাম জানিয়ে দিয়েই মিছিল করে সাহেব নগরের পোষ্ট অফিসে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। এমনিভাবেই পটাশপুর

থানার বাল্যগোবিন্দপুরে জনসভা করার আগাম নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মেদিনীপুরের জেলাশাসকের কাছে সুখদাময়ী রায়চৌধুরী। তিনি বলেছিলেন,—

"Sir,

Two emerging ordinance had been issued to me. India is not a free country. The British Government has been rendering oppression on Indian people ... I have become the member of the unlawful Congress Organisation and rendering all kinds of help to its workers. I shall follow all the directions of the Congress. I shall deliver lecture in a public meeting on 4th April, 1932 at Balyagobindapur village under Patashpur P.S. on the occasion of 'Gandhi Divas'. I am to inform you in this regard"

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যে মহিলা আন্দোলনকারীরা মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন তার আভাস মেলে বাঙলা গভর্ণমেন্টের মুখ্যসচিবকে লেখা মেদিনীপুরের জেলাশাসকের একটা চিঠি থেকে ঃ

'Thanas, Munsiffs, Sub-registration offices, Union Board Offices and Post Offices, have all been the objectives of attact and no infrequently dispersal by force has been the only recourse if the staff were to ramain in possession at all. The Munsif's Courts at Dantan and Garbeta in Midnapore have been invaded. At Anandapur in Keshpur Police Station, Midnapore district, repeated attempts have been made on the sub-registry office, on one occasion the crowd numbering about 3000. In some cases the processionists have been few in number. Women always lead the way.'

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে দেশ আবার উত্তাল হয়ে উঠল। অসহযোগ, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ দিকের সংগ্রাম ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলন। যোগ্য নেতৃত্ব, বলিষ্ঠ সংগঠন ইত্যাদির জন্য মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশে তমলুক মহকুমায় এই আন্দোলনের সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। মুখ্য নেতৃত্বের ভার অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত, রমেশচন্দ্র কর, সুশীল ধাড়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দের হাতে। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে-র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল অবিভক্ত তমলুক মহকুমা (বর্তমানের তমলুক ও হলদিয়া মহকুমা)। বিপ্লবের এই অংশেও মেয়েদের ভূমিকা অনন্য।

স্বাধীনতা যাঁদের দুর্জয় স্বপ্ন, আত্মাহুতি যাঁদের জীবন পণ তাঁদেরই একজন আলিনান গ্রামের বিধবা গরীয়সী মাতঙ্গিনী হাজরা। নিদারুণ জ্বালা বুকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন লড়াইয়ের প্রান্তরে। প্রাণে আর মনে সাহস নিয়ে আত্মবলিদানের মাধ্যমে নিজেকে উত্তীর্ণ করে ১৯৪২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর দুঃসাহসিক তমলুক থানা অভিযানের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ব্রিটিশের গুলি খেয়েও জাতীয় পতাকা উর্দ্ধে তুলে রেখে মৃত্যুবরণ করে জাতীয় গৌরব

হয়ে গেলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাঁর সংগ্রামী জীবন শুরু, ১৯৩৩-এ যিনি বাঙলার গভর্নরকে কালো পতাকা দেখিয়েছিলেন, দেশের জন্য তিনি আত্মাহুতি দিলেন ১৯৪২-এ।

ব্রিটিশের অত্যাচারের পাশাপাশি এল ১৯৪২-এর ১৬ই অক্টোবর মহাপ্রলয়ের ঝড়, সমুদ্র প্লাবন। ক্ষতিগ্রস্থ হল কাঁথি মহকুমা আর তমলুক মহকুমার এলাকা। সমানে পাল্লা দিয়ে চলল লুন্ঠন আর নারী নির্যাতন। শারীরিক অত্যাচারে লজ্জায় হিম হয়ে গিয়েছিল দুই মহকুমার মা-বোনেরা। বিশেষ করে তমলুকের চন্ডীপুর, মাশুড়িয়া এবং ডিহি মাশুড়িয়া গ্রামের মা-বোনেরা — যাঁরা ধর্ষিতা হয়েছিলেন অকথ্যভাবে। যা শুনে গান্ধীজি পরে মহিষাদলে সরেজমিন তদন্তে এসে তাঁর মহিলা পর্যবেক্ষকদের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে বলেছিলেন, 'বর্বর'। ১৯৪৩-এর ৯ই জানুয়ারী এক সঙ্গে একই জায়গায় মোট ৭৬ জন মহিলার ওপর ধর্ষণের ঘটনা বিস্ময়কর। হয় স্বামীরা অথবা নিজেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিযুক্ত থাকার অপরাধে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর লোকজন এরকম নির্মম ঘটনা ঘটিয়েছিল যাতে ওরা স্বাধীনতার কাজ থেকে বিরত থাকেন। এতবড় অমানবিক কাজের ভয়াবহতা নিজে পর্যবেক্ষণ করার জন্য গান্ধীজি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্য জায়গায় অনুষ্ঠান বাতিল করেও অবিভক্ত তমলুক মহকুমার মহিষাদলে এসেছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ১৯৪৩-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় সদস্য নলিনাক্ষ স্যান্যাল নিপীড়িত এক মানুষের কথায় বলেছিলেন ঃ

> "এতদিন পল্টনসহ পুলিশ ভলান্টিয়ার ধরিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমাদের গ্রামসমূহে প্রবেশ করিয়া নিরীহ অধিবাসীদিগকে ভীষণভাবে প্রহার করিয়াছে। অনেকের অর্থ অলংকারাদি আত্মসাৎ করিয়াছে এবং কাহারও বন্যাপ্লাবনাবিশিষ্ট আবশ্যকীয় দ্রব্য এমনকি খাদ্যাদিও নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহারা এক্ষণে আমাদের মাতৃভূমির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সতীত্বে হস্তক্ষেপ করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অনশনক্লিষ্ট অত্যাচারিত অধিবাসীদের অন্তরে তুষানল জ্বালাইয়া দিয়াছে।"

তাই ১৯৪৫-এর ২৬শে ডিসেম্বরে প্রায় ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষের উপস্থিতিতে মহিষাদলের জনসভায় গান্ধীজি বলেছিলেন, 'মেদিনীপুরের জনগণের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিয়া আমি এখানে আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, আজ সে সুযোগ পাইয়া আমি সুখী'। যাইহোক, দৈনিক লাঞ্ছনা সত্ত্বেও একজনও ধর্ষিত মহিলাকে সমাজচ্যুত হতে হয়নি। এঁদের মধ্যে আজও বেঁচে আছেন অম্বিকাবালা মাইতি, কিরণবালা মাইতি, টুকুবালা বেরা, কিশোরী কুইল্যার মতো সম্মানীয়া মহিলারা, যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের ইজ্জত খুইয়েছিলেন।

অমানবিক এই অত্যাচারে বিদ্রোহী জনতা অবরোধ করল মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম আর ময়না থানা। ময়না থানা দখলের ভার পড়েছিল মহিলা সদস্যা প্রভাবতী মাইতির ওপর। তিনি পুলিশের ব্যারিকেড সত্ত্বেও পাশের গলিপথ দিয়ে ময়না থানায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন জাতীয় পতাকা। এই অপরাধে তিনি ৪ বছরের কন্যা বীণাপাণীকে নিয়ে মেদিনীপুর জেলে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।

অত্যাচারী ব্রিটিশশক্তিকে প্রতিরোধ করতে সুশীল ধাড়ার প্রচেষ্টায় তমলুক মহকুমায় গড়ে তোলা হয়েছিল বিদ্যুৎবাহিনী আর ভগিনীবাহিনী। ভগিনীসেনা-র অধিনায়িকা ছিলেন সুবোধবালা কুইতি। প্রধান কার্যালয় ছিল দ্বারিবেড়্যা। প্রায় পাঁচহাজার সদস্যা ছিল এই বাহিনীর। এঁদের নেতৃত্বে ঐ তল্লাটের মা-বোনেরা কুসংস্কার ও ঘরের দেওয়াল ছেড়ে যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তা নজীরবিহীন। ভগিনীবাহিনী আর বিদ্যুৎবাহিনী মিলে গিয়ে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অধীনের যে সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে তার সুযোগ্য নেতৃত্বে ছিলেন সুশীল ধাড়া এবং গোপীনন্দন গোস্বামী। বাহিনীর উল্লেখযোগ্য মহিলা সদস্যারা হলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ডাকুয়ার স্ত্রী কুমুদিনী ডাকুয়া, সন্ধ্যা সিনহা, ঊষা চৌধুরী প্রমুখ।

সমাজের নানান স্তরের মানুষ সাহায্য করেছেন আন্দোলনকে। মহিলারাও বিভিন্নভাবে এগিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকে। আমরা অনেকের কথা জানি, অনেকের কথা জানি না। কত মহিলা পরোক্ষ সাহায্য করেছেন আন্দোলনকে। কত পুরুষ আন্দোলনকারীকে গোপনে স্বামীদের অনুপস্থিতিতে এবং কখনও তাদের উপস্থিতিতেই বিছানায় স্বামী পরিচয় দিয়ে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে পুলিশের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে। একজন আন্দোলনকারীর রেখে যাওয়া গোপন খবর জানিয়ে দিতে হয়েছে অন্য আন্দোলনকারীকে, কেউ তার হিসাব রাখে না। কত মহিলারা বিপ্লবের খরচ চালানোর জন্য খুলে দিয়েছেন তাঁদের নিজেদের গহনা। এমনি করেই সুতাহাটা থানার অনন্তপুরের নিঃসন্তান বিধবা হররমা সান্ধকী ১৯২১-এ জাতীয় স্কুল করার জন্য সমস্ত জমি দান করলেন যা চালু করেন কংগ্রেস নেতা কুমারচন্দ্র জানা।

সমাজে যাঁরা অচ্ছুৎ হিসেবেই পরিচিত, সেই বারবণিতারাও কতভাবে সাহায্য করে এগিয়ে দিয়েছেন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে। সহায় সম্বলহীন ক্ষুদিরাম বসুকে যে কজন মহিলা সাহায্য করতেন তার একজন ছিলেন বারবণিতা। নারায়ণগড়ের ট্রেন উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা বিপ্লবীরা করেছিলেন মেদিনীপুর শহরের কামিনী বেশ্যা এবং রাজবালা বেশ্যার বাড়িতে। ১৯৪২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুকের থানা অভিযান আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আহত আন্দোলনকারীদের সেবা শুশ্রূষা ক'রে এবং তাদের কবল থেকে রক্ষা করে বারাঙ্গনা সাবিত্রী দে হয়েছিলেন বীরাঙ্গনা। শুধু তাই নয় বিপ্লবী সুশীল ধাড়া যখন তমলুক জেলে, তখন জেল থেকে সুশীল ধাড়া এবং বাইরের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বিপ্লবী রমেশচন্দ্র কর যোগাযোগ রাখতে পারতেন বারাঙ্গনা সাবিত্রী দে-র মারফৎ।

খ্যাত-অখ্যাত, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা, পতিতা, কুলবধূ অসংখ্য মহিলারা মেদিনীপুর তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছিলেন। এঁদেরই প্রচেষ্টায় ও সক্রিয় সহায়তায় অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত, সুশীল ধাড়া প্রমুখ বিপ্লবীদের ঐকান্তিক বুদ্ধিমত্তায় তমলুকে প্রতিষ্ঠিত হল পরাধীন ভারতে প্রথম দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীন সরকার — 'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর।

মেদিনীপুরের মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ সমস্ত অবিচারকে উপেক্ষা করে এক প্রচণ্ড শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে শক্তিমান ব্রিটিশ সরকারের পাশাপাশি ২ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২— ৮ই আগস্ট ১৯৪৪) তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার নিজস্ব বিচারব্যবস্থা, জেলখানা, পুলিশবাহিনী, প্রচার মাধ্যম, পোস্ট অফিস-ইত্যাদির মাধ্যমে যেভাবে স্বাধীনভাবে প্রশাসন চালিয়েছিল তমলুক মহকুমায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আর এই স্বাধীন সরকারের ভিত্তিভূমি গড়ার পেছনে রয়েছে মহকুমার মহিলাদের অবিস্মরণীয় অবদান।

তাই আজ তাঁদের অবদানকে স্মরণে রেখে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া সময়ে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কথায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বলতে হয় ঃ

"In this solemn hour of our history
We after many years of struggle
We are taking over
The Governance of this country,
Let us offer our humble thanks
To the Almighty Power that shapes
The destinies of men and nations
And let us recall in greatful rememberance
The services and sacrifices of all
Those men and women,
known and unknown"

আন্দোলনের স্মরণীয় নাম রমেশচন্দ্র কর ঃ একটি সাক্ষাৎকার

১৯৪২। গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ইংরেজদের তাড়িয়ে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ৮ই আগষ্টের বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনের গভীর রাতের ভারতছাড়ো আন্দোলনের সিদ্ধান্তের জের টেনে সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল জেলা মেদিনীপুর। অগ্রণী ভূমিকায় তখনকার অবিভক্ত তমলুক মহকুমার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের গণসংগ্রাম। বোম্বাই কংগ্রেসের গভীর রাতের সেই সিদ্ধান্ত তমলুকের কংগ্রেসের নেতারা জানলেন ৯ই আগষ্ট সকালে। সামান্য দ্বিধাগ্রস্থতার খোলস ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তমলুকের মানুষ।

উনবিংশ শতকের একেবারে শেষের দিকে তমলুক রক্ষিত বাড়ির ব্যায়ামাগারের আড়ালে বিপ্লবী কাজকর্ম, ১৯২১-এ জননেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ট্যাক্স দেবো না আন্দোলন, ১৯২৪-এ হ্যামিলটন স্কুলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উপস্থিতিতে স্বদেশী মেলার উদ্বোধন, বিশ-ত্রিশের দশকে মহেন্দ্রনাথ মাইতির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের নানান সিড়ি বেয়ে আন্দোলন এসে পড়ল সোজা বিয়াল্লিশে। এই বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পুরোভাগে সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এবং সুশীল কুমার ধাড়া এই ত্রয়ীর নাম এসে পড়ে এক লাইনেই। এদের সঙ্গে আর একজন বিশেষ বিপ্লবীর নাম উঠে আসে — তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র কর, আগস্ট আন্দোলনের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বিয়াল্লিশে আন্দোলনের রূপকল্পনা নিয়ে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মন্মথ দাসের কলকাতার বাড়িতে জেলার কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভায় তমলুক মহকুমার চার প্রতিনিধির মধ্যে উপস্থিত রমেশ চন্দ্র কর। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপত্র 'বিপ্লবী'র বিয়াল্লিশের ২৩শে ডিসেম্বরের তমলুক বার্তায় লেখা হয়েছিল, 'গত ১৮।১২ তাং রাত্রে সফৌজ তমলুকের বড় দারোগা বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী রমেশচন্দ্র করের সোনাপেত্যার বাড়ী তল্লাসী করিয়া রমেশবাবুকে না পাইয়া ঘড়াঠাকুরিয়া গ্রামের রামচন্দ্র মাইতির ধানের কল তল্লাসী করে।'

স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু বর্ণময় ঘটনার নায়ক এই বিপ্লবী রমেশচন্দ্র কর। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২), লবন আইন অমান্য অন্দোলন (১৯৩০-৩২) এবং বিয়াল্লিশের আন্দোলন (১৯৪২-৪৫) এই তিনটি পর্যায়ের আন্দোলনেরই তিনি সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এক সময়ের ব্যক্তিগত সচিব রমেশচন্দ্র কর ১৯৪৭-এ যখন স্বাধীন ভারত হল, সেই সময় তিনি ছিলেন তমলুকের মহকুমার কংগ্রেসের সেক্রেটারী। এহেন এক বর্ণময় ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে তাম্রলিপ্ত পত্রিকার যুগ-সম্পাদকদ্বয় জয়দেব মালাকার এবং অনিল পট্টনায়ক যখন লেখার অনুরোধ জানালেন তখন এই

প্রতিবেদককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারের (১২.৯.১৯৭৭) কথা মনে পড়ল। রমেশ কর সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি তা না জেনে বরং আন্দোলনের নানান কাহিনীর কথা তাঁর কথাতেই শোনা উপযোগী হবে ভেবেই নিচে তুলে দিলাম সেই দিনের নেওয়া সাক্ষাৎকারের অংশটি। আন্দোলনের যে তিনটি পর্যায়ের কথা আমরা বললাম সেই তিনটি পর্যায় যেমন প্রতিভাত হয়ে উঠবে, তেমনই পেয়ে যাবো ব্যক্তি রমেশচন্দ্র করকে এই সাক্ষাৎকারে ঃ

প্রশ্ন — আপনার নাম?

উত্তর — রমেশচন্দ্র কর।

প্রশ্ন — আপনার বাড়ি ?

উত্তর — বাড়ি সোনাপোতা। তমলুকও ধরতে পারেন। তমলুকেও একটা বাড়ি ছিল, এইটা আমার তমলুকের বাড়ি। কখনও থাকতাম সোনাপেতের বাড়িতে, কখনও তমলুকের বাড়িতে। অধিকাংশ সময় থাকতাম তমলুকের বাড়িতে। আমি যখন কলেজে থাকতে 'এগজামিন' দিয়ে চলে এলাম।

প্রশ্ন — সেটা কত সাল?

উত্তর — সেটা ১৯২০ হবে। কলেজ থাকতে বেরিয়ে এলাম। তখন দেখলাম যে 'রাউলাট আইন' পাশ হয়েছে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর হত্যাকান্ড হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকান্ড এবং 'বউলট' আইন আমাকে পাগল করে তুলেছিল। কি করে এর প্রতিবিধান করা যায়, কি করে কি হয় (এটাই ছিল আমার চিন্তা)। তখন কাগজে দেখলাম যে দেশবন্ধু ডাক দিয়েছে ঐ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স করার জন্য। যখন ডাক দিল, কংগ্রেস তখন বে-আইনী বলে ঘোষিত হল এবং কংগ্রেসের একটা ছাপ নিলেই পরে অমনি গ্রেপ্তার করত। ব্যাজ একটা হলে পরেই (গ্রেপ্তার)। ব্যাজ ধরে তখন গ্রেপ্তার চলতে থাকল। তখন ১০/১২ দিনের মধ্যেই সমস্ত জেলগুলো ভর্তি হয়ে গেল। আমাদেরকে রাখল খিদিরপুর ডক-এ। খিদিরপুর ডকে থাকা খুব কষ্ট। ডক্ ইয়ার্ড তো? ডক্ মানে মাল যেখানে থাকে আর কি। স্নানের কোন সুবিধা নাই। তারপর আমাদেরকে বলল, 'চল তোমাদেরকে স্নান করিয়ে আনব।' আমরা উৎসাহিত হয়ে তাদের প্রিজন ভ্যানে চেপে গঙ্গা স্নান করতে গেলাম। কিন্তু গঙ্গা স্নান করবার নামেতে রেড রোডে গিয়ে সেখানে বলল যাও তোমরা তোমাদের নিজেদের বাড়ি চলে যাও। সকলেই বললাম, কিসের জন্য বাড়ি চলে যাবো? তুমি আমাদের কনভিক্শন দিয়েছো, ৬ মাস থাকব। বলল, না তোমরা বেরিয়ে যাও এখান থেকে। প্রিজন ভ্যানের মধ্যে মারধোর আরম্ভ করল। কাজেই বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসতে হল। বাড়ি চলে এলাম। তারপরেতে এলেন দেশবন্ধু (চিত্তরঞ্জন দাস)। দেশবন্ধু হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বি. পি. সি. সি এবং বীরেন্দ্র শাসমল ছিলেন সেক্রেটারি। তারপর এলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। উনি একটা প্রোগ্রাম ঠিক করলে যে এসে প্রেসক্রাইব রিপোর্ট

পড়তে হবে। আমি আর আমার তমলুক সাব-ডিভিশনের বন্ধু পরেশ পট্টনায়েক দুজনেই প্রেসক্রাইব বই পড়লাম। জে. এম. সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হল। আমরাও দুজন মঞ্চে উঠলাম প্রেসক্রাইব রিপোর্ট পড়বার জন্য। পরেশ পট্টনায়েককে খুব মার দিল। তার চোখটা কেটে গেল। আমার পিঠে দু-এক ঘা লেগেছিল। (আমাদের) ধরে নিয়ে গেল। তারপর জেল হ'ল। জেল থেকে ফিরেছি বা ফিরব তার আগেই দেশবন্ধু বেরিয়ে এলেন। ৬ মাস জেলে ছিলাম। দেশবন্ধু আর শাসমল তখন বললেন যে আমাদের কংগ্রেস অর্গানাইজেশনকে খাড়া করতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামেতে কংগ্রেস অর্গানাইজেশনকে ছড়িতে দিতে হবে। ঠিক সেই সময় এসেছিল (একটু ভেবে নিয়ে) যুবরাজ। যুবরাজ মানে প্রিন্স অফ্ ওয়েলস। ঠিক হল ওকে রিসিভ্ করব আমরা হরতাল দিয়ে।

প্রশ্ন — সেটা কত সাল?

উত্তর — সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান। হ্যাঁ তখন হরতাল হ'ল। কলকাতা বম্বেটম্বে সর্বত্র পুরোপুরি হরতাল।

প্রশ্ন — আপনারা তমলুকে হরতাল করেছিলেন?

উত্তর — হ্যাঁ। সর্বত্র হরতাল। কলকাতায় হরতাল তো একেবারে (সব বন্ধ) । মেইন রাস্তায় তো একটিও ঘোড়া নেই, গাড়ি নেই। কোন কিছু নেই। কোন কিছু নেই একেবারে। কয়েক দিন পরে শাসমল এলেন —

প্রশ্ন — আপনি তমলুকের ঘটনাটা বলুন। তমলুকে কি হয়েছিল?

উত্তর — তমলুকে প্রত্যেকটি হাটবাজার এবং অন্যান্য জায়গায় হরতাল হল। কয়েকদিন পরেই এলেন শাসমল। শাসমল আসবার আগেতে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ মাইতিকে যে তুমি ওখানে কংগ্রেস কর্মীদের ডাকিয়ে রাখো আমি তোমাদের সঙ্গে মিট করব। মহেন্দ্রবাবু তখন কংগ্রেস কর্মীদের ডেকে রেখেছিলেন। কংগ্রেস কর্মীরা এসেছিলেন। খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে এবং রাজবাড়ি থাকতে রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রচুর পরিমাণে মাছ পাঠিয়ে দিয়েছিলো। তারপরে শাসমল ইউনিয়ন বোর্ডের অপকারিতা সম্বন্ধে বললেন, যে 'তোমরা যদি আমাকে অভয় দাও তাহলে পরে আমি এই মুভমেন্ট আরম্ভ করি।' শাসমল জেল থাকতে বেরিয়েই প্রথমে আসেন তমলুকে মহেন্দ্রবাবুর ওখানে। মহেন্দ্রবাবু তখন একজন সিনিয়র ভালো উকিল এবং সবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন।

প্রশ্ন — তখন কি এখানে কংগ্রেস কমিটি গঠন হয়ে গেছে?

উত্তর — তখনও হয়নি।

প্রশ্ন — অজয়বাবু এবং সতীশবাবুর ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর — এমনই আমাদের মতন সাধারণ। শাসমল যখন বোঝালেন তখন আমরা সকলে বললাম যে আমরা নিশ্চয়ই টেকপার্ট করব। টেকপার্ট করার পরেতে আমরা গ্রামে গ্রামে

প্রচার আরম্ভ করলাম। চৌকিদারী ট্যাক্স, ইউনিয়ন ট্যাক্স, ইউনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স তোমরা দিও না ইউনিয়ন বোর্ড যতক্ষণ না ওঠে। অন্যদিক দিয়ে গভর্ণমেন্টও চেষ্টা করল। তার মানে গভর্ণমেন্টের যারা সব ফেভারিট তাদের দ্বারা চেষ্টা করালেন ইউনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স দেওয়ার জন্য। রায়বাহাদুর, রায়সাহেব ওরা সব গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঐ সব করতে আরম্ভ করল এবং গভর্ণমেন্টও তখন কিছু খাল পুকুর খনন করল। জল খাবার জন্য পানীয় জলের কুঁয়ো তৈরী করল। এসবের জন্য কিছু টাকাকড়ি দিল। কিন্তু জনসাধারণ ভুলল না। ঠিক তার পন্থাতে চলল। ইউনিয়ন বোর্ড বন্ধ হল। সারা জেলাব্যাপী বন্ধের সম্বন্ধে শাসমল গান্ধীজির আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রথম সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স তখন হচ্ছে তমলুক ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট। সেইজন্য উনি গান্ধীজিকে বলেছিলেন আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমার মুভমেন্ট সাকসেশফুল হয়। গান্ধীজি রসিক লোক ছিলেন। তিনি ওকে জানালেন যে দেখ, ক্ষতি যদি হয়, তোমরা যদি খারাপ কর তাহলে পরে শাসমল তোমার দায়িত্ব। আর ভালো যদি হয়, তোমরা যদি সাকসেশফুল হও এ দায়িত্ব গান্ধীজির। এ দায়িত্ব কংগ্রেসের। তারপরে মুভমেন্ট হল, অনেক মাল ক্রোক হল। মাল কিছু কিছু তমলুকে নিয়ে এল। বাকি মালগুলো তো বইবার লোক পেল না। অনেক সময় চৌকিদার দফাদারকে দিয়ে বওয়াত। তারাও আর রইল না। কাজেই গরু-টরুগুলো এখানে নিলাম টিলাম হল। ২০০ টাকার গরুর জোড়া দুটো হয়ত ৭০ টাকা (একেকটা) দামে বিক্রি হয়। কখনও ২০ টাকা ৩০ টাকা। ঘটি বাটি খুব কম দামে কিনল। তা ছাড়া কেনবার কেউ লোক ছিল না। এরকম ধরণের কিছুদিন চলল। কিছুদিন চলার পরেতে ওরা ইউনিয়ন বোর্ডকে উইথড্র করে নিল।

প্রশ্ন — কংগ্রেস যে শুরু হ'ল এখানে তাঁর উদ্যোগ কে নিল? বীরেন শাসমল নিলেন?

উত্তর — বীরেন শাসমলই করল। তারপরে এখানে প্রভিনশিয়াল কমিটি একটা হলো। মহেন্দ্রবাবু হলেন প্রেসিডেন্ট এবং চন্ডী দত্ত হলেন সেক্রেটারী।

প্রশ্ন — আর আপনারা?

উত্তর — আমরা তার সঙ্গে সহযোগিতা করলাম।

প্রশ্ন — সতীশবাবু আর অজয়বাবু?

উত্তর — হ্যাঁ, ওরাও। একসঙ্গেই ছিলাম। তখন মেম্বারশিপের দাম চার আনা। কেউ চার আনা পয়সা দিতে পারে, না হলে দুগাছি সুতা দিতে পারে। মেম্বার হলাম। মেম্বার হওয়ার পরেতে কমিটি ফর্ম হল। সে কমিটিতে ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট হলেন মহেন্দ্রবাবু। সেক্রেটারী হলেন চন্ডীবাবু, তারপরে কমিটি একটা করা হল। তরপরে কংগ্রেস কমিটি ক্রমশ তাদের কাজ শুরু করল। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা কংগ্রেসের মিটিং করতে আরম্ভ করল। কংগ্রেসের মিটিং-এ 'রউলাট' আইন প্রয়োগ করা হত, কারণ তখনও তো রউলাট আইন তুলে নেয়নি, জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং মুসলমানদের ধর্মস্থানে অবরুদ্ধ করার ব্যাপার নিয়েই

(মিটিং)-এ যেতাম। এবং তারা (সাধারণ মানুষ) আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিল।

প্রশ্ন — লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন কখন হল?

উত্তর — লবণ আন্দোলনটা আরম্ভ হল থার্টিতে গিয়ে।

প্রশ্ন — লবণ আন্দোলন আপনারা কেন করলেন?

উত্তর — সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স।

প্রশ্ন — কি করলেন?

উত্তর — লবণের উপর গভর্ণমেন্টের যে ট্যাক্স ছিল, লবণ তৈরী করা যে বে-আইনি হল, গভর্ণমেন্টের ঐ আইনটাকে ডিসওবিডিয়েন্স করবার জন্য লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন। প্রথম আমাদের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন হল নরঘাটে। লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হল। একটা তার সেন্টার তমলুক মহকুমায়। ঐ সেন্টারকে গভর্ণমেন্ট চাপ দিল। মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট এর খুব দুর্দান্ত ডি. এম., পেডি ওখানে এসে লবণ সত্যাগ্রহীদের ওপর খুব অত্যাচার শুরু করল। মারপিট, তপ্ত বালির ওপর তাদের শুইয়ে রাখা এইভাবে নানা প্রকারের অত্যাচার তিনি আরম্ভ করলেন।

প্রশ্ন — গান্ধীজি এসেছিলেন?

উত্তর — না। গান্ধীজি মাত্র এসেছিলেন একবার (১৯৪৫-এর ২৫শে ডিসেম্বর)।

প্রশ্ন — লবণ আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে?

উত্তর — সবাই মিলে কাজ করেছি। তবে হংসবাবু নরঘাটে প্রথম নেতৃত্ব দিলেন।

প্রশ্ন — হংসবাবুর পুরো নাম কি?

উত্তর — হংসধ্বজ মাইতি। উনি প্রথম আরম্ভ করলেন।

প্রশ্ন — তারপর কি হল?

উত্তর — হংসধ্বজ মাইতির আগেই অজয়বাবু গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। আরও অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে গেল। তখন আমরা একটু সাবধান হলাম। আমরা গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করলাম। তারপর কিছুদিন পরে বি.পি.সি.সি. একটা সারকুলার দিল ঐ লবণ কেন্দ্রটাকে ডিসেন্ট্রালাইজড করে প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়নে, অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। সঙ্গে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করতে হবে। তখন তারা (সরকার) পুলিশ পাঠিয়ে অত্যাচার শুরু করল।

প্রশ্ন — এইভাবে আন্দোলন চলতে চলতে ১৯৪২তে জোরালো আকার ধারণ করল?

উত্তর — এটা হ'ল থার্টির জের। এরপর হল গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট হতে জেনারেল এ্যামনেস্টি হল। তখনকার (যে) সব প্রিজনার ছিল তাদেরকে সব ছেড়ে দিল। তারপর গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট মীমাংসা হতে না হতে আবার আন্দোলন শুরু হল। আবার চৌকিদারী

ট্যাক্স না দেওয়া, নুনমারা, আবার গ্রাম-এ (গিয়ে প্রচার)। কিন্তু দ্বিতীয়বার আন্দোলনে লোক ঠিক রেসপন্স করল না। প্র্যাকটিক্যালি দেখতে গেলে সে সময়েতে আমাদের আন্দোলন প্রায় কলাপস্। এই অবস্থাতে আমরা একটু স্তিমিত হয়ে গেলাম। তখন গান্ধীজি বললেন, না, আর মাসস্কেলে সত্যাগ্রহ নয়, এখন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ কর। অনেকে ব্যক্তিগত সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আরম্ভ করল। তারপরে গভর্ণমেন্ট যুবকংগ্রেস কর্মীদের ওপর এবং যারা কংগ্রেসের সাপোর্টার তাদের ওপর খুব অত্যাচার আরম্ভ করল।

প্রশ্ন — এর পরিপ্রেক্ষিতে তমলুকে ফর্টিটুতে জাতীয় সরকার হ'ল?

উত্তর — কুইট্ ইন্ডিয়া মুভমেন্ট। গান্ধীজি যখন বললেন তখন এ.আই.সি.সি. পাশ করল কুইট ইন্ডিয়া (৮ই আগষ্ট, ১৯৪২)। তখন আমরাও সেই কুইট ইন্ডিয়া ফলো করার জন্য মেদিনীপুর জেলার কর্মীরা মন্মথ দাসের কলিকাতার পাইক রোডের বাড়িতে প্রোগ্রাম ঠিক করলাম। যে টোয়েন্টি নাইন্থ (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২) মিড্নাপুর ডিস্ট্রিক্টে আমরা প্রত্যেক থানা আক্রমণ করব। থানাগুলো আমরা সব পুড়িয়ে দেবো। গভর্ণমেন্টের সমস্ত অফিসগুলো নষ্ট করে দেবো, পুড়িয়ে দেবো। এর তার আগে আমরা রাস্তাগুলোকে ডিসলোকেটেড করে দেবো। টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ লাইন সমস্ত আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেবো। এই রকম আমাদের একটা প্ল্যান নেওয়া হল। সেই প্ল্যানটা আমরা গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে লাগলাম, অরগানাইজড করতে আরম্ভ করলাম। টোয়েন্টি এইট্থ (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২) রাত্রি থাকতে আমাদের প্ল্যান মাফিক কাজ চলল। রাস্তাকাটা, গাছকাটা এই সব চলতে থাকল সমস্ত রাত ধরে। তারপরে এ. ডব্লিউ. শেখ, আই. সি. এস. একটা বদমাইস এস. ডি.ও.। ভোর ৪টার সময় তিনি যাচ্ছেন তার 'কার' নিয়ে। তিনি দেখলেন সব রাস্তা বন্ধ। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এর লাইন সমস্ত কিছু নেই। তখন সাইকেলে করে লোক পাঠালো কোলাঘাটে। টেলিগ্রাম করল মিড্নাপুর-এ। ট্রেনে লোক পাঠিয়ে ডি. এম. কে সংবাদ দিল 'তাড়াতাড়ি সোলজার পাঠাও। না হলে আমাদের বিপদ'। তারপর সৈন্য সামন্ত এল। এসে যে রাস্তাগুলো কাটা হয়েছিল সেই কাটাগুলোকে গ্রাম থাকতে খড়, লেপ, কাঁথা, মশারী, বিছানাপত্র এনে সারাল। তারপর মিলিটারী ট্রাক চলে এল। থানাগুলো গার্ড করল। বিপ্লবীরা যখন থানা, মহকুমা (অফিস) দখল করার জন্য এগিয়ে এল তখন তারা (পুলিশ) ওয়েলগার্ডেড। তখন তারা গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। তারপর এল বিধ্বংসী বন্যা (১৬ই অক্টোবর ১৯৪২)। বন্যার পরেতেও গভর্ণমেন্ট কিন্তু সমানভাবেই (অত্যাচার) চালিয়ে যেতে লাগল। একপাশে বন্যা, (অন্যদিকে) দিনের বেলায় রেড আর রাতের বেলায় রেপ। এরকম চলতে আরম্ভ হ'ল। তখন আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি করা যাবে এই অবস্থায়। তখন বিদ্যুৎবাহিনীর সৃষ্টি করা হল। মানে ঐ ভীরুর মত আর পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার প্রশ্রয় না নিয়ে আমাদের ঘুরে ফিরে দাঁড়াতে হবে। তা দেখা গেল ওদের স্পাই সিস্টেম খুব বড়। কে কোথায় কি করছে, কে কোথায় কংগ্রেসকে সমর্থন করছে এই সব গভর্ণমেন্ট বুঝে এবং সেই সব জায়গাতে, সেই গ্রামের ওপরে সেইসব লোকের উপর ভেবেচিন্তে

অত্যাচার শুরু করে এবং তখন আমরা ঠিক করলাম যে যারা ওদের সাপোর্টার ওদেরকে প্রথমেই বিনাশ করতে হবে। স্পাইদের যদি সরাতে না পারি তাহলে কোন কাজ করা চলবে না। তখন আমরা সেই প্রোগ্রাম নিয়ে ওদেরকে তখন সরাবার ব্যবস্থা করলাম।

প্রশ্ন — এগুলোই তো আপনাদের বিদ্যুৎবাহিনীর কাজ হ'ল?

উত্তর — হ্যাঁ। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারে বিদ্যুৎবাহিনী হল তার মিলিটারী। প্রথম এ জিনসিটা এল সুশীলের মাথা থেকে। (প্রাক্তন এম.পি.) সুশীল ধাড়া প্রথমে উদ্যোক্তা। তারপরে (যারা) আমাদের পূর্বকার কংগ্রেস এক্সিকিউটিভ মেম্বার ছিল, সেই এক্সকিউটিভ মেম্বারদের ডাকা হবে ঠিক হল। কংগ্রেস কমিটিকে তখন সাসপেন্ড করে দেওয়া হ'ল জাতীয় সরকারের ওয়ার্ক করার পর (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২)। তখন ফার্স্ট সর্বাধিনায়ক হচ্ছে সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং সুশীল ধাড়া ছিল সেনাপতি। তখন শিক্ষার ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট তখন তার মাষ্টারদিগ্‌কে কোন বেতন দিত না। স্কুলের ঘরদোর ভেঙ্গে পড়েছিল। ফজলুল হক্‌ মিনিষ্ট্রিতে তখন ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়)। শ্যামাপ্রসাদ এখানে এসেছিলেন বন্যায় বিধ্বস্ত জেলা দেখবার জন্য। তিনি দেখে খুব আশ্চর্য্য হলেন যে বন্যা ও ঝড়েতে সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংস স্তুপের মধ্যে ব্রিটিশ মিলিটারীরা নর্তন করছে। তারা দিনে করত রেড এবং রাতে 'রেপ'। অকথ্য তাদের নির্যাতন চলত।

প্রশ্ন — আচ্ছা রমেশবাবু আপনি বিদ্যুৎবাহিনীতে কিভাবে কাজ করেছেন?

উত্তর — আমি তখন ছিলাম ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর ইনচার্জ। ভাগ্যগুণে আমি প্রথমে ধরা পড়ি। প্রথমে ধরা পড়বার পরে কিছুদিন প্রেসিডেন্সি জেলে থাকি, তারপর তমলুকের জেলেতে আমাকে ট্রান্সফার করে। জয়েন্ট কেসের কো-প্রিজনার ছিল প্রহ্লাদ প্রামাণিক। প্রহ্লাদ প্রামাণিক কেসটা ডিফেন্স করতে বেল-এ চলে গেল। বাধ্য হয়েই গভর্ণমেন্ট আমাকে বেল দেয়।

প্রশ্ন — কি অবস্থায় ধরেছিল আপনাকে?

উত্তর — আগে থেকে বোধ হয় ওদের ইনফরমেশন ছিল। হাওড়া হাটে যাওয়ার রাস্তার ওপরেতে আমাকে আই.বি. ধরে ফেলল।

প্রশ্ন — আপনি হাওড়া হাটে যাচ্ছিলেন কেন?

উত্তর — হাওড়া হাটে যাচ্ছিলাম কিছু অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে। একটা লোক সেখানে কিছু টাকা দিবে বলেছিল। যাইহোক আমাকে দিল টাউন বেল। টাউন বেল যখন নিলাম তখন অজয়বাবু, সুশীলবাবু বা সমস্ত 'অরগান'টার সঙ্গে আমার যোগাযোগ চলতে থাকল। আমাকে কি করতে হবে, ওদের গভর্ণমেন্টের তমলুকের সংবাদ, কি করে ওরা কাজ করছে, কি ওরা করতে চাইছে, কোথা পুলিশ পাঠাবে, কে কে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, সেসব ওদেরকে জানাতে হত। এসব নানা প্রকারের গোপন তথ্য ওদিগকে (জাতীয় সরকারকে)

পাঠাতে হত। এবং তমলুক থানাতে আমাকে (দিনে) দুবার করে হাজিরা দিতে হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে ঐ রকম করে চলতে হোত।

প্রশ্ন — সুশীলবাবু একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আর আপনি ওকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা একটু বলবেন ?

উত্তর — হ্যাঁ, সুশীল গ্রেপ্তার হওয়ার পর অজয় (মুখার্জী) আমাকে চিঠি লিখে পাঠাল যে দেখ সুশীল তো গ্রেপ্তার হয়েছে, কিন্তু সুশীল যদি চলে যায় তাহলে আমাদের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। হয়তো বিদ্যুৎবাহিনী কলাপস হয়ে যাবে। কাজেই একে জেল থেকে ছাড়ানর তুমি কি উপায় বল। তখন অজয়কে আমি চিঠি লিখে পাঠাল(া)ম এক উপায় হচ্ছে দড়ি আর আংঠার সাহায্যে জেল থেকে পালিয়ে আসা, আর তা না হলে এক সুশীলকে বের করে নিয়ে সুশীলের নামে অন্য সুশীল ঢুকিয়ে দেওয়া, আর লাস্ট পন্থা হল বেল নিয়ে বেরিয়ে আসা আর না যাওয়া এবং বেলের টাকাটা মুক্তারদিকে (মোক্তার) দিয়ে দিতে হবে। সুশীল তখন তমলুক সাব জেলে। সুশীলের বাহ্যের (পায়খানার) সাথে কিছু পাঁঠার রক্ত মিশিয়ে দেওয়া হল। ডাক্তার তখন সার্টিফিকেট দিল যে ওর গ্যাসটিক আলসার। এখানে তো বেল রিজেক্ট করল। রিজেক্ট হলে তখন মেদিনীপুরে অ্যাপিল করা হল। পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে দেখা করলাম। কিছু টাকা দেওয়া হল তিনি যেন ওটাতে আপত্তি না করেন। যথাসময়ে তিনি আপত্তি করলেন না। বেলও হয়ে গেল এবং তাড়াতাড়ি সুশীলকে সাব-জেল থেকে বের করে নেওয়া হল। সুশীলের বেল হবার বোধ হয় আধ ঘন্টা পরেই মেদিনীপুর থাকতে পুলিশকে ডি. এম. অর্ডার দিয়েছে যে সুশীলকে যেন না ছাড়া হয়। সুশীল তখন এখানের (জেল) থেকে বেরিয়ে পালিয়ে এ্যাবসকন্ড করেছে।

প্রশ্ন — উনি তো এ্যাবসকন্ড করলেন কিন্তু আপনি বেলে কেন থাকলেন? লুকিয়ে থাকলেন না কেন?

উত্তর — বেলে থাকলাম (কারণ) বর্হিজগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রাখতে হবে। লুকিয়ে থাকতে গেলে যোগাযোগ রাখা যাবে না। তখন আমার কাজটা চলত দু প্রকারে। এক প্রকার হচ্ছে, রিলিফ কমিটি বলে একটা রিলিফ কমিটি স্থাপন করা হয়েছিল কংগ্রেস কর্মীরা মিলে। সেই মহেন্দ্র রিলিফ কমিটির মারফতে রিলিফ করা হোত। মেডিকেল রিলিফ করা হোত। কলকাতা থেকে আমরা কিছু কুইনাইন আনতাম। ওষুধপত্র আনতাম। জায়গায় জায়গায় ডাক্তারখানা খুলেছিলাম। সে সব জায়গায় ওষুধপত্র পাঠাতে হত। সাগু, বার্লি, বিসকিট, মিছরি এসব জায়গায় দিতে হ'ত। এইটা ছিল বাইরের কাজ। আর ভেতরের কাজ ছিল কে কে লোক এস.ডি.ও.-র সঙ্গে দেখা করল, কে কে লোক (এখানকার পুলিশ অফিসার)-এর সঙ্গে দেখা করল, এবং তার সঙ্গে কি কথা হল কি প্রকারে তারা ওয়ার্ক করবে, ঐ সব গোপন সংবাদ ওখান থেকে বের করতাম। সুশীল এবং অজয়বাবুকে সেসব

সংবাদ আমি পাঠাতাম। কাজেই দু-প্রকারে — বাইরে এবং ভেতরেতে আমাকে খেলা খেলতে হ'ত।

প্রশ্ন — ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা আমাদের হ'ল আর তারপর অটোমেটিক্যালি ছাড়া পেয়ে গেলেন?

উত্তর — আমরা অটোমেটিক্যালি ছাড়া পেয়ে গেলাম। গান্ধীজি বললেন (১৯৪৪) তোমরা মুভমেন্ট উইথহোল্ড করে নাও, তুলে নাও। তখন আমাদের বিদ্যুৎবাহিনীর বা অন্যান্য যেসব কর্মীরা ছিল সকলে মিলে মুভমেন্ট তুলে নেওয়া হল। সকলে বেরিয়ে পড়ল এবং গভর্ণমেন্টের কাছে সারেণ্ডার করল। গভর্ণমেন্ট সুশীল ও অন্যান্য ওয়ার্কারদের গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তার করে ৭ বছর ৮ বছর করে জেলে পুরল। ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত তারা তো সবাই জেলে ছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর তারা জেল থেকে মুক্তি পেল।

প্রশ্ন — কিন্তু আপনি বেলে ছিলেন তারপর আর আপনাকে জেলে যেতে হয়নি?

উত্তর — তখন যেতে হয় নি। কারণ, তখন কতকটা গভর্ণমেন্টের সাথে কো-অপারেশন করে চলতে হচ্ছে। ওদের বলছি যে আমরা রিলিফ করছি। আমরা মেডিকেল রিলিফ দিচ্ছি। আমি দেখাতাম যে আমি যেন গভর্ণমেন্টের কতই না ভক্ত। এবং গভর্ণমেন্টের যে কাজগুলো করা উচিত ছিল সেইগুলোই আমি করতাম। মাঝে মাঝে এস.ডি.ও-র অন্যান্য বড় বড় অফিসারের সঙ্গে দেখা করতাম। এরকম ভাবেই চলতে হোত।

প্রশ্ন — আচ্ছা রমেশবাবু আপনি যখন জেলে ছিলেন ওখানে কি ধরণের ব্যবহার পেতেন যদি একটু বলেন।

উত্তর — ব্রিটিশের জেলে ছিলাম মানে কোন রকম বেঁচে থাকবার জন্য। যতটুকু থাকা দরকার ততটুকুও তারা দিত না। খাবারের ব্যবস্থা যা ছিল অত্যন্ত জঘন্য ধরণের। তারপরে রাত্রিতে মশার উৎপাতে ঘুমাবার একেবারেই উপায় নেই। তা সত্বেও মশারি নেই। তারপরে স্লেভারী মানে ক্রীতদাসের মত। প্রথমে হয়েছিল ৬ মাস (জেল)। কিন্তু ৬ মাস তো রাখল না। দিন পনের পর ছেড়ে দিল। তারপর হল ৯ মাস। ৯ মাস থাকলাম। তারপর হল আবার ৬ মাস। ৬ মাস থাকলাম। তারপর হল আবার ৯ মাস। আবার থাকলাম। তারপর আবার কিছুদিন হাজতে টাজতে রেখে দিল। তারপর প্রহ্লাদ (প্রামানিক) কেস চালাতে বাইরে চলে এলাম। বাইরে চলে এসে তমলুকে তখন থাকলাম। বাইরে থাকলাম ওদের সুপারভিশনে টাউন বেল্‌-এ।

প্রশ্ন — আচ্ছা আচ্ছা। মানে আপনি ঐভাবেই দলের কাজটা করতেন। যাইহোক এইভাবেই একদিন দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হ'ল?

উত্তর — হ্যাঁ।

প্রশ্ন — সেদিন আপনার কিরকম অনুভূতি হয়েছিল? যেদিন ভারত স্বাধীন হল? এটা তো আপনাদের স্বপ্ন ছিল?

উত্তর — হ্যাঁ।

প্রশ্ন — আপনার সেদিনটা কেমন লেগেছিল?

উত্তর — হা-হা (হাসি)। সেদিন (ভালো) লেগেছিল। তখন হচ্ছে গিয়া আমি তো আবার নতুন করে কংগ্রেস কমিটির মানে জাতীয় সরকার যখন বন্ধ হয়ে গেল জাতীয় সরকার যখন উইথহোল্ড হয়ে গেল, তখন আমি তো কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি। আমি বড় বড় হরফে সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলাম আজ রাত্রি ১২ টা হইতে আমরা স্বাধীন। তোমরা স্বাধীন, সর্বভারত স্বাধীন। এই বলে কি আনন্দ তখন।

প্রশ্ন — সারা ভারতে যে আন্দোলন তাতে তমলুকে বিরাট ঝড় উঠেছিল বলুন?

উত্তর — সারা ভারতবর্ষের এই আন্দোলনে তমলুকে বিরাট ঝড় উঠেছিল। তার মানে তমলুকের অর্গানাইজেশনটা খুব ভালো ছিল। এবং তমলুকের ওয়ার্কাররাও খুব ভালো ছিল এবং তমলুকের পিপ্‌লরাও, নট ওনলি তমলুক, ধরতে গেলে সারা মেদিনীপুর জেলার লোক খুব স্বাধীনতাকামী। তা নাহলে পরে মেদিনীপুরে এতগুলো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা ওয়ান আফটার এ্যানাদার মরল কি করে ? কন্টাইতেও কম হয় না। কাজেই সারা মিডনাপুর ডিস্ট্রিক্ট স্বাধীন হওয়ার জন্য যথেষ্ট সংগ্রাম করেছেন।

প্রশ্ন — আচ্ছা ঠিক আছে। বড়ই ভালো লাগল আপনাদের সঙ্গে কথা বলে। আজকে তাহলে চলি কেমন?

উত্তর — আচ্ছা আসুন।

মহাসপ্তমীর মহাপ্রলয়ের সেই দিন

সূর্য সেদিন ঘুম ভেঙ্গে ওঠবার অবকাশই পায়নি। ষষ্ঠীর ভোর কেটে মহাসপ্তমীর দিন, শুক্রবার। ১৬ই অক্টোবর, ১৯৪২। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। ফিনফিনে শীতেবাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছিল সারা শরীর। সকালের বিছানায় চায়ের পেয়ালায় তমলুকের মহকুমা শাসক আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে টেলিগ্রাফ মারফৎ সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে (তমলুক এবং কাঁথি মহকুমায়) ঐদিনই ভারী বৃষ্টি সহ ভয়ঙ্কর সমুদ্র ঝড় আছড়ে পড়ার আগাম খবর পেলেন। বিদ্রোহী কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বললেন মহকুমা শাসক ইচ্ছাকৃতভাবেই বিপদ সঙ্কেত প্রচার করলেন না। তিনি নিজে অবশ্য অস্বীকার করে বললেন গত ২৯ শে সেপ্টেম্বর জেলায় বিশেষ করে তমলুক-কাঁথি মহকুমায় কংগ্রেসের থানা দখলের অভিযানের বিপ্লবীরা যে টেলিগ্রাফের লাইন কেটে দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, তার মেরামতির কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় টেলিগ্রাফ লাইন অচল। তাই কোন থানাকে তিনি খবর দিতে পারেন নি।

তমলুক মহকুমা শাসকের সাফাই গাইবার কারণ অবশ্য অন্য। ত্রিশের দশক থেকেই মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে পারছিল না কিছুতেই মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩-এ পর পর তিন বছরে তিনজন জেলাশাসককে গুলি করে হত্যা করেছে বিপ্লবীরা। সারা জেলাতেই প্রশাসনকে জেরবার করে দিচ্ছে ওরা। প্রশাসনও মরিয়া।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন তখন শুরু হয়নি। ১৯৪২-এর গোড়ায় সরকার বঞ্চনা নীতি প্রয়োগ করে তমলুক মহকুমা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় জাপানী আক্রমনের ভয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দিয়ে মহকুমা থেকে সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ করে দিল। দু-একটা যা থাকল সেগুলিকে কম পেট্রোলিয়াম দেওয়া হল। সরকারের বঞ্চনা নীতির (Denial Policy) সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মেদিনীপুরের জেলা শাসক ১৯৪২-এর ৮ই এপ্রিলের এক আদেশে সমুদ্র উপকূল এলাকার দুটো মহকুমা তমলুক এবং কাঁথির যানবাহন চলাচলের উপর কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী-ফৌজ উপকূল এলাকা দিয়ে ঢুকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে পারে, এটা ভেবে নিয়েই ঐ আদেশে এলাকার সমস্ত নৌকা, মোটরযান, সাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হল। বহু সংখ্যক নৌকা ৩ ঘন্টার মধ্যে সরকারের হাতে সমর্পণের আদেশ দেওয়া হল এবং স্থানীয় সরকারি কর্মচারীরা কয়েকশত নৌকা ভেঙে নষ্ট করে দিল। সরকারী সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি কার্যকরীও করতে পারল না স্থানীয় প্রশাসন। ফলে শয়ে শয়ে নৌকা পুড়িয়ে দিয়ে হাজার হাজার টাকার সম্পদ নষ্ট করা হ'ল। আখেরে সরকারের কোন লাভ তো হলই না বরং নৌকাগুলি চালিয়ে যারা জীবন-ধারণ করত ঐগুলির অভাবে তাদের দুঃখ কষ্টের শেষ থাকল না ।

বাংলা সরকারের মন্ত্রী সন্তোষ কুমার বসু সরকারী নীতির পক্ষে সওয়াল করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বললেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ এলেও তা খুবই নগন্য। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এলই না কিছু। সাইকেল বাজেয়াপ্ত করার ক্ষতিপূরণের নমুনা থেকে বোঝা যায় কত কম ছিল সেই টাকা। নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল ও ময়না থানার সমূহ সাইকেল এবং তমলুক ও পাঁশকুড়া থানার আংশিক সাইকেল যে সমস্ত নষ্ট করা হয়েছিল তার শতকরা ২৫ ভাগের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ধার্য হল ৮ আনা থেকে ৫ টাকা, ৫০ ভাগের জন্য ধার্য হল ৫টা থেকে ১০ টাকা। আবার দাম এত কম বলে, অনেকে নিতে প্রত্যাখ্যান করল। সরকারী কাজকর্মের গতিবিধি দেখে দেশ এক অজানা আশঙ্কায় ভরে যাওয়ার সম্ভাবনায় নিজেদের আত্মরক্ষার প্রস্তুতিতে মহিষাদল ও সুতাহাটা থানা এগিয়ে এল সবার আগে। সুরক্ষা বাহিনীর গড়ার প্রয়োজনের তাগিদে, স্বাধীনতাকামী মানুষেরা গড়ে তুললেন 'বিদ্যুৎবাহিনী' ও 'ভগিনীবাহিনী'। মাসখানেকের মধ্যেই এর সদস্যসংখ্যা হল ৩০০০, অচিরেই এই সংখ্যা পৌঁছলো ৫০০০-এ, ৫০ জন মহিলা সমেত।

সেই সঙ্গে জেলার লোকজনকে ভাতে মারার জন্য রণাঙ্গনে খাদ্যশস্য পাঠাবার নাম করে ধান-চাল এই দুটি মহকুমা থেকে নিজেদের এজেন্ট ইস্পাহানি কোম্পানি সমেত অন্যান্য কোম্পানি মারফৎ পাচার করতে লাগল কলকাতায়। কারণ হিসেবে বলা হল মেদিনীপুরের এবার প্রচুর আউস ধান হয়েছে এবং এখানকার লোকদের খাওয়া-দাওয়ার পরেও প্রচুর উদ্বৃত্ত হবে। খেয়ে পরে মানুষজন যাতে বেঁচেবর্তে থাকতে পারে তারজন্য ১৯৪১-এ এই জেলায় খাদ্যোৎপাদনে ঘাটতি থাকায় রপ্তানী বন্ধ করে আমদানী করার জন্য কংগ্রেসের পরামর্শ বাতিল করল সরকারী প্রশাসন। সেই সঙ্গে মানুষের মনে ভয় ধরানর জন্য ধান চালানে উৎসাহ দিল চালকল মালিকদের। দাঁড়িয়ে থেকে চালানদারদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ১৯৪২-এর ৮ই সেপ্টেম্বর পুলিস অফিসার সুধীর কুমার সরকার তমলুকের কাছে রূপনারায়ন নদের ধারে দনীপুরে দলবল নিয়ে নিজেই উপস্থিত। কয়েক হাজার বুভুক্ষ মানুষের পায়ে পায়ে মিছিল আটকে দিল ব্রিটিশের এজেন্টের চালপাচারের নৌকা। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ঘটনা ঘটবার সময় কংগ্রেসের কোন ভলান্টিয়ার উপস্থিত ছিল না। প্রতিরোধ গড়ে উঠল পুলিশের এই ধরনের কাজের প্রতিবাদ জানাতে গ্রাম্য মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততায়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সিক্রেট রিপোর্ট বলছে, 'তমলুক মহকুমার ঐ গ্রামে ৫০০০ কৃষিজীবি মানুষের (অধিকাংশই হিন্দু মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত) জমায়েত চাল বোঝাই নৌকা লুঠ করবার পর একটি চালের কল লুঠ করতে উদ্যত হয়ে পুলিশকে অক্রমণ করল। পুলিশ বাধ্য হয়েই জনতার উপর গুলি চালাল।' রাসবিহারী মিশ্র, গুরুচরণ অধিকারী, বেনু মহাপাত্র, ধীরেন জানা প্রমুখের নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষদের এই গণজাগরণের দুর্ভেদ্য মিছিলে দুমদুম করে গুলি করে পুলিশ মেরে দিল বাড়অমৃতবেড়িয়ার সুরেন্দ্রনাথ কর (৪৫) শশীভূষণ মান্না (১৮) আর টিকারামপুরের ধীরেন্দ্রনাথ দীগর (৪৩) কে। তখন জনতা খবর দিল ৮ মাইল দূরের কংগ্রেস অফিসে। ৪০ জন ভলান্টিয়ার এবং প্রায় ৬০০০

গ্রামবাসী চালকলের মিলে এল। ওদিকে তমলুক থানার থার্ড অফিসার অপূর্ব ঘোষ ৪০ জন সশস্ত্র সিপাই নিয়ে হাজির হলেন দনীপুরে। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা ধানপাচারে বাধা দিল এবং মৃতদেহগুলি ফেরৎ চাইল পুলিশের কাছ থেকে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পুলিশ ঐগুলি ভাসিয়ে দিল নদীর জলে। স্থানীয় লোকেরা মৃতদেহগুলি জল থেকে তুলে আনলেও পুলিশ ঐগুলি কেড়ে নিয়ে একই চিতায় দাহ করে দিল। পরের দিন জেলাশাসক আশপাশের ৬টা গ্রাম চ্যুঁড়ে প্রায় ২০০ জন নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরল এবং সারাদিন রোদে বসিয়ে রাখল, খেতে দিল না কিছুই। এদের মধ্যে থেকে ১৩ জনকে দেড় থেকে দুবছরের মেয়াদে জেলে ভরল। অবশ্য অবস্থার বেগতিক দেখে মিল মালিক জনতার দাবীর কাছে হার মেনে নতি স্বীকার করে ২০০০ টাকা জরিমানা দিতে স্বীকার করল। ঐ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা দেওয়া হল মৃতদের পরিবারবর্গদের। চালকল মালিক তার কৃতকর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করল এবং ভবিষ্যতে আর যাতে চাল অন্যত্র চলে না যায় তার প্রতিশ্রুতি দিল। কংগ্রেস দেশে যাদের উদ্বৃত্ত ধান মজুদ আছে তাদেরকে আহ্বান জানাল ন্যায্য দামে মানুষের কাছে বিক্রি করার এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিনা সুদে টাকা ধার দিয়ে।

মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের গোপন প্রচার পুস্তিকা 'বিপ্লবী' (৬২ সংখ্যা) ১৯৪২-এর ১১ই সেপ্টেম্বর আহ্বান জানিয়ে লিখল ঃ 'ইস্পাহানী কোম্পানীকে বা তার দালালকে কিংবা কাউকে একটি মুঠা ধান বিক্রি করবেন না, মুটে-গাড়োয়ান, দাঁড়ি মাঝি কেউ এসব বইবেন না, যদি লাঠি চালায়, গুলি চালায় প্রাণ দেবেন — তবু ধান দেবেন না।' এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই প্রথমে জেলা এবং পরে মহকুমা কংগ্রেসে ঠিক হয় তমলুক এবং কাঁথি মহকুমায় ২৯শে সেপ্টেম্বর একসাথে আক্রমণ চালিয়ে সরকারী অফিস দখলের অভিযান চালানো হবে। তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত নিল যে, 'ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে ২৯শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ সরকারের সব কিছু ধুয়ে মুছে দেওয়া হবে। তাতে যে জাতীয় হিংসা হবে বা অহিংসা থেকে বিচ্যুত হতে হবে তাকে গ্রাহ্য করা হবে না।' কথা যা কাজ তা। ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টা থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর ভোর ৪টার মধ্যে পরিকল্পনামত রাস্তা কেটে, বড় বড় গাছ ফেলে পথ অবরোধ করে, পুল উড়িয়ে এবং টেলিগ্রাফ পোষ্ট-এর তার কেটে দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল সহজেই। কিছু তাজা প্রাণের বিনিময়ে সরকারী অফিস অভিযান সফল হল। সে ইতিহাস আমাদের জানা। ইংরেজ প্রশাসনও খুব মরীয়া হয়ে উঠল। লড়াই শুরু হল।

থানা দখল অভিযানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল রক্তে রাঙা বিয়াল্লিশের সেপ্টেম্বর। দুটি মহকুমার কংগ্রেস যখন ব্রিটিশের পাল কেড়ে নিচ্ছে, ১৬ই অক্টোবর প্রকৃতির রুদ্ররোষ যোগ দিল ব্রিটিশের সঙ্গে। তাই ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২-এ দনীপুরে গুলি করে অকথ্যভাবে মানুষদের মেরে দেওয়া কিংবা ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের থানা দখলের অভিযানের গণমিছিলের নেতৃ মাতঙ্গিনী হাজরার বুকে গুলি বসিয়ে হত্যা

করে আত্মতৃপ্তি পেলেও হত্যার দায়ভার কিছুটা থেকেই যায় প্রশাসনের। তাই এমন অযাচিত প্রাকৃতিক সাহায্যকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করা লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীকে নিঃশব্দে হত্যা করার অপূর্ব সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করল জেলা প্রশাসন।

মহাসপ্তমীর দিন সকাল থেকে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি আর সামুদ্রিক-ঝড়। গ্রাস করল মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূল অঞ্চল (তমলুক-কাঁথি মহকুমা) এবং সংলগ্ন ওড়িশার কিছু এলাকা। সারাদিনের বৃষ্টি-ঝড়ের দ্বৈত তান্ডবে উপকূল অঞ্চলের কাঁচা বাড়িগুলিকে গুড়িয়ে দিল। সমুদ্র উপকূল প্রতিরোধকারী বাঁধ তখনও নিজের সংযম এবং সম্ভ্রম ধরে রেখেছিল। রাত্রির শুরুতে আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি। সেই সঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যা ভয়ালরূপ ধারণ করে যোগ দিল বৃষ্টির সঙ্গে। দুই-য়ের মিলিত তান্ডবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সমুদ্রতরঙ্গ। প্রায় ১৬ ফুট উচ্চতায় সমুদ্রতরঙ্গ তার কুটিলরূপ নিয়ে আছড়ে পড়ল সমুদ্র সুরক্ষা বাঁধ-এর উপর। হার না মানা সমুদ্র সুরক্ষা বাঁধ অবশেষে হার মানল। মুষলধারায় বৃষ্টি এবং সমুদ্রতরঙ্গায়িত জলোচ্ছ্বাস বন্যা ঘটিয়ে ঢুকে পড়ল সমুদ্রতীরবর্তী ১৫০ স্কোয়ার মাইল এলাকা জুড়ে থাকা গ্রামগুলিতে। সারাদিনের বৃষ্টি আর ঝড়ের এই এলাকার মাটির ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় তার তলায় ঢাকা পড়ে যাওয়া মানুষজনকে উদ্ধারের কাজে লেগেছিল আর একদল মানুষ, তারাও ভেসে গেল বন্যার তোড়ে। শুধু বেঁচে গেল কিছু শক্ত সামর্থ্য যুবক, যারা শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়তে পেরেছিল নতুবা জলে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ কোন গাছের ডাল ধরে লাফিয়ে গাছে উঠতে পেরেছিল, কিংবা জলে ভেসে আসা কিছু ধরতাই-এর উপর চড়ে বসেছিল।

উপকূল ছাড়িয়ে লাগোয়া এলাকায় ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় এবং একনাগাড়ে বৃষ্টি আর বন্যার প্লাবনে ঘরবাড়ি বসবাসের জায়গায় সম্পদ নষ্ট হয়েছে ৯৫ শতাংশ। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গো-মহিষ-ছাগলাদি। কদাচিৎ এক-আধটি গাছ জীবিত থেকেছে। পুরো আবাদ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটু কম ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় আবাদ নষ্ট হয়েছে ৭০-৮০ শতাংশ। পুকুর ডোবা নষ্ট হয়ে গেল সমুদ্রের লোনা জল ঢুকে আর বালিতে বুজে। কাঁথি আর তমলুক মিলিয়ে ৭৮৬টি গ্রাম পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। পানীয় জলের ৮৫০০ পুকুর নুনজল, মানুষের মৃতদেহ এবং জানোয়ারের মৃত শরীর গ্রহণ করে পরিবেশজাত দূষণে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। ১০ শতাংশ বা ১,৮৮,০০০টি হাল-লাঙলের গরু আর দুধেলা গরুবাছুর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যে কটা দুধেলা গরু টিকে থাকল সেগুলি পুলিশ টেনে নিয়ে গেল নিজেদের আর মিলিটারি সৈন্যদের দুধ খাওয়ানর জন্য।

অধ্যাপক পল গ্রীনাও (১৯৮৩) এক সমীক্ষায় জানিয়েছেন তমলুক্‌ কাঁথি সহ পড়শী জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ধরলে বৃহত্তর এলাকায় ৩৩০০ স্কোয়ার মাইল এলাকায় ৭৪০০টি গ্রাম পুরোপুরি বা অংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই এলাকার মধ্যে বন্যা কবলিত এলাকায় ৯০০ স্কোয়ার মাইলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১৬০০টি গ্রাম। ধ্বংস হয়েছে ৫,২৭,০০০ বাড়ি এবং ১৯০০ স্কুল। তমলুক এবং কাঁথি মহকুমায় মৃতের সংখ্যা

৪০,০০০-এর কম নয়। শস্য-ফসল নষ্ট হল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার। ৩৬ ঘন্টারও কম সময়ের ঝড়ে আশ্রয়হীন খাদ্যহীন হয়ে পড়লেন বাংলার ২.৫ মিলিয়ন মানুষ।

একবছর পরের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৬ অক্টোবরের ঝড়-বন্যায় 'তমলুক মহকুমায় ৩৮৩৭ জনের মৃত্যু ঘটে এবং ১০৭২ জন অল্প বিস্তর আহত হল। ৬৮,১৯৩টি গবাদি পশু ভেসে যায় বা মারা যায়। ১,১০,৩৪৬টি গৃহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং ৭৬,৯৫৯টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। লোকাল বোর্ড এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সমস্ত রাস্তা এবং ১০০ মাইল নদী বাঁধ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বহু সংখ্যক সাঁকো এবং কয়েকটি স্লুইশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হোরমিলার কোম্পানীর দুটি স্টীমার, কয়েকটি লঞ্চ এবং বহু সংখ্যক নৌকা ডুবে যায়। ২,২১, ৫১১ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হয়ে যায়।' (তমলুক সাব-ডিভিশনাল অফিসারের মেমো নং ৬৩৬৩ আর, তারিখ ৩০.৯.৪৩ থেকে বাংলা অনুবাদ 'বিপ্লবী' পত্রিকার ২৬ পৃষ্ঠায়, তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি, ১৯৯১)।

হঠাৎ এই দৈবদুর্বিপাকের সরকারী ভূমিকা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটল তার কোন প্রতিফলন সরকারের কৃপায় সংবাদপত্র প্রচার করতে পারল না। কাগজগুলোর উপর রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে জোর করে নির্দেশ দেওয়া হল মেদিনীপুর নিয়ে কোন খবর প্রকাশ না করবার জন্য। ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুল প্রয়োগ করা হল। একটু আধটু খবর ছাপার জন্য যুগান্তর পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল। অন্যান্য জেলার খবর ছাপা হলেও মেদিনীপুর সংক্রান্ত কোন খবর ছাপতে দেওয়া হয়নি। আনন্দবাজার পত্রিকা শুধু মন্তব্য করেছিল যে অন্যান্য জেলার কিছু খবর বেরিয়েছে 'কিন্তু মেদিনীপুর থেকে আমরা অনেক ভয়াবহ খবর পেয়েছি'। সঙ্গে সঙ্গে রে রে করে উঠল রাইটার্স বিল্ডিংস-এর স্বরাষ্ট্র দপ্তর। আনন্দবাজারকে সতর্ক করে দিয়ে বলল ভবিষ্যতে যেন মেদিনীপুর সংক্রান্ত কোন খবর প্রকাশ করা না হয়। পরবর্তীকালে মহিষাদলে গান্ধীজির আগমনে সেদিনের কথা মনে করে ১৯৪৬-এর ৩রা জানুয়ারী আনন্দবাজার মন্তব্য করল : 'মেদিনীপুরের উপর দমন নীতি যখন প্রচণ্ড বেগে চলিতেছিল তৎকালে সরকারি নিষেধবিধির লৌহ বেষ্টনীর দ্বারা মেদিনীপুর অবরুদ্ধ। কিন্তু সেই লৌহ বেষ্টনী ভেদ করিয়াও সরকারি নিষ্পেষণ যন্ত্রের ঘর্ঘর ধ্বনি আমাদের কানে আসিয়াছে।' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৩-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী আইন সভায় দাঁড়িয়ে বললেন : "There was deliberate suppression of news with regard to the cyclone until the Ministers had visited Midnapore" (on 4th November, 1942).

ঘটনার দেড় সপ্তাহ পরে মহিষাদলের রাজার খবর পেয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ২৯ শে অক্টোবর তমলুক এবং কাঁথি মহকুমার ত্রাণকার্যে সহায়তা করতে এসেছিলেন। ঐ বছর 'ভারতবর্ষ-র (পৌষ : ১৩৪৯) ৩০ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যায় তিনি যে বিবরণ রেখে গেছেন তার থেকে একটু উদ্বৃতি দেওয়া যাক :

'প্রায় দেড় সপ্তাহ পর এই দুর্যোগের কথা সর্বপ্রথম আমাদের কর্ণগোচর হয়। ... ঝটিকার বিস্তৃত সংবাদ তখনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই।

'গত ২৯ অক্টোবর, (১৯৪২) স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ ও আরো দুই একজনকে সঙ্গে করিয়া নদীপথে মেদিনীপুর রওনা হইলাম। ... রূপনারায়ণ নদীতে (নদে) শত শত নরনারী শিশু ও গবাদি পশুর বিকৃত মৃতদেহ নদীর প্রচণ্ড স্রোতে অবিরাম ভাসিয়া চলিয়াছে — কোন মহাসমুদ্রের উদ্দেশ্যে কে জানে।'

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ত্রাণকার্য তদারকি করার জন্য এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে গিয়ে যে মর্মান্তিক দৃশ্যের বিবরণ তিনি রেখে গেছেন তা ভেবে দেখবার মত ঃ

'গভীর রাত্রি — চারিদিক নিঝুম, ঝিল্লীরব-নিস্তব্ধ; ভেককণ্ঠের উৎকট চিৎকার মন্দীভূত; শিবাকুল মৌন। আমরা মহাশ্মশানের সহিত শিবাকুলের কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু যেখানে শৃগালের আনন্দ কোলাহলও বিরল — তেমন শ্মশান কে কবে কল্পনা করিয়াছে? মেদিনীপুরে উহাই এইবার প্রত্যক্ষ করিলাম।'

২৩শে অক্টোবর, অথবা ২/১ দিন এদিক ওদিক হবে, কাঁথির মহকুমা শাসক এক গোপন সার্কুলার দিয়ে ত্রাণ বিভাগের কর্মী অফিসারদের নির্দেশ দিলেন স্থানীয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের নির্দেশমতই ত্রাণবন্টন করা হবে। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে বাইরে থেকে আসা সরকারী বা বেসরকারী ত্রাণসামগ্রীর বন্টন করতে দেওয়া হবে না। মেদিনীপুরের জেলাশাসকও বাংলা সরকারের কাছে গোপন বার্তায় জানিয়ে দিলেন দুর্গতদের একমাস কোন সরকারী বা বেসরকারী ত্রাণ সামগ্রী না দিয়ে তাদের স্থায়ীভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। কারণ, তার মতে 'ডিস্ট্রিক্ট ইজ দ্য অ্যাবোডি অফ্ রেবেলস।' দুর্গত এলাকায় যখন ত্রাণ সামগ্রীর আশু প্রয়োজন, তখন তিনি সেখানে কারফিউ জারি করে, যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি করে ত্রাণকার্যে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন আক্ষরিকভাবে। আর্তের আবেদনে সাড়া দিয়ে জেলাশাসকের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসা মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির সদস্যরা ভারতরক্ষা আইন বলে আটক হলেন। যারা কুঁড়ে ঘরের চালায় বসে সময় কাটাচ্ছিলেন বিপন্মুক্তির আশায়, উদ্ধারের জন্য নৌকা চেয়ে বঞ্চিত হলেন। যারা নৌকা চালাচ্ছিলেন তাদেরকে ভয় দেখান হল। এমনকি ত্রাণের দায়িত্বে থাকা একজন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট দিনের বেলায় যে সমস্ত লোকেদের ত্রাণ সামগ্রীর বিলি করবেন, রাত্রিতে পুলিশ আর মিলিটারি নিয়ে তাদেরই ঘরবাড়ি তল্লাসী করে অত্যাচার চালানোর নির্দেশে অসঙ্গতি দেখে কাঁথির মহকুমা শাসককে ব্যাখ্যা চাইলে তিনি উত্তর দিলেন, 'You should do both the things, the distribution of relief in the day time is not inconsistant with raids at night.' ফলে ঝড়-বৃষ্টির প্রলয়ের আগে লোকের বাড়ি-ঘরদোর জ্বালিয়ে লুঠতরাজ করে মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করা এবং স্ত্রীলোকদের উপর ধর্ষণ করে পুরুষদের ভীত করে বিপ্লবী জীবন ত্যাগ করানর চেষ্টা

পুরোপুরি চলতে থাকল ভয়াবহ ঘটনার পরেও। তাই দেখি পটাশপুর থানার বহুসংখ্যক (প্রায় ৬৫ জন) ধর্ষিতা মহিলারা একযোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী তাদের শুদ্ধিকরণের জন্য।

এতবড় দুর্ঘটনার প্রথম সরকারী খবর বেরুল ১৯৪২-এর ৩রা নভেম্বর। মানবতার এহেন অবমাননায় এবং অনাচারের প্রতিবাদে বাংলার অর্থমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ক্ষোভের সঙ্গে মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করলেন ১৬ই নভেম্বর। পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য পরের দিন ১৭ই নভেম্বর বাধ্য হয়েই বাংলার গভর্ণর স্যার জন হারবার্ট আকাশবানীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে কয়েকদিন আগে জেলায় পরিদর্শনের ফলে নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করার পর আবেদন জানিয়ে বললেন, "Every men and women of good will irrespective of races, politics or religion to join Government in this good work; and they may rest assured that Government will assist and co-ordinate their charitable efforts in everyway." আবেদনে বেসরকারি ত্রাণসংস্থা বড়ভূমিকা নিলেও সরকারি ব্যবস্থার হার্দ্যতা তখনও জেগে ওঠেনি। সরকারি বেসরকারি ত্রাণ ব্যবস্থার শিথিলতাতেও ত্রাণের কাজে বিশেষ করে তমলুক মহকুমার বন্যার পর পরই অগ্রণী এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তমলুকের 'মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি।' সম্প্রতি প্রকাশিত 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' বইতে (২০০০ ঃ পৃঃ ২২৮) লেখক এবং তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের একজন সক্রিয় সদস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাড়ী মহেন্দ্র রিলিফ কমিটির ভূমিকা সম্বন্ধে লিখলেন ঃ

> 'আন্দোলনের শেষভাগে অনঙ্গমোহন দাস, প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মী জেল থেকে বেরিয়ে এসে 'মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি' নামে একটি রিলিফ কমিটি গঠন করেছিলেন। তাঁদের সংগৃহীত দ্রব্যাদিও জাতীয় সরকারের মারফৎ এবং প্রধানতঃ জাতীয় সরকারের স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে বিলিবন্দোবস্ত করা হ'ত। কিন্তু করাল দুর্ভিক্ষের ঐ সর্বগ্রাসী প্রয়োজনের তুলনায় তা এতই অপ্রতুল যে তাকে জাতীয় সরকারের নিরূপায় কর্মীদের শুভেচ্ছার নিদর্শন বলেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।'

মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠন হয় ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর। কলকাতা থেকে আসা বাইরের বেসরকারি রিলিফ সোসাইটির সদস্যারা জেলে বন্দী। স্থানীয় প্রশাসন বাইরে থেকে আসা সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ বন্টনে বাধা দিয়েছেন। তবে ভয়াবহ ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে সরকারি স্থানীয় প্রশাসন কিছু রিলিফের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন ২৩শে অক্টোবরের দিকে। এই সরকারি উদ্যোগের বহু আগে এবং ঘুর্ণিবাত্যা ও বন্যার পরপরই 'মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি' ত্রাণকার্যে নেমে পড়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সুতরাং জাতীয় সরকার স্থাপনের আগেই 'মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি' ত্রাণের

কাজ করেছেন। 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' বইতে ঐ ত্রাণ কমিটির ভূমিকাকে লঘু করে দেখান হলেও জাতীয় সরকারেরই প্রথম সর্বাধিনায়ক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সামন্ত মহাশয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজি মহিষাদলে এলে মহাপ্রলয়ের ঘটনার এবং ত্রাণকার্যের বিবরণী দিতে গান্ধীজিকে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা একটু স্মরণ করলে বোধ হয় মহেন্দ্র রিলিফ কমিটির কাজের ধারা এবং গভীরতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাবে। তিনি বলেছিলেন (অমৃতবাজার পত্রিকা : ২৮.১২. ১৯৪৫) :

> "The Mahendra Relief Committee was the only local non-official committee named after Late Mahendra Nath Maity of Tamluk, a prominant congress leader of the district. It opened six dolls centres, six cheap centres, fifteen medical relief centres of which twelve are still running, four free milk kitchens and twelve seed distributing centres; it further had four paddy husking centres, one ghani oil pressing centre and eight khadi centres. It distributed cloth, rice, blankets, medicines of a total value of Rs. 1,58,000/-.
>
> "Referring to government relief the report says that government relief centres came in later and run by most cases to serve the people."

যাইহোক মহাপ্রলয়ের দিনের বৃষ্টি, সমুদ্রঝড় আর তরঙ্গ যেমনভাবে আছড়ে পড়েছিল সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে, ঠিক তেমনইভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারি ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ নলীনাক্ষ স্যান্যাল, বাবু আশুতোষ লাহিড়ি, শ্রী পি. ব্যানার্জী, বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, জে.সি. গুপ্ত, গোবিন্দ ভৌমিক প্রমুখ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যরা মিলিতভাবে আছড়ে পড়লেন বিধানসভায় ১৯৪৩-এর ১২ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী। ঐ দুই দিনের আইন সভার কার্যবিবরণীতে ওঁরা যে বক্তব্য রেখে গেছেন, সেখানে মহাপ্রলয়ের তান্ডবের সঙ্গে সরকারী প্রশাসনের ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মর্মন্তুদ আর্তনাদেরই প্রতিচ্ছবি। জেলার দুই মহকুমার তমলুক আর কাঁথিতে প্রশাসন ত্রাণকার্যে সহায়তা না করা ছাড়াও একইসাথে চালিয়েছিল বিনা কারণে সাধারণ মানুষকে অ্যারেষ্ট করা, পারিবারিক সম্পদ নষ্ট করে দেওয়া, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে লুঠপাট, নির্বিচারে গুলি করে হত্যা এবং মহিলাদের ওপর গণধর্ষণ। ব্যাপক গণধর্ষণ ঘটেছিল কাঁথি মহকুমার পটাশপুর থানায় এবং তমলুক মহকুমার মহিষাদল থানার ১১নং ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন মাশুড়িয়া, চক-গাজিপুর, চন্ডীপুর আর লক্ষ্যা গ্রামের অসংখ্য মা বোনেদের ওপর।

জেলা প্রশাসনের হাতে মানুষের দুর্দশা কোথায় পৌঁছেছিল তা আইনসভা সদস্য নলীনাক্ষ্য স্যান্যাল ডিসেম্বরে তমলুক-কাঁথি মহকুমা পরিদর্শন করে ফিরে এসে ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় মুলতুবী প্রস্তাব এনে দায়িত্ব নিয়েই বলেছিলেন :

"Sir, Midnapore has been drawing considerable public attention during the last few months and has already been very much in the minds of members of this house. This has been due to two reasons : one the great havoc created by the cyclone and typhon on the 16th and 17th October last, and the consequent sufferings of the people, and the other and no less important is the barbarity practiced there by the local agents of the Government, guardian of law and order."

বর্বরতার কয়েকটি নিদর্শন তিনি সভায় তুলে ধরেছিলেন ঃ

১) স্থানীয় প্রশাসন যানবাহন চলাচলে — অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ এনেছিলেন, এমন কি ঐ এলাকার জনপ্রতিনিধিদের রিলিফের কাজের জন্য ঢুকতে নিষেধ করেছিলেন।

২) কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সংস্রব না থাকা সত্ত্বেও স্কটিশচার্চ কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক এবং পার্ট টাইম অধ্যাপক বিষ্ণুহরি দত্তর কাঁথির বাড়ি লুঠ হল ১৩ই অক্টোবর এবং ২রা নভেম্বর। লুঠ হল মহাবীরু গ্রামের কেদার নাথ মাইতি এবং সাবিত্রিচক-এর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কালিপদ মাইতির বাড়ি।

৩) কাঁথির রামনগর থানার ১৬নং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট স্ত্রী, একমাত্র পুত্র সমেত পরিবারের মোট ২১ জন সদস্যকে হারিয়ে হৃদয়ে একটু শান্তির খোঁজে রিলিফের কাজে নিয়োজিত থেকে অন্যদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভার কর্মীদের পিছাবনী রিলিফ ক্যাম্প-এ ত্রাণের কাজে সহায়তা করার সময় রিলিফ অফিসারের সামনেই ভারতরক্ষা আইনের ৫৬ এবং ৩০ ধারায় ধৃত হয়ে গ্রেপ্তার হলেন।

৪) কাঁথির শহরের অদূরে দুর্গাপুর গ্রামের বাবু শশীভূষণ মাল ১৬ই অক্টোবর (শুক্রবার) রাত্রি থেকে পরের দিন ১৭ই অক্টোবর সকাল পর্যন্ত দুটি ভেসে আসা বাড়ির চালায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও বাঁচাতে পারেননি কাঁথি থানার ১০ নং ইউনিয়ন বোর্ডের কুমারপুর গ্রামের নিজের দুই জামাই-এর পরিবারের লোকজনদের। ডুবিয়ে রাখা লুকানো একটা নৌকা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে উদ্ধার করতে চাইলেন ওদের। মহকুমা শাসক নৌকা আটক করলেন নিজের কাজে। ওরা বললেন প্রয়োজনে নৌকা ফেরৎ দেবেন। নৌকার মাঝি জীবন মাইকাপ মহকুমা শাসকের পায়ে পড়ে গেলেন নৌকাটি নিয়ে লোকগুলিকে উদ্ধার করবেন বলে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দারোগাবাবুরও হৃদয় গলল। তিনি মহকুমা শাসককে বললেন যে নৌকাটি পরের দিন সকাল আটটার আগে লাগবে না। কিন্তু হৃদয় গলল না মহকুমা শাসকের। নৌকাটি অযথা ঘাটে বেঁধে রেখে পরের দিন বেলা ১টার সময় পাঠিয়ে দিলেন জুনপুট-এর দিকে। অসহায় বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তার কন্যা নলিনীসুন্দরী দিণ্ডা ও তার স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ দিণ্ডা ও তাদের ৬ বছরের ছেলে, আর সেই সঙ্গে অন্য জামাই বঙ্কিম বিহারী জানা এবং তার কন্যা অশ্রুকণা দেবী ও জামাই অমূল্যরতন মাইতি কিভাবে বন্যার জলে সাঁতার কাটতে কাটতে বাঁচবার চেষ্টা করেও তলিয়ে গেল গভীর জলে।

সভার অন্য সদস্য বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী সমগোত্রীয় মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন : 'সেটা কখন জানেন? রাত্রিতে নয়। অন্ধকারে নয়, বেলা ১২টার সময়। প্রকাশ্য দিবালোকে Contai- এর সাবডিভিশনাল অফিসার পরম নির্বিকারভাবে সেই হত্যার দৃশ্য দেখেছিলেন, উপভোগ করেছিলেন।'

আরও যা মর্মান্তিক, তার বিবরণ নলীনাক্ষ্য স্যান্যাল তাঁর নির্ধারিত সময়ের বক্তব্যের শেষে কোনো এক নিপীড়িত মানুষের ভাষায় সভায় বললেন :

> 'এতদিন পল্টনসহ পুলিশ ভলান্টিয়ার ধরিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমাদের গ্রাম সমূহে প্রবেশ করিয়া নিরীহ অধিবাসীদিগকে ভীষণভাবে প্রহার করিয়াছে। অনেকের অর্থ অলংকারাদি আত্মসাৎ করিয়াছে এবং কাহারও বন্যা প্লাবনবশিষ্ট আবশ্যকীয় দ্রব্য এমনকি খাদ্য-দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহারা এক্ষণে আমাদের মাতৃজাতির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সতীত্বে হস্তক্ষেপ করিয়া পীড়িত, অনশনক্লিষ্ট অত্যাচারিত অধিবাসীদের অন্তরে তুষানল জ্বালাইয়া দিয়াছে।'

সদস্য বাবু আশুতোষ লাহিড়ী মুলতুবি প্রস্তাবের পক্ষে সাওয়াল করতে গিয়ে বললেন যে, খাদ্যের অভাবে ছেলেমেয়েরা যখন মারা যাচ্ছে তখন 'আবার বেঁচেবর্তে থাকা দুধেলা গরুগুলো ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে মিলিটারির বাহিনীর দুধ খাওয়ানোর জন্য।'

এই নারকীয় ঘটনার বিবরণ ২৯শে অক্টোবর অন্যান্য সূত্রে পেয়ে অবস্থা খুবই খারাপ বুঝতে পেরে মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ নাথ ব্যানার্জী এবং ঢাকার নবাব বাহাদুর পরিস্থিতি সরজমিনে দেখতে তমলুক এবং কাঁথিতে এলেন। তাঁরা দেখলেন সাধারণ মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও সরকারি প্রশাসন ঐ এলাকায় কার্ফু বজায় রেখেছেন। মন্ত্রীরা ঘুরে এসে একটি রিপোর্ট পেশ করলেন মন্ত্রীসভায়। মন্ত্রীসভায় রিপোর্ট আলোচিত হয়ে যখন বেরুল তখন দেখা গেল সরকারের বিবৃতিতে অন্যরকম কথা বলা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণের ফলে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে প্রকৃত ঘটনাকে উল্টে দেওয়া হয়েছে। অত্যাচারীতদেরকেই দায়ী করা হয়েছে। ৬ই ডিসেম্বরের সরকারের যুক্ত বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হল যে 'মেদিনীপুরের কংগ্রেস সভ্য, কংগ্রেসের যারা সেবক বলে অভিহিত এবং কংগ্রেস অনুরাগী মেদিনীপুরবাসীর দুষ্কার্য্যের জন্য গভর্ণমেন্ট সেখানে রিলিফ কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করতে পারেনি। গভর্ণমেন্টের যথেষ্ট পরিমাণ আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও সেবাকার্য পর্যাপ্ত পরিমাণে চালানো সম্ভবপর হয়নি।' যুক্ত বিবৃতিতে 'মেদিনীপুরের সরকারি কর্মচারীদের উদারতা, মহানুভবতা, তাদের কর্মক্ষমতা এবং সর্বোপরি তাদের সমাজসেবার অকুণ্ঠ পরিচয়ের কথাই ঘোষণা করা হয়েছিল।'

সরকারি গাফিলতির চূড়ান্ত হিসেব দিয়ে বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী আইন সভায় বললেন :

'সবচেয়ে যেটা অদ্ভুৎ সেটার কৈফিয়ত গভর্ণমেন্ট কি দেবেন, কল্পনা করতেও পারি না। একটি বা দুটি নয়, অনেক — কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তির সমন্বয়ে বর্তমান গভর্ণমেন্ট গঠিত, এবং যেখানে জনসাধারণের অর্থে এতগুলি মন্ত্রী পোষিত হয়ে আসছেন সেই গভর্ণমেন্ট ১৬ই ও ১৭ই অক্টোবর হলো এই ভয়াবহ ঘটনার প্রথম খবর পেলেন ১৯ তারিখে। আমি একথা মাননীয় প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বক্তৃতা থেকে সংগ্রহ করে বলছি। ১৯ তারিখ রাত্রে প্রথম খবর পেলেন কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় যাননি। তিনি কোথায় ছিলেন জানি না, তার মধ্যে লেখা নাই। তারপরে ২২ তারিখে নীহার চক্রবর্তী বলে একজন ভদ্রলোককে মেদিনীপুর পাঠান সম্ভবপর হয়েছিল। মন্ত্রী মহাশয় কেন যেতে পারেননি ২২ তারিখে। ১৯ তারিখে খবর পেয়ে ২২ তারিখ যদি নীহার চক্রবর্তীকে পাঠান সম্ভবপর হয় তাহলে যাওয়ার উপযুক্ত যানবাহন পাওয়া গিয়েছিল, রাস্তাঘাট কিছু ছিল। তাহলে নীহার চক্রবর্ত্তীকে না পাঠিয়ে মন্ত্রী মহাশয় কেন নিজে যান নি, কমিশনার কেন যাননি? এডিশনাল কমিশনার কেন যান নি, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা কেন যান নি? মন্ত্রী মহাশয়ের মধ্যে মাননীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রাজস্ব সচিব মহাশয় গিয়েছেন ২৯ তারিখে। এত বড় একটা দুর্যোগ যাতে ৫০ হাজার লোক মরে গেল, ৩০ লক্ষ লোক হল সর্বহারা, ৬০ হাজার গৃহপালিত পশু মারা গেল, লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি ধ্বংস হ'ল, সেখানে মন্ত্রী মহাশয় আগে যেতে পারলেন না কেন? যাবার কি কোন চেষ্টা করেছিলেন আগে! বলবেন টেলিগ্রাফ করতে পারেননি। হেঁটে যান নি কেন, গড়িয়ে যান নি কেন? (laughter and cheers) মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা দেশবাসী সহিবে না। ... অসহ্য মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তারা জাতির কাছে তাদের চরম অভিযোগ জানিয়ে গেছে।'

কেন এই অত্যাচার? এর উত্তর খুঁজে পেতে সেদিনের সেই সভায় সদস্য পি. ব্যানার্জীর মন্তব্যের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। তিনি বলেছিলেন ঃ

'মেদিনীপুরের প্রতি লাঞ্ছনার ইতিহাস এটা নতুন কিছু নয়। এর উৎস মুখে পৌঁছানর জন্য আমাদের ১৯৩১-এর ইতিহাস জানতে হবে। পেডি, ডগলাস, বার্জ পরপর মেদিনীপুরের তিন জেলা শাসক খুন হওয়ার পর স্থানীয় প্রশাসনের অফিসাররা যে ধরনের ধর্ষণ, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার বাসনা এবং লুঠতরাজ চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে আমরা এই সভায় দ্বর্থ্যহীন ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, এ তারই পুনরাবৃত্তি।'

সত্যিই তাই। পেডি হত্যার পুলিশ আর মিলিটারি হিজলী জেলের বন্দীদের উপর গুলি চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এক জনসভায় নক্কারজনক এই ঘটনার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে জনসাধারণকে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনার জন্য তৈরি থাকতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জেলে আগস্ট বিপ্লবের বন্দী কংগ্রেস নেতারা ত্রাণের কাজে সহায়তা করে আবার জেলে ফিরে আসবার মুচলেকা দিয়ে ৭ দিনের জন্য মুক্তি চেয়েছিলেন। ত্রাণের কাজের স্বার্থেই সন্তোষ বসু, প্রমথ ব্যানার্জী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে মেদিনীপুরের শান্তি রক্ষার প্রশ্নে সেখানকার মানুষজনদের ভবিষ্যৎ আচরণের জন্য এই বন্দিমুক্তির দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কিছু অফিসার আর পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কিছু অফিসার সেই দাবী নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন, 'পেডি, ডগলাস এবং বার্জ হত্যাকারী মেদিনীপুরের মানুষের উত্তরসূরীদের কি আমরা বিশ্বাস করতে পারি?' পারেন নি বলেই বৃষ্টি, ঝড় ও প্লাবন আর প্রশাসনের ইচ্ছাকৃত অপরাধের চেষ্টায় ঘটনার পরপরই দেখা দিল নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের কারন দর্শাতে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের রিপোর্টে (অমৃতবাজার পত্রিকা ঃ ২৮.১২.১৯৪৫) বলা হয়েছে ঃ

১) ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে (ধান ও চাল উৎপাদনে) মেদিনীপুর জেলায় ঘাটতি থাকা সত্বেও উদ্বৃত্ত জেলা হিসেবে সরকারি ঘোষণা এবং বঞ্চনা নীতি প্রয়োগ করে ১৯৪২-এ দুর্যোগের মধ্যেও জোর করে ধান-চাল মেদিনীপুর থেকে নিয়ে যাওয়া;

২) সরকারি কর্মীরা সরকারের নীতির নাম করে জনসাধারণের মনে ত্রাস সঞ্চার করে তাদের এজেন্টদের কাছে মানুষকে নিজের খরচের ধান-চাল বিক্রি করতে বাধ্য করা

৩) ১৬ই অক্টোবর ১৯৪২-এর বন্যায় আবাদ নষ্ট হয়ে গেল পুরোপুরি;

৪) দুর্যোগ ডিঙিয়ে বেঁচে বর্তে থাকা মানুষেরা ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলল এবং

৫) উপকূলে জাপানী আক্রমণের অহেতুক ভয়ে যানবাহনের রোজগেরে নৌকা বন্ধ রাখা।

শুধু তমলুক মহাকুমায় বৃষ্টি-ঝড়-দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া ১,৫২,৫০০ জন মৃতের সংখ্যার হিসেব দিতে গিয়ে সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা হল ঃ

থানা	ঝড়ের আগে মোট জনসংখ্যা	মোট মৃত্যু
নন্দীগ্রাম	১,৬৫,৮০৯	৪৫,০০০
সুতাহাটা	৯৭,১৩৯	৭০,০০০
মহিষাদল	১,৩৫,৭০২	১৫,০০০
তমলুক	১,৩২,০৮৫	১২,০০০
ময়না	৬৩,৬০২	২,৫০০
পাঁশকুড়া	১,৩৫,৭৫৫	৮,০০০
	৭,৩০,০৯২	১,৫২,৫০০

ঐ রিপোর্ট থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দেও উৎপাদনের ৪০ শতাংশ উৎপন্ন হবে জানতে পেরে কিছু কিছু জিনিসের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছিল। (১) সুতো ঃ প্রত্যেকটি হ্যাণ্ডলুম ইউনিটকে অর্ধেক বান্ডিল সুতো দেওয়া হয়েছিল, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় খুব অল্প। জেলেরা মাছ ধরার জাল তৈরির জন্য খুব অল্প সুতো পেয়েছিল। (২) কাপড় ঃ পরিবারের সদস্যসংখ্যার ওপর নির্ভর না করে প্রত্যেক পরিবার পেত দুটি বস্ত্র। আবার অনেকে একটাও পায়নি। (৩) কেরোসিন তেল ঃ প্রতি লোক পিছু প্রতিমাসে কেরোসিন পেত এক ছটাক থেকে দুই ছটাক। (৪) চিনি ঃ প্রতিমাসে প্রতি লোক পিছু চিনি বরাদ্দের পরিমান অর্দ্ধছটাক থেকে দুই ছটাক। (৫) তেল ঃ দু-তিন মাস অন্তর অন্তর সরষের তেলের বরাদ্দ আধসের। নারকেল তেলের উপর কিছু নিয়ন্ত্রন থাকলেও রেশন করা ছিল না। তবে পাওয়াই যেত না। (৬) অন্যান্য ঃ বিশেষ অনুমতি ছাড়া সরষের বীজ পাওয়াই যেত না। মহামারীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কুইনাইন আদৌ পাওয়া যাচ্ছিল না।

সব মিলিয়ে মানুষের দুরাবস্থা অসহনীয় এবং অবর্ণনীয়। এই অবর্ণনীয় অবস্থার খোঁজ খবর করতে গান্ধীজি নিজে এসেছিলেন মহিষাদলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। তমলুকের ১৯৪২-এর রাজনৈতিক ঘটনা সহ ঝড়-প্লাবনে সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন তা জানবার জন্য তিনি 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন' গঠন করেছিলেন। তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৯৪৫ এর ৩১শে ডিসেম্বর। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে 'The physical condition of the people is to-day wretched, their position is avorant, Their mental state is black and their future is black and that is the picture of Tamluk, tiny corner of neglected state of India.' সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তও তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন ১৬ই অক্টোবরের বৃষ্টি-ঝড়-সমুদ্রতরঙ্গ-প্লাবন, সরকারি বঞ্চনা ও অত্যাচার এবং সমসাময়িক রাজনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সব মিলিয়ে তমলুক মহকুমার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা পঙ্গু হয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪২-এর ৮ই সেপ্টেম্বর দনীপুরে রূপনারায়ণের তীরে গণউদ্যোগে প্রতিরোধ মিছিলে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুকে আবাসবাড়ির রাস্তায় থানা অভিযানকারী মিছিলে পুলিশের নির্লজ্জ আক্রমণ এবং ১৬ই অক্টোবরের দুর্বিপাকের সুযোগ নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার বদলে অকথ্য অত্যাচারই তমলুকবাসীদের মনে যে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছিল তারই পরিণতি স্বাধীন 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' (মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার)-এর শুভ সূচনা ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর। দুটি মানুষের (একজন তমলুকের মহকুমা শাসক এবং অন্যজন মেদিনীপুরের জেলাশাসক) হৃদয়হীনতাই স্বাধীন জাতীয় সরকার গড়ার কাজ ত্বরান্বিত করে দিলেও সরকার গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকে। তাই দেখি ১৯৪২-এর ১২ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে স্থানীয় অফিসারদের সাজিয়ে দেওয়া তথ্যের

ওপর ভিত্তি করে ওদের কাজকে সমর্থন জানিয়ে জবাবী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক্ বলেছিলেন যে, 'বিগত ৫ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসই বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস'। তিনি আরও বললেন যে সরকারের কাজে প্রচুর তথ্য আছে যা দিয়ে দেখান যাবে যে ৮ই আগস্টের সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির এলাহাবাদ প্রস্তাবের বহু আগে থেকে মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেসীরা ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনের পাশাপাশি নিজেদের সরকারি শাসন ব্যবস্থা চালু করবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। ৮ই আগস্টের পরে তারা জাতীয় সরকার চালু করে দিয়ে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে ওদের নিজেদের পুলিশবাহিনী লোকজনদের জোর করে ধরে নিজেদের 'গান্ধী জেল'-এ ভরে দিয়েছে। (অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিরাই 'গান্ধী জেল'-এ কয়েকদিন কাটিয়েছেন।) ওরা সরাসরি ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের উপর তথাকথিত অত্যাচারগুলি সম্পর্কে মতানৈক্য থাকতেই পারে। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাদের উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা এবং এই কাজে তারা বেশ কিছু বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছিল।

একথা সত্য যে মেদিনীপুরের মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ সমস্ত অত্যাচার অবিচারকে উপেক্ষা করে এক প্রচন্ড শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে শক্তিমান ব্রিটিশ সরকারের পাশাপাশি ২ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে (১৭ ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে ৮ আগস্ট ১৯৪৪ পর্যন্ত) নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা, জেলখানা, পুলিশবাহিনী, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি চালু করে তমলুক মহকুমায় 'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে প্রশাসন চালিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী অধ্যায়। ১৯৪৬-এর ৩রা জানুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকা মেদিনীপুরের সংগ্রামী মানুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্তব্য করল ঃ

> 'সুসভ্য শাসনের নামে সমাজের উপর কিরূপ বর্বর ও জঘন্য অত্যাচার হওয়া সম্ভব মেদিনীপুরের বিবরণ তাহাই প্রমাণিত করিতেছে। শাসকেরা দমননীতির নিষ্পেষণ যন্ত্র চালাইয়া মেদিনীপুরকে সমভূমি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন এবং যথাসাধ্য করিয়াও ছিলেন; জনসমাজের দুর্দৈবে ইহার সহিত যোগ দিয়াছিল প্রকৃতির নিদারুণ তাণ্ডব; একদিকে মানুষের উৎপীড়ন অপরদিকে উপদ্রব — এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রকোপ সহ্য করিয়া মেদিনীপুর কেমন করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহা বিশ্ববিস্ময় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যেদিন ইহা ঘটিয়াছিল — সরকারী দমননীতির প্রকোপকে প্রতিরোধ করিতে ব্রিবত মেদিনীপুরের উপর যখন ঝঞ্ঝা ও সমুদ্র বন্যার তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন মনে হইয়াছিল কাঁথি-তমলুকের অস্তিত্ব থাকিবে না; হয় উহা সমুদ্র গর্ভে তলাইয়া যাইবে, আর না হয় শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইবে। ... কাঁথি-তমলুকের জনসমাজ মরিতে ভীত নহে। মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবার সাধনার

মধ্যে দিয়াই তাহারা মৃত্যুঞ্জয় শক্তি ও সঙ্কল্পের অধিকারী হইয়াছে। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ মেদিনীপুর হইতে যদি কোন শিক্ষা লইতে চায় — এই শিক্ষাই তাহাকে লইতে হইবে । মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া এবং উহাকে অতিক্রম করিয়াই মৃত্যুঞ্জয় হইতে হয়। মেদিনীপুরের উপর দিয়া রাজনৈতিক পীড়নের তরঙ্গ যেভাবে বহিয়াছে ভারতবর্ষের খুব কম স্থলেই তাহার তুলনা মিলিবে। এই পীড়ন সহিয়াও মেদিনীপুর বাঁচিয়া আছে তাহার মূলে রহিয়াছে এই মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্কল্পের ক্রিয়া। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পর হইতে পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে যাহারা প্রাণ দিয়াছে — আঘাত তাহাদের সকলেরই বক্ষে — কাহারও পৃষ্ঠে নহে।'

পরাধীন ভারতের স্বাধীন সরকার এবং তার বিচারালয়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের জেলার একটা অগ্রগণ্য এবং অনন্য ভূমিকা রয়েছে। গৌরবোজ্জ্বল সেই ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেই ১৯৩৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ থেকে লেখা একটা চিঠিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখেছিলেন ঃ

> "Among the many places which have provided martyrs for the cause of Indian freedom, Midnapore district occupies an honourable position... I should like to tender my respectful congratulations to the brave men and women of the district who have suffered so much for the cause... we can never forget the shining example of heroism and sacrifice which specially Indian women have given and we cannot forget what happened in Midnapore district."

জওহরলাল-এর এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে British Indian secret Report-এ এবং ১৯৪৬-এর ৩রা জানুয়ারীর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে।

সত্যি কথা বলতে কি ভারতের ব্রিটিশ আধিপত্যের শুরু থেকেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল মেদিনীপুর জেলা, — বিশেষ করে এ জেলার পূর্বপ্রান্তের ঐতিহাসিক বন্দর তাম্রলিপ্তির স্মৃতি বিজড়িত তমলুক মহকুমা (অবিভক্ত)। খ্যাত-অখ্যাত, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে কদম বাড়িয়ে সমাজের বারবনিতা সহ কুলবধূ স্বাধীনতার লড়াইয়ের ময়দানে নেমে আন্দোলনের গতি এনে দিয়েছিলেন। এঁদেরই প্রচেষ্টায় অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত, সুশীল কুমার ধাড়া প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনকে অকেজো করে দিয়েই তমলুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশভারতে প্রথম দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় সরকার — 'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' — ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর। পরাধীন ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের স্থায়ী এই স্বাধীন সরকার। সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রশাসনে এই সরকার স্থায়ী হয়েছিল ১৯৪৪-এর ৮ই আগস্ট পর্যন্ত।

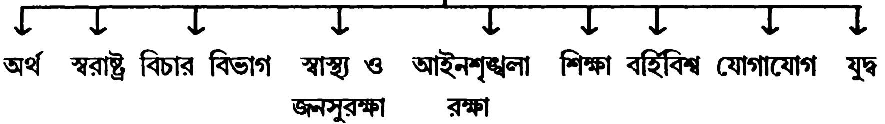
এই সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বি-স্তরের। মহকুমা স্তরে একজন সর্বাধিনায়কের নেতৃত্বে এক একজন মন্ত্রীর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগ এবং এদের অধীনে প্রত্যেকটি থানায় আবার একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে এক এক জন মন্ত্রীর অধীন বিভিন্ন দপ্তর বা বিভাগ পরিচালিত হত। এক কথায় সরকার পরিচালনায় যা যা দরকার তাই ছিল এই সরকারের। এই সরকারের প্রস্তুতি থেকে পরিচালনায় প্রতিটি দিনের প্রতিটি ঘন্টা মিনিট

সেকেন্ডের পরিকল্পনার নিখুঁত রূপকার অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় নিজে হলেও অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধায় সতীশচন্দ্র সামন্তকে দিয়েছিলেন প্রথম সর্বাধিনায়কের পদ। ১৯৪৩-এর ২৪শে মে সতীশচন্দ্র গ্রেপ্তার হলে অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন এই সরকারের দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক ।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ও তার বিভাগ সমূহ

মহকুমা স্তর

সর্বাধিনায়ক



সর্বাধিনায়কগণ

১ম সর্বাধিনায়ক	-	সতীশচন্দ্র সামন্ত	১৭-১২-১৯৪২ থেকে ২৬-৫-১৯৪২
২য় সর্বাধিনায়ক	-	অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় (সতীশচন্দ্র সামন্তর সময় অর্থমন্ত্রী)	২৭-৫-১৯৪৩ থেকে ১৯-৯-১৯৪৩
৩য় সর্বাধিনায়ক	-	সতীশচন্দ্র সাহু	২০-৯-১৯৪৩ থেকে ১২-৩-১৯৪৪
৪র্থ সর্বাধিনায়ক	-	বরদাকান্ত কুইতি	১১-৩-১৯৪৪ থেকে ৮-৮-১৯৪৪

জাতীয় সরকারের অধীন সৈন্যবাহিনী (বিদ্যুৎবাহিনী এবং ভগিনীসেনা) ঃ

কমান্ডার-ইন-চিফ (সমরাধ্যক্ষ)	—	সুশীল কুমার ধাড়া
কমান্ড অফিসার (জি. ও. সি.)	—	গোপীনন্দন গোস্বামী
অধিনায়িকা/ভগিনীসেনা	—	সুবোধবালা কুইতি

মূল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অধীন প্রত্যেকটি থানায় অধিনায়কের নেতৃত্বে থাকত থানা জাতীয় সরকার ও মহকুমা স্তরে সর্বাধিনায়কের অধীন বিভিন্ন বিভাগের মতই এর সমস্ত বিভাগ এবং থানা সরকারের অধীন সৈন্যবাহিনীর জি. ও. সি.।

তমলুক থানা জাতীয় সরকার ঃ

১ম অধিনায়ক	-	গুনধর ভৌমিক	২৬-১-৪৩ — আগষ্ট, ১৯৪৩
২য় অধিনায়ক	-	প্রিয়নাথ জানা	সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ — ডিসেম্বর, ১৯৪৩
৩য় অধিনায়ক	-	অমূল্যচরণ মাইতি	ডিসেম্বর, ১৯৪৩ — ২৯-৯.১৯৪৪

সৈন্যবাহিনীর প্রধান (জি. ও. সি)

এবং গরমদলের প্রধান ঃ	নরেন্দ্রনাথ জানা		গ্রাম - বল্লুক
গরমদলের সৈনিক ঃ	(১)	নারানচন্দ্র কর	গ্রাম - বল্লুক
	(২)	অমূল্যচরণ মাইতি	গ্রাম - সোনাপোতা
	(৩)	হীরেন্দ্রনাথ রায়	গ্রাম - তমলুক
	(৪)	আশুতোষ মন্ডল	গ্রাম - ডিমারিহাট
	(৫)	হরিপদ মন্ডল	গ্রাম - পোলন্দা
	(৬)	দিবাকর ভট্টাচার্য্য	গ্রাম - যোগীখোপ
গরমদলের সাহায্যকারী সৈনিকগণ	(১)	কানাইলাল মাইতি	গ্রাম - পোলন্দা
	(২)	কার্তিকচন্দ্র মাজি	গ্রাম - চামরা
	(৩)	ক্ষুদিরাম মাল	গ্রাম - ছাবিয়া
	(৪)	নরেন্দ্রনাথ আদক	গ্রাম - আজিনগাছিয়া
	(৫)	পুলিন মাইতি	গ্রাম - মিরিকপুর
	(৬)	বানেশ্বর মন্ডল	গ্রাম - পোলন্দা
	(৭)	বানেশ্বর মান্না	গ্রাম - পোলন্দা
	(৮)	মোতিলাল সিংহ	গ্রাম - লালুগেড়িয়া
	(৯)	সুধীর চন্দ্র মাল	গ্রাম - ছাবিয়া
	(১০)	সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য	গ্রাম - কোলোমাল
	(১১)	হরিপদ পড়িয়া	গ্রাম - ছাবিয়া
	(১২)	হরিপদ মাইতি	গ্রাম - মিরিকপুর

মহিষাদল থানা জাতীয় সরকার ঃ

১ম অধিনায়ক	-	নীলমনি হাজরা	২৬-১-১৯৪৩ — ৫-৩-১৯৪৩
২য় অধিনায়ক	-	বরদাকান্ত কুইতি	৬-৩-১৯৪৩ -- ৯-৮-১৯৪৪

গরমদলের প্রধান ঃ	(১)	সুশীল কুমার ধাড়া	
সৈন্যবাহিনীর প্রধান এবং কমান্ড্যান্ট ঃ	(২)	গোপীনন্দন গোস্বামী	গ্রাম - গোপালপুর
গরমদলের সৈনিকগণ	(১)	অজিত কুমার সিনহা	গ্রাম - নামালক্ষ্যা
	(২)	ক্ষুদিরাম রায়	গ্রাম - ঘাটুয়াল
	(৩)	গঙ্গাধর গুছাইত	গ্রাম - কালিকাপুর
	(৪)	গুনাধর দোলই	গ্রাম - টিকারামপুর
	(৫)	ধীরেন্দ্রনাথ ঘোড়ুই	গ্রাম - খঞ্চি
	(৬)	ননীগোপাল বাগ	গ্রাম - পানিসিথি
	(৭)	প্রহ্লাদ পাত্র	গ্রাম - খঞ্চি

(৮)	ষড়ানন	গ্রাম - খঞ্চি
(৯)	শরৎচন্দ্র জানা	গ্রাম - ফত্‌তিকরি
(১০)	সতীশ দত্ত	গ্রাম - খঞ্চি
(১১)	সুধীরচন্দ্র মেট্যা	গ্রাম - বাগদা
(১২)	ঊষা চৌধুরী	গ্রাম - মহিষাদল
(১৩)	কুমুদিনী ডাকুয়া	গ্রাম - মহিষাদল

গরমদলের সাহায্যকারী
সৈনিকগণ ঃ

(১)	অনন্ত কুমার দাস	গ্রাম - তেরপাড়া-জলপাই
(২)	অনিল কুমার সামন্ত	গ্রাম - ধান্যঘরা
(৩)	অতুল আচার্য	গ্রাম - বাগমারী
(৪)	কানাইলাল পট্টনায়ক	গ্রাম - কাঞ্চনপুর
(৫)	কার্তিক মাইতি	গ্রাম - চক্ জিয়ান
(৬)	কিশোরী মাইতি	গ্রাম - খঞ্চি, নারকেলদা
(৭)	কুমুদ বান্ধব জানা	গ্রাম - শ্যামসুন্দরপুর
(৮)	খগেন্দ্রনাথ মাইতি	গ্রাম - মহম্মদপুর
(৯)	গঙ্গাধর মাইতি	গ্রাম - চক জিয়াদীঘি
(১০)	জগদীশচন্দ্র সামন্ত	গ্রাম - ঠাকুরচক্
(১১)	জ্যোতিষচন্দ্র সামন্ত	গ্রাম - গোপালপুর
(১২)	তরণী জানা	গ্রাম - তাজপুর
(১৩)	প্রবোধ কুমার সামন্ত	গ্রাম - ধান্যঘেরা
(১৪)	প্রফুল্ল কুমার কুইলা	গ্রাম - মধ্যহিংলী
(১৫)	বলাই মাইতি	গ্রাম - চক্-জিয়ান
(১৬)	বনমালী মাইতি	গ্রাম - নাই গোপালপুর
(১৭)	বঙ্কিম বিহারী মাইতি	গ্রাম - মহম্মদপুর
(১৮)	বিরাজ মোহন সামন্ত	গ্রাম - কাঞ্চনপুর
(১৯)	মতি মাইতি	গ্রাম - বরগোদা
(২০)	যতীন্দ্রনাথ কর	গ্রাম - বরগোদা
(২১)	রাধাকৃষ্ণ দিন্ডা	গ্রাম - সাওড়াবেড়িয়া জলপাই
(২২)	রাধাগোবিন্দ পট্টনায়ক	গ্রাম - মাগুরী
(২৩)	সতীশচন্দ্র বেরা	গ্রাম - চক্‌শিমুলিয়া
(২৪)	সন্তোষ কুমার বাগ	গ্রাম - গোপালপুর
(২৫)	হরেন্দ্রনাথ দিন্ডা	গ্রাম - পূর্ব-ডিমাই

সুতাহাটা থানা জাতীয় সরকার ঃ

১ম অধিনায়ক	-	ডাঃ জনার্দ্দন হাজরা	২৬-১-১৯৪৩ — ৫-৩-১৯৪৩
২য় অধিনায়ক	-	রাসবিহারী জানা (ছোট)	২০-৪-১৯৪৩ — ২৩-৭-১৯৪৩
৩য় অধিনায়ক	-	দেবেন্দ্রনাথ কর	২৪-৭-১৯৪৩ — ৯-৮-১৯৪৪

সৈন্যবাহিনীর প্রধান (জি.ও.সি.)

এবং গরমদলের প্রধানঃ	(১)	বিধুভূষণ কুইতি	গ্রাম - বাড়বাসুদেবপুর
কমান্ড্যান্ট ঃ	(২)	যদুপতি মাইতি	গ্রাম - বাড়বাসুদেবপুর

গরমদলের সৈনিকগণ ঃ	(১)	প্রবীর চন্দ্র পাল	গ্রাম - বাড়-বাজিতপুর
	(২)	বিধুভূষণ সামন্ত	গ্রাম - হলদিয়া
	(৩)	মন্মথনাথ সানকি	গ্রাম - দাড়িম্বচক
	(৪)	যদুপতি মাইতি	গ্রাম - চকদ্বিপা
	(৫)	রাম চন্দ্র সামন্ত	গ্রাম - হলদিয়া
	(৬)	শ্যামাপদ বোসাই	গ্রাম - চকদ্বিপা
	(৭)	হৃষিকেশ দাস	গ্রাম - বসনচক

গরমদলের সাহায্যকারী সৈন্যগণ ঃ	(১)	আশুতোষ মাইতি	গ্রাম - বাবুপুর
	(২)	ক্ষুদিরাম জানা	গ্রাম - মনোহরপুর
	(৩)	গোপালচন্দ্র বেরা	গ্রাম - হাদিয়া
	(৪)	জীবনকৃষ্ণ দাস	গ্রাম - আনন্দপুর
	(৫)	প্রাণকৃষ্ণ দাস	গ্রাম - হাদিয়া
	(৬)	পরেশ সাঁতরা	গ্রাম - মনোহরপুর
	(৭)	ভবতারণ নায়ক	গ্রাম - সিমুলবেড়িয়া
	(৮)	মন্মথনাথ সামন্ত	গ্রাম - মুরারিচক
	(৯)	ভূষণচন্দ্র বেরা	গ্রাম - রামগোপালচক
	(১০)	ব্যোমকেশ মাইতি	গ্রাম - ধান্যঘাটা
	(১১)	ব্যোমকেশ দন্ডপাট	গ্রাম - রামগোপালচক
	(১২)	মনীন্দ্রনাথ সামন্ত	গ্রাম - হাদিয়া
	(১৩)	লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী	গ্রাম - বাসুদেবপুর
	(১৪)	সুশীল খুটিয়া	গ্রাম - কুমারপুর
	(১৫)	হেমন্ত কুমার বেরা	গ্রাম - হাদিয়া
	(১৬)	হৃষিকেশ আচার্য	গ্রাম - ডালিম্বচক
	(১৭)	হৃষিকেশ ঘোড়া	গ্রাম - জয়নগর

নন্দীগ্রাম থানা জাতীয় সরকার ঃ

অধিনায়ক ঃ কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস ২৬-১-১৯৪৩ — ২৯-৯-১৯৪৪

সৈন্যবাহিনীর প্রধান (জি.ও.সি.) এবং গরমদলের প্রধান ঃ	(১)	বঙ্গভূষণ ভক্ত	গ্রাম - ধান্যশ্রী
কম্যান্ড্যান্ট	(২)	কানাইলাল সামন্ত	গ্রাম - ধান্যশ্রী
গরমদলের সৈনিকগণ ঃ	(১)	অশ্বিনী দাস অধিকারী	গ্রাম - রেয়েপাড়া
	(২)	উপেন্দ্রনাথ বেরা	গ্রাম - বড়বাড়ি
	(৩)	নরেন্দ্রনাথ পড়িয়া	গ্রাম - ডিহি-কাশিমপুর
	(৪)	বঙ্কিমচন্দ্র বেরা	গ্রাম - শ্যামসুন্দরপুর
	(৫)	রবীন্দ্রনাথ গিরি	গ্রাম - রেয়েপাড়া
	(৬)	সতীশচন্দ্র মাইতি	গ্রাম - কদমতলা
	(৭)	সুধাংশু শেখর মাইতি	গ্রাম - গড়গ্রাম
	(৮)	শ্রীকান্ত পড়িয়া	গ্রাম - ডিহি-কাশিমপুর
গরমদলের সাহায্যকারী সৈনিকগণ	(১)	কেনারাম গিরি	গ্রাম - বাঁশগোড়া
	(২)	গোরাচাঁদ পড়িয়া	গ্রাম - বজবেড়িয়া (বর্তমানে ভগবানপুর থানার অন্তর্গত)
	(৩)	পশুপতি গিরি গোস্বামী	গ্রাম - গোপালপুর
	(৪)	বঙ্কিমচন্দ্র ভক্ত	গ্রাম - কুলবাড়ি
	(৫)	বেনীমাধব গিরি	গ্রাম - বৃন্দাবনপুর
	(৬)	বিলাস চন্দ্র প্রধান	গ্রাম - ভগবানখালি
	(৭)	ভূবনচন্দ্র আদক	গ্রাম - বাঁশগোড়া
	(৮)	মাখনলাল মিদ্যা	গ্রাম - রতনপুর
	(৯)	মাখনচন্দ্র খাড়া	গ্রাম - রসিকচক
	(১০)	মদন গোপাল ভক্ত	গ্রাম - ধান্যশ্রী
	(১১)	মাধবচন্দ্র সানকি	গ্রাম - কুলবাড়ি
	(১২)	মুচিরাম মন্ডল	গ্রাম - বাতনান
	(১৩)	সেখ আমিরুদ্দিন	গ্রাম - সুলতানপুর
	(১৪)	সুধীরচন্দ্র সানকি	গ্রাম - কুলবাড়ি

ব্রিটিশ ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন-এর পাশাপাশি ২১ মাসের দেশীয় এই স্বাধীন সরকারের পরিচালনায় প্রশাসন সারা ভারতের নজর কেড়েছিল। এরকম একটি স্বাধীন সরকারের উপস্থিতি যে পরাধীন ভারতে গড়ে তুলতে পারা গিয়েছিল, তার মূলে আছে এই মহকুমার তথা মেদিনীপুর জেলার দীর্ঘদিনের বিপ্লবী কাজকর্ম। আসলে তমলুক মহকুমার অসহনীয় পরিস্থিতি মানুষের অনাস্থা বাড়াল ব্রিটিশের প্রতি এবং প্রতিদিনই তারা শক্তি সঞ্চয় করল বিদেশী সাম্রাজ্য অন্তর্হিত করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য।

এই সরকারি বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন তমলুক রাজবাড়ির রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া। ১৭৮১তে তিনি এক পারিবারিক বিবাদের জেরে নিজের জমিদারী রক্ষার প্রশ্নে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে অসাধারণ দৃঢ়তা এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে নিজেরা পরাস্ত হলেও তা ছিল বীরত্বব্যঞ্জক। ব্রিটিশ আমলের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি ১৭৯৪-এ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ব্যর্থ হলেও তাঁর সংগ্রাম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মাঙ্গলীরা বিদ্রোহ করল। কারণ, এ তল্লাটের দেশীয় জমিদারদের লবণের গোলা ছিল অনেক। বহুমানুষের জীবিকা নির্ভর করত লবণ তৈরীর উপর। লোভী ইংরেজদের থাবা পড়ল লবণের উপর। এর ৬ বছর পরে বগড়ি রাজ্যের (মেদিনীপুরের গড়বেতা) গনগণির 'নায়েক বিদ্রোহ' আগুনের মতই গনগনে; মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বাংলায় ততদিনে নবজাগরণের পাট শুরু হয়ে গেছে। মেদিনীপুর জেলার সু-সন্তান পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্রতী হলেন শিক্ষা বিস্তারে। স্বাদেশিক চেতনাও দৃঢ়বদ্ধ হ'ল। এই সময়ে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় দেশপ্রেম ও দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার একটা চেতনাও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তমলুকের রক্ষিতবাড়িরই ব্যায়ামাগারের শরীরচর্চার আড়ালে গুপ্তসমিতির বিপ্লবী কার্যকলাপে। সত্যেন্দ্রনাথ রক্ষিতের এই ব্যায়ামাগারেই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পূর্ণ সেন প্রমুখ বিপ্লবীরা। অন্যদিকে মেদিনীপুর শহরে কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঋষি রাজনারায়ণ বসু এবং অপর শিক্ষক রাজনারায়ণের ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বসু-র প্রচেষ্টায় এই স্কুলকে কেন্দ্র করেই কাজ চলত গুপ্ত সমিতির। অরবিন্দ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো, ক্ষুদিরাম বসু প্রমুখ যুক্ত হলেন বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের সঙ্গে। তমলুকে এসে চারণ কবি মুকুন্দ দাস বঙ্গভঙ্গের সময় গান গেয়ে উদ্বুদ্ধ করলেন মহকুমার সাধারণ মানুষকে।

১৯০৭-এর ৫ই নভেম্বর নারায়ণগড় আর খড়্গপুরের মাঝে বেনাপুকুরের কাছে রেললাইনে ৬ পাউন্ড ওজনের ডিনামাইট দিয়ে মাইন পুঁতে রেখে ছোটলাট অ্যান্ড্রুফ্রেজার-এর ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন বিপ্লবীরা। এরপরে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াস ব্যর্থ হলেও ১৯০৮ এর ৩০শে এপ্রিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ধরা পড়ে ফাঁসি গেলেও মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের ছোঁড়া বোমা ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসনে ভিত নড়িয়ে দিতে পেরেছিল। বিপ্লব গিয়েছিল গড়িয়ে। বিশের দশকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জেলার মানুষ নির্ভরতা খুঁজে পেলেন কাঁথির চন্ডীভেটী গ্রামের দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মধ্যে। শাসমলের নেতৃত্বে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় চৌকীদারী ট্যাক্স দেবো না আন্দোলনের সাফল্যে পিছু হঠল ইংরেজ সরকার।

অসহযোগ পেরিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঢুকে পড়লেন গান্ধীজি। লবণকে কেন্দ্র করেই এই আন্দোলন ত্রিশের দশকের শুরুতেই। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মহিলারাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সঠিকভাবে আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রতি মহকুমায় এবং থানায় একজন মহিলা ডিরেক্টর পদে নির্বাচিত হতেন। নেতৃত্বে স্থানীয় মহিলারা ছাড়াও অসংখ্য মানুষের মিছিলে হাজার হাজার মা-বোনেরা সরাসরি কিংবা গোপনে কাজ করে গিয়েছেন বিপ্লবের। এঁদেরই অনুপ্রেরণায় অদম্য সাহসে ভর করেই জেলাশাসক পেডি-র অত্যাচার উপেক্ষা করেই ১৯৩০-এর ৬ই এপ্রিল তমলুক শহরের উপান্তের রাজবাড়ির ভগ্নবাড়ি থেকে ৮ হাজারের বেশী সত্যাগ্রহীর মিছিল বেরিয়ে বাংলার ডান্ডি নরঘাট-এ পৌঁছল লবণ আইন অমান্য করবার জন্য।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ক্ষুরধার আক্রমণে হিংস্র ব্রিটিশ পুলিশ গর্জে উঠল অমানুষিক অত্যাচারে। জেলাশাসক পেডি-র নির্দেশে খড়্গপুরের কাছে হিজলী জেলের বন্দী নিবাসে নিরস্ত্র বন্দীদের ওপর অতর্কিতে পুলিশ গুলি চালাল। মারা গেল দুজন। গর্জে উঠল সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মানুষ। হিজলীর প্রতিশোধ নিতে বিপ্লবীরা খুন করলেন পরপর তিনবছরে তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—পেডি, ডগলাস আর বার্জকে (১৯৩১,১৯৩২, ১৯৩৩)। ১৯৩৮-এর ১১ই এপ্রিল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু তমলুক শহরে পরিভ্রমণ করে আবার জাগিয়ে তুললেন কিছু ঝিমিয়েপড়া মানুষদের। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে দেশ হয়ে উঠল আবার উত্তাল। অসহযোগ, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের সংগ্রাম — ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন। যোগ্য নেতৃত্ব, বলিষ্ঠ সংগঠন ইত্যাদির জন্য মেদিনীপুর জেলার এই পূর্বাংশে তমলুক মহকুমায় সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র সামন্ত-র মুখ্য নেতৃত্বে সমগ্র মহকুমার লাগাম ওদের হাতে। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল তমলুক মহকুমা।

১৯৩০-এর লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের মত ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনেও অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় তমলুকে গড়ে তুলেছিলেন দুর্ভেদ্য দুর্গ। তাঁর সুপরিকল্পিত নেতৃত্বেই ১৯৪২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুক শহর থানা অভিযানের নিখুঁত প্রয়োগ। কান্ডারী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাধারণ মানুষ ২৭ আর ২৮শে সেপ্টেম্বর রাস্তাঘাট কেটে দিয়ে কিংবা রাস্তার উপর গাছপালা ফেলে এবং টেলিগ্রাফের লাইন কেটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার এমন কুশল প্রয়োগ করেছিল নিঃশব্দে, ব্রিটিশ বাহিনী বুঝতে পেরেছিল মাত্র অভিযানের দিন সকাল বেলায়। নেতার প্রতি দুর্বার আকর্ষণেই এই অভিযানের মহামিছিলের সামনে এসে বুক পেতে দিয়ে ব্রিটিশের গুলিতে জীবন দিয়ে জাতীয় পতাকাকে উর্দ্ধে রেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনাদের পাশে গৌরবের আসন করে নিয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা।

ব্রিটিশের অত্যাচারের পাশাপাশি এল ১৯৪২-এর ১৬ই অক্টোবর মহাপ্রলয়ের ঝড়, সমুদ্র প্লাবন। ক্ষতিগ্রস্থ হল কাঁথি আর তমলুক মহকুমা। চলল লুণ্ঠন আর নারী নির্যাতন। শারীরিক অত্যচারে লজ্জায় হিম হয়ে গিয়েছিল কাঁথি এবং তমলুক মহকুমার বিশেষ করে এই মহকুমার চন্ডীপুর মাশুড়িয়া গ্রামের মা বোনেরা — যাঁরা ধর্ষিতা হয়েছিলেন অকথ্যভাবে,

যা শুনে গান্ধীজি পরে (১৯৪৫) তমলুক মহকুমার মহিষাদলে সরেজমিন তদন্তে এসে তাঁর মহিলা পর্যবেক্ষকদের কাছে ঘটনার মর্মবেদনা শুনে বলেছিলেন "বর্বর"। সুখের কথা শারীরিক লাঞ্ছনা সত্ত্বেও একজন মহিলাকেও সমাজচ্যুত হতে হয়নি।

বিদ্রোহী জনতা অবরোধ করল মহিষাদল সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম আর ময়না থানা। অত্যাচারী ইংরাজদের প্রতিহত করতে গড়ে তোলা হয়েছিল বিদ্যুৎবাহিনী আর ভগিনীবাহিনী। ভগিনীবাহিনীর অধিনায়িকা সুবোধবালা কুইতি। প্রধান কার্যালয় সুতাহাটার কাছে দ্বারিবেড়্যায়। ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সরকারের অধীনে বিদ্যুৎবাহিনী আর ভগিনীবাহিনী মিলেমিশে একটি সেনাবাহিনী তৈরী হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন সুশীল কুমার ধাড়া এবং গোপীনন্দন গোস্বামী। বাহিনীর অন্যান্য সদস্যারা হলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বাংলার ডান্ডি (নরঘাট) অভিযানের অন্যতম নেতা ক্ষুদিরাম ডাকুয়া ও তার পত্নী কুমুদিনী ডাকুয়া, সন্ধ্যা সিনহা, ঊষা চৌধুরী প্রমুখ।

সমাজের নানার স্তরের মানুষ সাহায্য করেছেন আন্দোলনকে। মহিলারাও বাদ যায়নি। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বারাঙ্গনারা। এমনই একজন বারাঙ্গানা সাবিত্রী দে হয়ে উঠেছিলেন বীরাঙ্গনা। আন্দোলনে সবারই ত্যাগে বীরত্বে গড়ে উঠেছিল মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় 'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'।

জাতীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হল এর বিচার বিভাগ। বিচার মন্ত্রীর অধীনে থাকত এই বিভাগ। দ্বিস্তর বিচার ব্যবস্থায় ছিল — থানা আদালত আর মহকুমা আদালত। দেওয়ানী এবং ফৌজদারি দুই ধরনের বিচার করা হত। প্রতিটি কেস করার জন্য ১ টাকা জমা দিতে হত। পরে বেড়ে হয় ২ টাকা। তারপরে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে এমার্জেন্সি কেস করার জন্য দিতে হত অতিরিক্ত ২ টাকা। থানা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে অ্যাপিল করা যেত। পছন্দ না হলে তিনজন বিচারক নিয়ে গড়া বিশেষ ট্রাইবুন্যালের কাছে আবেদন জানানো যেত। এখানেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। এই সমস্ত কোর্ট বা আদালতগুলির নির্দিষ্ট কোনও বিচারালয় ছিল না। বন্দী বা বিবাদীর সুবিধা অনুসারে প্রায় ২০০-৩০০ জন সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসত এই আদালত। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ এবং নিম্ন আদালতে বিচার্য বহু মামলা জাতীয় সরকারের আদালতে ফিরে এসে নিষ্পত্তি হয়েছে। আদালতগুলিতে উকিল বা মুহুরির কোন প্রয়োজন পড়ত না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উকিল বা মুহুরিগণ উপস্থিত থেকেছেন এবং বিচারের পদ্ধতি এবং নিষ্পত্তি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই বিচারালয়ের সাজা বলতে ছিল সতর্কীকরণ, জরিমানা, কোর্ট চলাকালীন আটকে রাখা, বেত্রাঘাত ইত্যাদি। কেবলমাত্র পালিয়ে বেড়ান কিংবা লুকিয়ে থাকা লোকজনদের সম্পত্তি অ্যাটাচ করা হ'ত অথবা বিক্রি করা হত প্রকাশ্য নিলামে। অবশ্য এই কাজ করা হ'ত খুব অল্পই; যখন সরকারের বোঝাপোড়া আয়ত্বের বাইরে চলে যেত।

সুতাহাটা থানা আদালতে ৮৩৬, নন্দীগ্রামে থানা আদালতে ২২২, মহিষাদল থানা আদালতে ১০৫৫ এবং তমলুক থানা আদালতে ৭৯৪ অর্থাৎ মোট ২৯০৭টি মামলা গ্রহণ

করা হয়েছিল বিচারের জন্য। এর মধ্যে ১৬৮১টি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছিল। গান্ধীজির নির্দেশে জাতীয় সরকারের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেলে বাকি মামলাগুলিও বন্ধ হয়ে যায়। নিষ্পত্তি হয়নি এমন মামলাগুলির বাদীদের জমা টাকা ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু অনেকেই এই টাকা ফিরে নেয়নি।

বিচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে জেলখানার। জাতীয় সরকারের নিজস্ব জেলখানা বা বন্দীনিবাস ছিল। এখানে শুধু দোষী ব্যক্তির শাস্তি পাওয়ার জন্যই আটক রাখা হত তাই নয়, বিপ্লবী কাজকর্মের প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য কাউকে বন্দী করেও রাখা হত। এমনই এক বন্দিনিবাসে আটক ছিলেন পরবর্তী কালের খ্যাতিমান লেখক প্রয়াত ঐতিহাসিক ড. অমলেশ ত্রিপাঠি। নন্দীগ্রাম থানা জাতীয় সরকারের অধীনের সেনাবাহিনী ও গরমদলের প্রধান বঙ্গভূষণ ভক্ত তাঁর 'গরমদল' বইতে এক বর্ণনায় বলেছেন অমেলশবাবুর পিতা শ্যামাচরণ ত্রিপাঠি ছিলেন সুতাহাটা থানার দেভোগ গ্রামের ধন্যাঢ্য ব্যক্তি, ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষক এবং তমলুক মহকুমা শাসকের রিলিফ কমিটির উপদেষ্টা। মহকুমা শাসককে বন্যার সময় দুর্গত মানুষদের রিলিফ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে এবং দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ৪৫ টাকা মণ দরে খুবই চড়া দামে চাল বিক্রি করে অথবা প্রতিমণ ধানের জন্য এক বিঘা ধানের জমি বিনিময় নিয়ে মানুষের দুঃখকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্যামাচরণ। এই অপরাধে থানা জাতীয় সরকার শ্যামাচরণকে ২০০ টাকা জরিমানা দিতে বলেছিল। কিন্তু তিনি সেই নির্দেশ পালন না করায় গরমদলের (অ্যাকশন স্কোয়াড) প্রধান এবং জাতীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ৪০০০০ টাকা নির্ধারিত দিনে পাঠানর আদেশ দিলেন শ্যামাচরণকে। এই ব্যাপারে শ্যামাচরণ নিরুত্তর থাকায় টাকা আদায়ের এক পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ও কৃতি ছাত্র অমলেশ ত্রিপাঠিকে অপহরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল জাতীয় সরকার। সেই মতই বাড়ির সামনের রাস্তায় বৈকালিক ভ্রমণের সময় জাতীয় সরকারের সৈন্যদলের লোকজন অপহরণ করল তাঁকে। কাপড়ে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে ৩/৪ মাইল দূরের সতীশচন্দ্র গুছাইতের বাড়িতে বন্দীকে রাখল রাত্রির জন্য। কি করা হবে এই সিদ্ধান্তের জন্য 'ট্রায়াল কোর্ট'-এ ঐ রাত্রিতেই তোলা হ'ল বন্দী অমলেশবাবুকে। বিচারে বন্দীকে পরের রাত্রিতে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং এক সপ্তাহের জন্য মামলা মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরের দিন বন্দীকে সরিয়ে নেওয়া হল মহিষাদল থানার দক্ষিণ কাশিমনগর গ্রামের এক বাড়িতে। তৃতীয় দিন কারাধ্যক্ষ বিচারকের নির্দেশনামা পাঠালেন অমলেশবাবুকে। নির্দেশনামায় বলা হল যে তিনি নিজে জরিমানার টাকা তিন দিনের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য পিতৃদেবকে চিঠি লিখবেন। কিন্তু শ্যামাচরণ অন্য মানুষ। টাকা পাঠাতে নির্লিপ্ত দেখে বিচারকের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আবার একবার অমলেশবাবুকে বললেন টাকা আদায় দেওয়া জন্য। গুরুত্ব বুঝে অমলেশবাবু পিতাকে চিঠি লিখে বললেন, "You are the owner of the vast property and you have large amount of bank balance, I am your poor unfortunate son like to meet you once before closing my eyes at Barabari Primary School at 3 a.m. last part of night and the Trial Court is kind enough to grant me this opportunity." এর পরেও শ্যামাচরণের কোন ভ্রূক্ষেপ না থাকায় অমলেশবাবু নিজেই

জাতীয় সরকারের সাহায্য চেয়ে বাড়ি গিয়ে নিজের জমা টাকা থেকে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাড়া পেতে চাইলেন। কিন্তু গরমদলের কিছু সদস্য চাইলেন অমলেশবাবুর বড়ভাই তমলুক কোর্টের অ্যাডভোকেট হৃষিকেশ ত্রিপাঠিকে গ্রেপ্তার করে টাকা আদায়ের জন্য ছাড়া হোক অমলেশবাবুকে। অগত্যা অমলেশবাবুর গ্রেপ্তারের ১০ দিনের মাথায় বাড়ির কাছে থেকে গ্রেপ্তার হলেন হৃষিকেশবাবু। বিনিময়ে ঐ দিন রাত্রেই মুক্তি পেলেন অমলেশ ত্রিপাঠি। কথামত অমলেশবাবু নির্দিষ্ট সময়ে দেভোগের কাছে গঙ্গেশ্বর জীউ মন্দিরে ১০০০০ টাকা জমা দিয়ে জাতীয় সরকারের বিশ্বাসে কোনরকম আঘাত না দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন জামিনে থাকা দাদা হৃষিকেশ ত্রিপাঠিকে।

আমরা এখানে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মহিষাদল থানা আদালতে উত্থাপিত এবং নিষ্পত্তি হওয়া ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মোকর্দ্দমা নং ৩৫-এর প্রতিলিপিগুলির রোজনামচা লক্ষ্য করব। এই মামলার বাদী মহিষাদলের খঞ্চির শ্রীমতী গিরিবালা দেই এবং বিবাদী কালীদহীর উপনেদ্রনাথ প্রামাণিক। এর থেকেই বোঝা যাবে স্বাধীন সরকারের বিচারের ধারা। এই বিচারের পরিচালনা করেছিলেন জাতীয় সরকারের মহিষাদল থানা আদালতের বিচারসচিব ভূতনাথ সামন্ত এবং তাঁর অন্যান্য সঙ্গী সাথীরা।

বাদিনীর আবেদন ঃ

মহামহিম শ্রীযুক্ত মহিষাদল থানা সচীব সমীপেষু

দরখাস্তকারী — শ্রীমতী গিরিবালাদেই স্বামী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা সাং খঞ্চিপং তমলুক থানা মহিষাদল ৫ নং ইউঃ (ইউনিয়ন) জেলা মেদিনীপুর।

মহাশয় ঃ

অধীনের নিবেদন এই যে,

১। গত বাং সন ১৩৩৫ সালের ১০ই আশ্বিন ইংরাজী ১৯২৮ সালের ২৬শা সেপ্টেম্বর তারিখে একখণ্ড তমসুক রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছি।

২। বিবাদী উক্ত আসল ২০০৲ টাকা মাসিক শতকরা ১।।. দেড়টাকা হিসাবে সুদ দিবার করার (কড়ার) করে।

৩। বিবাদী টাকা আদায়ের জন্য তাহার দখলী আদালতের এলাকাধীন তমলুক পং কালীদহী মৌজায় সেটেলমেন্টের মাপে ১ একর জলজমিন ৪নং ইউনিয়ন উপন্দ্রেনাথ প্রামাণিক দীং বাদীগণের নিকট দায় সংযোগ রাখিয়াছে।

৪। বাং সন ১৩৩৯ সালে কার্ত্তিকমাসে উহাকে উপরোক্ত দেনার জন্য ১ একর সম্পত্তি লইয়া রেজেষ্টারী করিয়া দেনা সমূহ খালাস যাইবে বলিয়া কয়েকজন ভদ্রলোক মীমাংসা করিয়া উপেন্দ্র দীং দলিলের সাক্ষী থাকেন। ২।১ দিন পরে রেজেষ্টারী করিতে যান। কোন কারণে রেজেষ্টারী সেই তারিখে বন্দ (বন্ধ) হইয়া যায়।

৫। দুষ্টবুদ্ধি লোকের কুপরামর্শে উপেন্দ্র নাথ দীং দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দিবে ডাকায় রেজেষ্টারী করিয়া লইব না অস্বীকার করে। ২।১ দিন পরে তিনি পরলোক গমন করেন।

৬। দুষ্টবুদ্ধি লোকের পরামর্শে আবদ্ধ দলিল ৪ বৎসরের মধ্যে নালিশ করিয়া মানিডিক্রি করিয়া মরগেজ (মর্টগেজ) ও অন্যান্য সম্পত্তিসহ ১১½ ডেঃ ক্রোক দেন পরে ঐ সব সম্পত্তি বাং (ইং) ১৯৩৩ সালে ১০০ একশত টাকার জন্য ৩.১১½ ডেঃ জমি নীলাম করিয়া লয়।

৭। বাকী ডিক্রি টাকার জন্য ইং ১৯৩৬ সালে ৪৫ ডেসি জায়গা নীলাম করিয়া লয়। একই দেনার জন্য সব সম্পত্তি নীলাম করিয়া নেয়।

৮। পুনরায় আমার আবেদন এই যে, বাং সন ১৩৪৮ সালে তমলুক কোর্টে ২৬জি এক খন্ড মামলা উত্থাপন করিয়া তাহাতে ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়া আদালত হইতে বাঁশ দখল লইয়াছি।

৯। পুনরায় উপেন্দ্র আমার তমলুক কোর্টে একখণ্ড মোজাহাম মামলা করিয়াছে। তাহাতে দিনের তারিখ আমার স্বামী তমলুক যাইতেছিল। পথিমধ্যে ব্যবত্তার হাটে উপেন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিল। অধরবাবু সেইখানে বসিয়া ছিল। উপেন্দ্র অধরবাবুকে বলিল যে, গিরিবালার স্বামী ও বেনীবাবু যাইতেছে দেখিয়া উপেন্দ্র অধরবাবুকে বলিলেন আমদের এই মামলা মীমাংসা করিয়া দেন।

১০। অধরবাবু আমাদ্গিকে ডাকিয়া বলিলেন আপনারা আরো কোর্টে এই দুর্দিনে মামলা করিতে যাইবেন। তখন আমরা বলিলাম একজন আমাদের উপর মামলা করিলে আমার কি করিব। অধরবাবু বলিলেন মামলা মীমাংসা করিয়া লইবেন কি। তখন বিবাদীর তরফ হইতে বলিলাম আপনারা ৫ জন ভদ্রলোক যাহা কিছু আছে সমূহ যদি মীমাংসা করিয়া দেন তাহা হইলে আমরা মীমাংসা মতে রাজী আছি। তাহাতে উপেন্দ্রকে অধরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। (উপেন্দ্র বলিলেন) আপনারা যাহা মীমাংসা করিবেন তাহাতে আমি রাজী আছি। বিবাদীর তরফের লোক জিজ্ঞাসা করায় কিভাবে দিন হইতে পারে, তখন আমরা বলিলাম উভয়পক্ষে অবকাশ করিলে দিন হইতে পারে।

(ক) বিবাদীর তরফ জিজ্ঞাসা করায় আমরা মীমাংসার দিন কি করিয়া জানিতে পারিব। তাহাতে অধরবাবুর বলিলেন দিন ধার্য্য করিয়া আপনাদ্গিকে খবর দেওয়া হইবে।

(খ) পুনরায় মীমাংসার খবর না পাইয়া আমরা অধরবাবুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন বাদী মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক নহে, তখন আমরা হতাশ হইয়া চলিয়া আসিলাম।

১১। ইং ১৯৩৫ সাল হইতে সে সব সম্পত্তি দেনার জন্য নীলাম হইয়াছে তাহা হাল আইন অনুযায়ী ৩৭(ক) ধারা মতে দেনা সমূহ সম্পত্তি ফিরত পাইতে পারে জানিয়া একখণ্ড দরখাস্ত ঋণশালিসী বোর্ডে করিয়াছি।

১২। সুবিচার করিয়া অধীনকে ডিক্রি দিতে আজ্ঞা হয়।

বিবাদীর জবাব ঃ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের উক্তি —

১। সন ১৩৩৫ সালে আশ্বিন মাসে বলরামপুর নিবাসী শ্রীত্রৈলক্যনাথ সাঁতরা আমাদিগের

নিকট ২০০ টাকা কর্জ্জ লইয়া ২/. বিঘা জমি আবদ্ধ দিয়াছিল ও ইতিপূর্বে কিছু জমি উক্ত ত্রৈলক্যের নিকট হইতে আমার বাবা কিনিয়াছিলেন। সেই হিসাবে আমরাও খাজনার কিছু টাকা দিতাম। কিন্তু ত্রৈলক্য খাজনা টাকা না দেওয়ায় সার্টিফিকেট হয় কিন্তু ত্রৈলক্য সার্টিফিকেটের টাকা না মিটাইয়া সার্টিফিকেট চাপরাশীকে বলে যে, আমার জমি জায়গা কিছুই নাই। মহাজন সম্পত্তি লইয়াছে। অতএব জমিন নিলাম করিয়া টাকা লইবেন। এই সংবাদ আমরা পাইয়া টাকা যোগাড়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় একদিন চাপরাশী আসিয়া আমাদের গরু টানিয়া টাকা আদায় করিয়া লয়। পরে ৭১ ধারা মতে দখল প্রার্থনা করায় ত্রৈলক্য আপত্তি করে কিন্তু সার্টিফিকেট অফিসার চাপরাশীর রিটার্ণ দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বলেন যে, তুমি ২৯ দিনের মধ্যে ৭১ ধারা মতে দখলের প্রার্থনা কর; তৎপরে ত্রৈলক্য আমার হাতে ধরিয়া অনেক স্তোকবাক্য বলিয়া আমি তোমার টাকা মিটাইয়া দিব; ভূমি দখল লইও না। এইরূপভাবে ৫৩্ (টাকা দিয়াছে)।

২। সন ১৩৩৯ সালে কার্ত্তিক মাসে আদালত বন্ধ অবস্থায় ত্রৈলক্য যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা একমাত্র কন্যা ও জামাতা ওয়ারীশ স্বত্ত্বেও জামাতাকে দানপত্র, ভাগিনেয়গণকে বিক্রয় কোবলা ও জ্ঞাতি দুইজনকে না-দাবী সৃজন করে। পরে আমি জানিতে পারিয়া টাকা চাহিতে গেলাম। তাহাতে তিনি বলেন যে, আমি আর কি করিব। আমার আর কিছুই না। তোমার আবদ্ধর মূলে ১।।. বিঘা রাখিয়াছি। তুমি ঐ ১।।. বিঘা রেষ্ট্রি করিয়া লও। তখন জানিলাম যে ঐ আমার বাবাকে যে দুই বিঘা আবদ্ধ দিয়াছিল তাহার কিছু সম্পত্তিও আমাদের আবদ্ধর পূর্বে মোক্ষদা চরণ সামন্তকে আবদ্ধ দিয়াছে আর কিছু সম্পত্তি ভূপতি চরণ মিশ্রকে সুদ পত্তনি দিয়াছে। এমতাবস্থায় বুঝিয়া দেখিলাম যে বর্তমানে ১।।. বিঘা সম্পত্তির মূল্য ৮০/৯০ টাকা। কিন্তু সুদে আসলে ও সার্টিফিকেটের আর ধান্য খড়ের হাবালৎ টাকা প্রায় ৫০০ টাকার উপর। অতএব যদি যাহা হউক রেষ্ট্রি করিয়া না লই তাহা হইলে আমাকে বেগ পাইতে হইবে। কারণ ত্রৈলক্য মুমূর্ষু অবস্থা আর তখন কোর্ট বন্ধ। এখন অগত্যা ত্রৈলক্যের মতানুসারে ঐ রেষ্ট্রি করিতে গেলাম। কিন্তু রেষ্ট্রি হইল না, ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর আদালত খুলিল তখন উকিলের নিকট পরামর্শ লইলাম কি করি। তাঁহারা বলিলেন অগ্রিম ক্রোক করিলে তোমার টাকা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত রেষ্ট্রি হইবে না। কিন্তু এদিকে মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে জানিয়া উহারা অর্থাৎ জামাই, ভাগিনেয় জ্ঞাতিগণ অতিসত্বর দলিল রেষ্ট্রি করিয়া লইল। অগ্রিম ক্রোকের পূর্বে রেষ্ট্রি হওয়ায় অগ্রিম ক্রোক কার্যকরী হইল না। এদিকে আবদ্ধমূলে অগ্রিম ক্রোক হইতে পারে না। ও আবদ্ধর কিছু সম্পত্তি পূর্বে আবদ্ধ দিয়াছে ও আর কিছু পত্তনি দিয়াছে। এই অবস্থায় শুধু টাকার ডিক্রি করা হইল। উক্ত ডিক্রিকালীন ত্রৈলক্য রেষ্ট্রি করিয়া আসার প্রায় দিন দুই পরে মারা যাওয়ায় ত্রৈলক্যের কন্যা গিরিবালাকে ও স্বামী সুরেন্দ্রনাথ জানাকে সাং খঞ্চি বিবাদীকে পক্ষ করিয়া মোকদ্দমা চালাইয়া অনেক রকমভাবে মীমাংসার পর কথাবার্ত্তা হইয়া বিবাদী স্বীকার না করায় দেওরফা বিচারে ৪১৪।।৯

আনায় ডিক্রি হইল। এদিকে আমরা ডিক্রির টাকা না পাওয়ায় টাকার মূলে ত্রৈলক্যের নামিত ৩এঃ ১১^{১}/$_{২}$ ডেঃ জমি নীলাম করাইলাম। আর মুনসেফ সার্টিফিকেটের ৫৩্ টাকা দাবী তুলিয়া লইয়া পরে করিতে বলিলেন। এদিকে ল্যান্ডলর্ডফিরওয়ে ৩এঃ ১১^{১}/$_{২}$ ডেঃ জমি ১০০ টাকা মূলে খাসডাকে ধরিলাম কারণ স্থিতিবান সম্পত্তি শতকরা ২০ টাকা ফি। যাহা হউক আমি নিলাম দখলকালে জামাতা দানপত্রয়ালা, ভাগিনেয় বিক্রয়কোবলাআলা, জ্ঞাতি দুইজন নাদাবীআলা পত্তনাদার ভূপতি মিশ্র মোজাহেমদের মোজাহেমকালে আমরা ভূপতি মিশ্রকে সোলেনামা করিয়া দিলাম যে, আপনারা টাকা না মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত আপনার দখলে থাকিবে। আর ৪ জন মোজাহেমে পরাস্ত হইয়াও দখল না দেওয়ায় আমার নীলাম খরিদা সম্পত্তি স্বত্ব স্বাবস্থ্য মতে দখল পাওন বাবত মোকদ্দমা করিলাম। তাহাতে দোতরফা বিচারে উক্ত দলিলকারীগণ পরাজিত হইল। তৎপরে আমরা ৪ ভাই সবধার পৃথক হইয়া আমি মধ্যম উপেন্দ্র বলরামপুর বা কালীদহীতে গেলাম। সেখানে যাইয়া আমার অংশ মত বলরামপুরের সমস্ত জমিনাদি লইয়া ঐ ত্রৈলক্যের জ্ঞাতিগণ একটা ইজমালী জোত লইয়া বিরোধ করায় তাহাও মীমাংসা করিয়া অংশনামা করিয়া লইয়া এতাবৎ দখলদার আছি। পত্তনি খালাস আইনের কিছুদিন পূর্বে আমরা ভূপতি মিশ্রের নিকট পত্তনি খালাস করিয়াছি, ও জমিন দখল করিতেছি।

গত বৎসর গিরিবালা দেই স্বামী সুরেন্দ্রনাথ জানা সাং-খঞ্চি ভূপতি মিশ্রর বিরুদ্ধে নন্দকুমার শালিসবোর্ডে পত্তনি খালাসের একটি কেস করে। সেখানে কিছু না হওয়ায় আদালত করে। পরে ১০।৭।৪২ তারিখে আমার দখলী সম্পত্তির উপর বাঁশ দখল নেয়। তখন আমি মোজাহেম দিলাম। তখন গিরিবালা নন্দকুমার শালিসী বোর্ডে আবার মোকদ্দমা রুজ্জু করিয়া স্টে অর্ডার লইয়া আদালতের মোকদ্দমা স্থাপিত (স্থগিত) রাখিবার চেষ্টা করে, একদিন আমি ও সুরেন্দ্র জানা মোকদ্দমার দিন ছিল, সেই জন্য তমলুক গিয়াছিলাম, সেই অবকাশে গিরিবালার মোকদ্দমার তদ্বিরকারক খঞ্চি গ্রামনিবাসী বাবু বেণী মাধব জানা জন ১৫।১৬ লোক লইয়া আসিয়া আমার আবাদী জমি ঐ সুদপত্তনি ১/. বিঘা জমিবাদে আরও ৪।৫ কাঠার জমির ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তৎপরে ২০।১।৪৩ তারিখে যখন উহাদের অনেক আইনদেখান সত্ত্বেও মুন্সেফ অর্ডার দিলেন যে;এ কেশ (স) শালিসবোর্ডে হইতে পারে না তখন নিরুপায়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসে মোকদ্দমা দিলেন। আদালত হইতে উক্ত মোকদ্দমার দিন থাকিল ২০শা ফেব্রুয়ারি। আর আমাকে মোকদ্দমাকে দিন তিনেক থাকিতে সংবাদ দিলেন যে তুমি মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দাও। আমরা মোকদ্দমা মীমাংসা করিয়া দিব। এতদাবস্থায় আমি কি করি। কারণ পূর্বে কোনরূপভাবে আমি বা জনসাধারণ জানে নাই যে আপনারা বিচারাদি করিতেছেন।

বিচারকের রোজনামচাঃ

মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার

মোকদ্দমা নং - ৩৫ মহিষাদল থানা

আদেশ লিপি

বাদী-শ্রীমতী গিরিবালা দেই সন ১৯৪৩ বিবাদী- শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং খঞ্চি সাং কালীদহী

তারিখ	আদেশের মর্ম	
১ ৯।২।৪৩	অদ্য বাদিনী শ্রীমতি গিরিবালা দেই ও শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক বিবাদী উল্লেখে একটি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইলাম। ১৪/২/৪৩ তাং এর মধ্যে বিবাদীকে জবাবের নোটিশ জারি করা হউক। আগামী ২৮।২।৪৩ তাং জবাবের দিন ধার্য্য করা হইল।	অদ্য ২৮।২।৪৩ তাং জবাবের দিন ধার্য্য করিয়া ১৪।২।৪৩ তাং নোটিশ জারী করা হইল।(পত্র-১) ১৭।২।৪৩ তাং-এ একটি ফেরত নোটীশ পাইলাম।
২৮।২।৪৩	অদ্য বাদিনীর পক্ষে তাহার স্বামী শ্রী সুরেন্দ্র নাথ জানা উপস্থিত। বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই। এবং জবাব দাখিল করেন নাই। কিন্তু বিবাদীকে নোটিশে জানান হইয়াছিল যে ২০।২।৪৩ তাংএ কোর্টে যে মামলা দায়ার (দায়ের) আছে তাহাতে উপস্থিত না হইয়া (হইলে) খারিজ করিয়া দিবে।	

তারিখ	আ[illegible]ার মর্ম	
	সেই মূলে বাদীপক্ষ কোর্টে যায় নাই। কিন্তু জানা গেল বিবাদী কোর্টে হাজির হইয়া একতরফা করিয়া লইয়াছে। অতএব বিবাদীকে ডাকাইয়া ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিণের জন্য আগামী ২৮।৩।৪৩ তাং দিন ধার্য্য করা হইল।	
৩ / ২৮।৩।৪৩	অদ্য বাদিনী পক্ষে স্বামী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা উপস্থিত হয়েন নাই। অতএব ৬।৪।৪৩ তাং এর মধ্যে বিবাদীকে কৈফিয়তের নোটিশ জারী করা হউক। আগামী ১২।৪।৪৩ তাং দিন ধার্য্য করা হইল।	১২।৪।৪৩ তাং মধ্যে কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য ৫।৪।৪৩ তাং নোটিশ দেওয়া হইল। (পত্র-২) ৭।৪।৪৩ তাং ফেরত নোটিশ পাইলাম।
৪ / ১২।৪।৪৩	অদ্য বাদিনী পক্ষে তাহার স্বামী শ্রীসুরেন্দ্র নাথ জানা উপস্থিত বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই। কৈফিয়তের কোন জবাবও দাখিল করেন নাই। কৈফিয়তের নোটিশটি লটকাইয়া জারী হওয়ায় আবার ৭ দিনের মধ্যে বিবাদীকে নোটিশ জারী করা হউক। আগামী ২৪।৪।৪৩ তাং-এ দিন ধার্য্য করা হইল।	২১।৪।৪৩ তাং দিন ধার্য্য করিয়া ১৯।৪।৪৩ তাং-এ নোটিশ দেওয়া হইল (পত্র-৩)। ২০।৪।৪৩ তাং ফেরত নোটিশ পাইলাম। ও বিবাদীর জবাব ও ক্ষীরোদ -বাবুর লিখিত একটি চিঠি প্রাপ্ত হইলাম। (পত্র-৪)।
৫ / ২১।৪।৪৩	অদ্য বাদিনীপক্ষে তাহার স্বামী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা উপস্থিত। বিবাদী ২০।৪।৪৩ তাং-এ একটি জবাব দাখিল করিয়াছে। এবং সেই সঙ্গে বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতির একটি চিঠি	২১।৪।৪৩ তাং বেলা ১১টার সময় নোটিশ জারী করিবার জন্য পাঠান হইল। (পত্র-৫)। বেলা ১২টার সময় ফেরত নোটিশ পাইলাম।

তারিখ	আদেশের মর্ম	মন্তব্য
	পাঠাইয়াছে। উক্ত চিঠি পড়িয়া অবগত হইলাম যে বিবাদী ক্ষীরোদবাবুর দ্বারা নিষ্পত্তি চান। তন্মুলে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, ক্ষীরোদবাবুকে বিবাদী সরকারের কোর্টে আনিয়া তাহার দ্বারা আপোষ মীমাংসা করিতে পারেন। কিন্তু সরাসরি তাঁহার নিকট আমরা ফাইল অথবা বাদীপক্ষকে পাঠাইতে পারি নাই। তাহাতে আমাদের সরকারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না। অতএব অদ্যই বেলা ৮টার সময় নোটিশ দেওয়া হউক। বৈকাল ৪টার সময় উক্ত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হইবে। পরে বেলা ৪টার সময় বিবাদী ক্ষীরোদবাবুকে সঙ্গে লইয়া বিচার বৈঠকে উপস্থিত হইলেন। বাদী পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ জানা ও বেনীমাধব জানা উপস্থিত আছেন। ক্ষীরোদবাবুর সাক্ষাতে উভয় পক্ষের মোকদ্দমা আলোচনা হইল। ক্ষীরোদবাবু আপোষ মীমাংসা করিয়া দিবেন বলিয়া সময় চাহিলেন। তাঁহার কথামতে আগামী ২২।৫।৪৩ তাং দিন ধার্য্য করা হইল। শ্রীভূপতি সামন্ত বি. স.	

তারিখ	আদেশের মর্ম	মন্তব্য ঃ
৬ / ২২।৫।৪৩	অদ্য বাদীপক্ষে তাহার স্বামী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা উপস্থিত। কিন্তু বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই। বাদীপক্ষের নিকট জানা গেল ক্ষীরোদবাবু কোন নিষ্পত্তি করেন নাই। সেইজন্য ক্ষীরোদবাবুর নিকট ইহার প্রকৃত ব্যাপার জানবার জন্য লোক পাঠান হইল। আগামী ৮।৬।৪৩ তাং-এ দিন ধার্য্য করা হইল। (স্বাক্ষর) বিঃ সঃ	
৭ / ৮।৬।৪৩	অদ্য বাদিনী উপস্থিত, এবং বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই। ক্ষীরোদবাবু উপস্থিত হইয়া বলিলেন বিবাদীর অন্তঃকরণ অতীব খারাপ। তাহাতে আপোষ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবে না। এক্ষণে উক্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ৮ দিনের মধ্যে বিবাদীকে নোটিশ জারী করা হউক। আগামী ২৫।৬।৪৩ তাং দিন ধার্য্য করা হইল। স্বাক্ষর বিঃ সঃ	২৫।৬।৪৩ তাং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ১৬।৬।৪৩ তাং নোটীশ দেওয়া হইল। (পত্র-৬) ২০।৬।৪৩ তাং ফেরত নোটিশ পাইলাম।

তারিখ	আদেশের মর্ম	মন্তব্য ঃ
৮ ২৫।৬।৪৩	অদ্য বাদিনী পক্ষ উপস্থিত। বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই। যে বিবাদীকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নোটিশজারী করা হইয়াছিল তাহা লটকাইয়া জারী করা হইয়াছে। তজ্জন্য আবার বিবাদীকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নোটিশ জারী করা হউক। আগামী ৪।৮।৪৩ তাং দিন ধার্য্য করা হইল। স্বাক্ষর বিঃ সঃ	৪।৮।৪৩ তাং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ১।৮।৪৩ তাং নোটিশ দেওয়া হইল। (পত্র-৭)। ৩।৮।৪৩ তাং ফেরত নোটীশ পাইলাম।
৯ ৪।৮।৪৩	অদ্য বাদিনীপক্ষ উপস্থিত। বিবাদী নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত হয়েন নাই। বিবাদী বার বার নোটীশ অমান্য করিতেছে। বিবাদী ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা হউক আবার একবার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নোটীশ দেওয়া হউক। আগামী ৮।৯।৪৩ তাং দিন ধার্য্য করা হইল। স্বাক্ষর বিঃ সঃ	৮।৯।৪৩ তাং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ৩।৯।৪৩ তাং নোটীশ দেওয়া হইল। (পত্র-৮) ৬।৯।৪৩ তাং ফেরত নোটীশ পাইলাম।

তারিখ	আদেশের মর্ম	মন্তব্য ঃ
১০ ৮।৯।৪৩	অদ্য বিবাদী উপস্থিত। বাদিনীপক্ষে তাহার স্বামী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা উপস্থিত এবং বেণীমাধব জানা উপস্থিত। বিবাদীর পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক ও শশীভূষণ প্রামাণিক উপস্থিত। বিবাদী অনেকবার জাতীয় সরকারের অবমাননা করিয়াছে এই কথা আলোচনা হয়। তৎপরে মামলা সম্বন্ধে বাদী ও বিবাদীর মধ্যে আলোচনা হওয়ায়, বিবাদী উদ্ধতভাবে বাদীপক্ষের ভদ্রমহোদয় বেণীবাবুর সঙ্গে নানান বচসা করিতে আরম্ভ করে। ঐ প্রসঙ্গে প্রকাশ হইল যে বিবাদী জাতীয় সরকারের নোটীশ পুলিশকে দেখাইয়াছে। এবং উক্ত মোকদ্দমা বেণীবাবু যে তদ্বির করিতেছে তাহাও পুলিশকে জানায়, এই কথা বিবাদীও স্বীকার করিল। এই সব কথায় অনেক রাত্রি হওয়ায় বিচারকার্য্য বন্ধ হইল। তবে এই কথা হইল যে, বিবাদীর উদ্ধতভাব প্রকাশ জন্য সরকার ৫ অর্থদণ্ড করিলেন; আগামী দিনে উক্ত দন্ডের টাকা অগ্রিম দাখিল করিলে বিচার কার্য্য করা হইবে। আগামী ১৯।৯।৪৩ তাং-এ দিন ধার্য্য করা হইল। স্বাক্ষর বিঃ সঃ	

তারিখ	আদেশের মর্ম	মন্তব্য ঃ
১১ ১৯।৯।৪৩	অদ্য বাদিনীর পক্ষে তাহার স্বামী সুরেন্দ্রনাথ জানা উপস্থিত বিবাদী সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত হয় নাই। বিবাদী বারবার এইভাবে জাতীয় সরকারের অবমাননা করিতেছে। সেইজন্য সরকার হইতে বিবাদীকে ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড করা হইল। উক্ত দন্ড টাকা আদায় দেওয়ার জন্য বিবাদীকে নোটীশ দেওয়া হউক, আগামী ২৬।৯।৪৩ তাং দিন ধার্য্য করা হইল। স্বাক্ষর বিঃ সঃ	২০।৯।৪৩ তাং বিবাদীকে জরিমানার নোটিশ জারী করিতে যাওয়ায় নোটীশের মর্ম অবগত হইয়া নোটীশ গ্রহণ করে নাই। (পত্র-৯) ফেরত নোটীশখানি ২১।৯।৪৩ তাং প্রাপ্ত হইলাম।
১২ ২৬।৯।৪৩	অদ্য বাদিনীর পক্ষে তাহার স্বামী সুরেন্দ্রনাথ জানা উপস্থিত। বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই এবং জরিমানা টাকাও আদায় দেয় নাই। অতএব বিবাদীর মালক্রোক করিয়া জরিমানার টাকা আদায় করা হউক। এই আদেশ বিদ্যুৎ বাহিনীর নিকট পাঠান হইল। আগামী ২৬।১১।৪৩ তাং দিন ধার্য্য করা হইল। স্বাক্ষর বিঃ সঃ	
১৩ ২৬।১১।৪৩	অদ্য বাদিনীপক্ষ উপস্থিত। বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই। বিদ্যুৎ বাহিনীর উক্ত মালক্রোকের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলাম। আগামী ৮।২।৪৪ তাং দিন ধার্য্য করা হইল। স্বাক্ষর বিঃ সঃ	

তারিখ	আ মর্ম	মন্তব্য ঃ
১৪ ৮।২।৪৪	অদ্য উভয় পক্ষ উপস্থিত। বিবাদী পক্ষে ভদ্রমহোদয় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক ও বাবু শশীভূষণ প্রামাণিক উপস্থিত। মোকদ্দমা সম্বন্ধে আনুপূর্বিক আলোচনা হইল। তাহাতে বিবাদীর সমূহ দোষ প্রতিপন্ন হইল। পরে আসল মোকদ্দমার সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় প্রতীয়মান হইল বিবাদী সত্যিকার শঠতা করিয়া মনিডিক্রি করিয়া বহুমূল্যের সম্পত্তি অল্পদামে নীলাম ক্রয় করিয়াছে। আরও প্রতীয়মান হইল বিবাদী বাদীগণকে অনেক স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া শঠতা করিয়াছে। প্রকৃত সত্য প্রকাশ হইলে বিবাদী সমূহ স্বীকার করিল। তখন উভয় পক্ষ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিকের উপর মীমাংসা ভার দিতে রাজী হইলেন। এবং জরিমানার টাকাও মীমাংসা করিয়া দিবেন স্বীকার করিলেন। পরে ঈশ্বরবাবু সময় প্রার্থনা করায় আগামী ৮।৩।৪৪ তাং দিন ধার্য্য করা হইল। স্বাক্ষর বিঃ সঃ	
১৫ ৮।৩।৪৪	অদ্য উভয় পক্ষ উপস্থিত। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিকও উপস্থিত। প্রথমতঃ আমাদের জরিমানা টাকা মীমাংসার জন্য ঈশ্বরবাবু অনুরোধ করায় আমি বলিলাম বিবাদী যদি প্রকৃত অনুতপ্ত হন	

তারিখ	আদেশের মর্ম	মন্তব্য ঃ
	সেখানে আমাদের টাকার কোন আবশ্যক হয় নাই। মোট কথা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা কৃতসংকল্প। যে অবস্থায় জরিমানা সম্বন্ধে আপনি যাহা ব্যবস্থা করিবেন তাহাতেই আমাদের কোন আপত্তি হবে না। তন্মুলে ঈশ্বরবাবু জরিমানার জন্য ৫০ টাকা দিলেন। পরে উভয় পক্ষ আপোষ আলোচনা মুলে এই অবস্থায় উপস্থিত হইল যে, বাদীপক্ষ ৩০০ টাকা চাহিলেন এবং বিবাদী ২৫০ টাকা দিতে রাজী হইলেন। এই অবস্থায় বহু সময় অতীত হওয়ায় বিবাদী আমার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, আমি আমাদের জরিমানার টাকা হইতে ২৫ টাকা বাদী পক্ষকে প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলাম। তখন উভয়পক্ষ আনন্দিত হইয়া সরল অন্তঃকরণে আমার নিকট একটা রাজীনামা দাখিল করিলেন। রাজীনামাটি ফাইলভুক্ত করা হইল। এবং বিবাদীর ক্রোকমাল ফেরত দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ বাহিনীর নিকট আদেশ পাঠান হইল। এমতাবস্থায় অত্র রাজীনামামূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্যে রেকর্ড করা হইল। স্বাক্ষর বিঃ সঃ	

মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার

মোকর্দ্দমা নং ৩৫ মহিষাদল থানা

আদেশ-লিপি

বাদী শ্রীমতী নির্মলাবালা দেই সাং [illegible] সন ১৩৪৯ বিবাদী শ্রীউপেন্দ্র নাথ প্রামানিক সাং [illegible]

তারিখ	আদেশের মর্ম	মন্তব্য
১ / ৩।২।৪৩	অদ্য বাদিনী শ্রীমতী নির্মলাবালা দেই ও শ্রীউপেন্দ্র নাথ প্রামানিক বিবাদী উভয়ের একটি মামলা দায়ের হইলো। ১৪।২।৪৩ অদ্য পর্য্যন্ত বিবাদীকে জবাবের নোটিশ জারী করা হউক আগামী ২৮।২।৪৩ অদ্য দিন ধার্য্য করা হইল,	অদ্য ২৮।২।৪৩ অদ্য জবাবের দিন ধার্য্য করিয়া ১৪।২।৪৩ অদ্য নোটিশ জারী করা হইল ১৭।২।৪৩ অদ্য ১ খানি ফেরত নোটিশ পাইলাম
২ / ২৮।২।৪৩	অদ্য বাদিনীর পক্ষে তাহার স্বামী শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ উপস্থিত, বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই, এবং জবাব দাখিল করেন নাই, কিন্তু বিবাদীকে নোটিশে জানান হইয়াছিল যে ২০।২।৪৩ অদ্য কোর্টে যে মামলা হইবে অদ্য তাহাতে উপস্থিত না হইলে একতরফা বিচার হইবে, বর্তমানে বাদিনীর কোর্টে মামলা, কিন্তু [illegible] বিবাদী কোর্টে হাজির হইলে [illegible] করিয়াছে, অতএব বিবাদীকে আর একবার সুযোগ দেওয়ার জন্য আগামী ২৮।৩।৪৩ অদ্য দিন ধার্য্য করা হইল,	
৩ / ২৮।৩।৪৩	অদ্য বাদিনীপক্ষে তাহার স্বামী শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ উপস্থিত, বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই, অতএব ১।৪।৪৩ অদ্য মধ্যে বিবাদীকে রেজিস্টারি নোটিশ জারী করা হউক, আগামী ৯।৪।৪৩ অদ্য দিন ধার্য্য করা হইল,	১।৪।৪৩ অদ্য মধ্যে রেজিস্টারি করিবার জন্য ৫।৪।৪৩ অদ্য নোটিশ দেওয়া হইল, ৭।৪।৪৩ অদ্য ফেরত নোটিশ পাইলাম,
৪ / ৯।৪।৪৩	অদ্য বাদিনীপক্ষে তাহার স্বামী শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ উপস্থিত, বিবাদী উপস্থিত হয়েন নাই, রেজিস্টারির কোন জবাবও দাখিল করেন নাই, রেজিস্টারি নোটিশটি [illegible] রহিয়াছে। আজ ৭ দিনের মধ্যে বিবাদীকে নোটিশ জারী করা হউক, আগামী ২৭।৪।৪৩ অদ্য দিন ধার্য্য করা হইল,	২৭।৪।৪৩ অদ্য দিন ধার্য্য করিয়া ১৩।৪।৪৩ অদ্য নোটিশ দেওয়া হইল, ২০।৪।৪৩ অদ্য ১ খানা ফেরত নোটিশ পাইলাম, ও বিবাদীর জবাব ও [illegible] বাবুর লিখিত ১ খানি চিঠি পাইলাম
৫ / ২৭।৪।৪৩	অদ্য বাদিনীপক্ষে তাহার স্বামী শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ উপস্থিত, বিবাদী ২০।৪।৪৩ অদ্য একটি জবাব পাঠাইয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে [illegible] বাবু একটি চিঠি পাঠাইয়াছেন, উক্ত চিঠি পড়িয়া অবগত হইলাম যে, বিবাদী [illegible] বাবুর মত নিজেই চান, অনুরূপ এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, [illegible] বাবুকে বিবাদী সরকারের কোর্টে আসিয়া তাহার মত আপোষ মীমাংসা করিতে পারেন, কিন্তু সরকারী [illegible] আমাদের [illegible] বাদিনীর [illegible] কোন কার্য [illegible] তাহাতে আমাদের সরকারের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, অতএব অদ্যই বেলা ৮টার সময় নোটিশ দেওয়া হউক, বেলা ৪টার সময় উভয়পক্ষের উপস্থিতি নির্দ্দেশ করা হইল, পরে বেলা ৪টার সময় বিবাদী [illegible] বাবুর সহিত লইয়া উপস্থিত হইলেন। বাদী পক্ষে পূর্ণেন্দু নারায়ণ ও শ্রীমতী [illegible] উপস্থিত আছেন, [illegible] বাবু উভয়পক্ষের মোকদ্দমা আপোষে মীমাংসা করিয়া দিবেন বলিয়া সময় চাহিলেন, উহাতে মঞ্জুর আগামী ২৯।৫।৪৩ অদ্য দিন ধার্য্য করা হইল, [illegible]	২৭।৪।৪৩ অদ্য বেলা ৮টার সময় নোটিশ জারী করিবার জন্য দেওয়া হইল বেলা ২টার সময় ফেরত নোটিশ পাইলাম,

রাজীনামা পত্র

বাদী	বিবাদী
শ্রীমতী গিরিবালা জানা	শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
স্বামী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা	সাং কালীদহী
সাং খঞ্চী ৫ নং	প্রকাশিত বলরামপুর ৪ নং

কস্য রাজীনামাপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে
আমরা বাদী ও বিবাদী পঞ্চজনার মীমাংসামতে
নিম্নলিখিতভাবে আপোষ নিষ্পত্তি করিলাম, যথা —

১। আমি বিবাদী স্বীকার করিতেছি যে, বাদীর দাবীকৃত সম্পত্তির মূল্য স্বরূপ রফা ছাড় চুক্তিবাদে মঃ ২৭৫ টাকা বাদীর পাওনা সাব্যস্থ হইল। বর্তমান নগদ ২৫৲ টাকা মিটাইয়া দিলাম। বাকী ২৫০৲ টাকা আগামী ১৫ই মার্চ বুধবার এককালীন আদায় দিব। যদি চুক্তি ভঙ্গ করি উপরোক্ত টাকার দ্বিগুণ টাকা আদায় দিতে বাধ্য থাকিব। উক্ত টাকা জাতীয় সরকারের কোর্টে আদায় দিব।

২। আমি বাদিনী উপরোক্ত ১ দফার সমূহ স্বত্ত্বে স্বীকৃত ও বাধ্য থাকিলাম। বিবাদীর উপর যে সম্পত্তির দাবী করিয়াছিলাম তাহার আর কোন দাবী দাওয়া থাকিল না। যদি উপরোক্ত চুক্তি ভংগ করি জাতীয় সরকারের আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইব।

শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামানিক
শ্রীমতী গিরিবালা জানা
স্বামী শ্রী সুরেন্দ্রনাথ জানা

৩। অতএব প্রার্থনা যে রাজীনামা মূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি। ৮।৩।৪৪

সাক্ষী

ইন্দু,

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র প্রামানিক
সাং আলাশুলি,
শ্রীশশীভূষণ প্রামানিক
Nagendra Nath Bera,
Haripur, Tamluk

'নোটীশ'

(পত্র নং-১)

দরখাস্তকারিনী

শ্রীমতি গিরিবালাদেই	বিবাদী
স্বামী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা	শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং খঞ্চি	সাং কালীদহী
থানা মহিষাদল	থানা মহিষাদল

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারিনী নোটিশের পৃষ্ঠের সকল আর্জি অনুসারে দরখাস্ত করিয়াছে। ঐ সম্বন্ধে যদি আপনার কোন বলিবার থাকে তাহলে মহিষাদল থানার অন্তর্গত যে কোন কংগ্রেস অফিসে লিখিতভাবে জানাইলে আগামী ২৮।২।৪৩ তাং এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দিন ধার্য্য করিব। আরও এই আর্জিতে প্রকাশ আছে যে তমলুক কোর্টে এই মোকদ্দমা চলিতেছে। এবং ২০।২।৪৩ তাং উহার দিন আছে। অতএব উক্ত দিনে হাজির না হইয়া মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিবেন। ২৮।২।৪৩ তাং মধ্যে আপত্তি দাখিল না করিলে বা ২০।২ তাং কোর্টে হাজির মোটকথা জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিলে জাতীয় সরকারের দন্ডবিধি আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় হইবেন।

ইতি ১৪।২।৪৩

নীলমনি হাজরা

অধিনায়ক

মহিষাদল থানা জাতীয় সরকার

(পত্র—২)

'নোটীশ'

বিবাদী
শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং কালীদহী
থানা মহিষাদল

এতদ্দারা আপনাকে জানান যায় যে, বাদিনী গিরিবালা দেই জাতীয় সরকারের আদালতে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়াছিল। আপনি নোটীশ পাওয়া সত্ত্বেও জাতীয় সরকারের আদেশ অমান্য করিয়াছেন তাহার সন্তোষজনক উত্তর নোটীশ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে জাতীয় সরকারের আদালতে দাখিল করিবেন। অন্যথায় সরকারের দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হইবে।

৫।৪।৪৩ শ্রীভূতনাথ সামন্ত
বিচারসচীব
মহিষাদল থানা জাতীয় সরকার

বিবাদীর দেখা না পাইয়া অত্র সমন নিম্নের ২ জন সাক্ষী রাখিয়া সমন লটকাইয়া দিলাম।
শ্রীরামচন্দ্র কর
সাং ইড়লা
৬।৪।৪৩

(পত্র—৩)

'নোটীশ'

বাদী
শ্রীমতী গিরিবালা জানা
খঞ্চি

বিবাদী
শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং কালীদহী

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ২১।৪।৪৩ তারিখে আপনার মোকদ্দমার দিন ধার্য্য আছে। উক্তদিন আপনি জাতীয় সরকারের আদালতে হাজির হইবেন। অন্যথায় জাতীয় সরকারের দণ্ডবিধি, আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে।

ইতি ১৯।৪।৪৩

শ্রীভূতনাথ সামন্ত
বিচারসচীব
মহিষাদল থানা জাতীয় সরকার

(পত্র নং ৩-এর উল্টোদিক)
আমি উক্ত মোকদ্দমার দিন হাজির হইব বলিয়া নোটিশ গ্রহণ করিলাম।

শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং কালীদহী
১৯।৪।৪৩

(পত্র—৪)

ব্যবত্তার হাট

প্রিয় ভুতবাবু,

আপনি শ্রীমতী গিরিবালা দেই বাদী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ প্রামাণিক নামে যে কারণ দর্শাইবার নোটিশ জারী করিয়াছেন তাহা বিবাদী আমার নিকট উপস্থিত করিয়াছে, ঐ বিচার একবার আমার দ্বারা হইয়াছে। সেজন্য অনুরোধ উহার নিষ্পত্তির তারিখ আরও দুই সপ্তাহ পিছাইয়া আমার উপর দিতে অনুমতি করিবেন। — ইতি

আপনাদের

শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

২০।৪।৪৩

(পত্র—৫)

‘নোটীশ’

বাদী
শ্রীমতী গিরিবালা জানা
সাং খঞ্চি

বিবাদী
শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং কালীদহী

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, আজকে যে আপনার মোকদ্দমার দিন ধার্য্য আছে এদিন আর পিছালে চলিবে না। যদি আপনি দরকার মনে করেন ক্ষীরোদবাবুকেও ডাকাতে পারেন, কিন্তু ক্ষীরোদবাবু না যদি আসেন তাহলেও আপনাকে হাজির হইতে হইবে। অন্যথায় সরকারের আইন অনুযায়ী উক্তমামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এবং আপনার কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইবে। ইতি ২১।৪।৪৩

শ্রী ভূতনাথ সামন্ত
বিচার সচীব
মহিষাদল থানা. জাতীয় সরকার

(পত্র নং ৫-এর উল্টোদিক)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং কালীদহী —
আমি হাজির হইব বলিয়া
নোটীশ গ্রহণ করিলাম । ইতি ২৮।৪।৪৩

(পত্র—৬)

'নোটীশ'

বাদিনী
শ্রীমতী গিরিবালা দেই
সাং খঞ্চি

বিবাদী
শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং কালীদহী

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, শ্রীগিরিবালা দেই বাদী হইয়া আপনার বিরুদ্ধে জাতীয় সরকারের আদালতে বিচার প্রার্থনা করিয়াছে। উক্তমোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আগামী ২৫।৬।৪৩ তাং দিন ধার্য হইয়াছে। জারী কারকের নিকট স্থান জানিয়া লইবেন। অতএব আপনি উক্তদিন আপনার প্রমাণ ও সাক্ষ্যআদি লইয়া উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় জাতীয় সরকারের আইন অনুযায়ী বিচার করা হইবে।

ইতি ১৬।৬।৪৩

শ্রীভূতনাথ সামন্ত
বিচার সচীব
মহিষাদল থানা জাতীয় সরকার

(পত্র নং ৬-এর উল্টোদিক)
দক্ষিণদুয়ারী বাড়ীর সমানে নিম্নলিখিত সাক্ষীর সাক্ষাতে লটকাইয়া জারী করিলাম।
শ্রীষড়ানন দত্ত
ইং তাং ১৯।৬।৪৩
Radhakrishna Acharjya
(Vill) : Puyada
Tamluk 19.6.43

(পত্র—৭)

'নোটীশ'

বাদিনী
শ্রীমতী গিরিবালা জানা
সাং খঞ্চি

বিবাদী
শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং কালীদহী

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, শ্রীগিরিবালা দেই বাদী হইয়া আপনার বিরুদ্ধে জাতীয় সরকারের আদালতে বিচার প্রার্থনা করিয়াছে। উক্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আগামী ৪।৮।৪৩ তাং দিন ধার্য্য রহিয়াছে। জারী কারকের নিকট স্থান জানিয়া লইবেন। অতএব আপনি উক্ত তারিখে সাক্ষ প্রমাণাদিসহ উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় সরকারের আইন অনুযায়ী বিচার হইবে। ইতি ১।৮।৪৩।

শ্রীভূতনাথ সামন্ত
বিচার সচীব
মহিষাদল থানা জাতীয় সরকার

(পত্র নং ৭-এর উল্টোদিক)

৩।৮।৪৩

শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক

সাং বলরামপুর

আমি কল্য হাজির হইব বলিয়া
নোটিশ গ্রহণ করিলাম। ইতি

(পত্র—৮)

'নোটীশ'

বাদিনী	বিবাদী
শ্রীমতী গিরিবালা জানা	শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং খঞ্চি	সাং কালীদহী

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, শ্রীগিরিবালা দেই বাদী হইয়া আপনার বিরুদ্ধে জাতীয় সরকারের আদালতে বিচার প্রার্থনা করিয়াছে। উক্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আগামী ৮।৯।৪৩ তাং দিন ধার্য্য আছে। জারী কারকের নিকট স্থান জানিয়া লইবেন। অতএব আপনি উক্ত তারিখে প্রমাণাদি সহ উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় জাতীয় সরকারের আইনানুযায়ী বিচার করা হইবে। ইতি ৩।৯।৪৩

শ্রীভূতনাথ সামন্ত
বিচার সচীব
মহিষাদল থানা জাতীয় সরকার

(পত্র নং ৮-এর উল্টোদিক)

অত্র সময় নোটিশ পাইয়া
হাজির রসিদ লিখিয়া দিলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
আলাশুলী,
৬।৯।৪৩

(পত্র—৯)

'নোটীশ'

শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
সাং কালীদহী
৪ নং ইউ মহিষাদল

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, শ্রীগিরিবালা দেই বাদী হইয়া তোমার নামে ৩৫ নং দে: মোকদ্দমা জাতীয় সরকারে উত্থাপিত করিয়াছে। উক্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিন গত ১৯।৯।৮৩ আপনি উক্ত তারিখে উপস্থিত হন নাই। এবং কোন তদ্বিরও করেন না। তাহাতে সরকারের অবমাননা করা হইয়াছে। তজ্জন্য আপনাকে ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড করা হইল। আপনি উক্ত টাকা নোটিশ প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে সরকারে দাখিল করিবেন এবং আগামী ২৬।৯।৪৩ ধার্য্য দিনে আদালতে দাখিল করিবেন, অন্যথায় সরকারের আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে। ইতি ২০।৯।৪৩

শ্রী ভূতনাথ সামন্ত
বিচার সচীব
মহিষাদল থানা জাতীয় সরকার

আমি শ্রীহরিপদ দাস উপেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের (প্রামাণিককে) নোটিশ যাঁচায় নোটিশ লইয়া নোটিশের মর্ম অবগত হইয়া নোটিশ গ্রহণ করিল না, আমাকে ফিরৎ দেওয়ায় লটকাইয়া জারী করিলাম।

২১।৯।৪৩
শ্রীহরিপদ দাস

(গোঃ) নং ৩৫ / নং ২৭৮ নোটিশ

বাদী
শ্রী সিদ্ধিনাথ দে
সাং বরজ

বিবাদী
শ্রীযুক্ত কেনু রাম প্রামানিক
সাং কোলাদিঘী

এতদ্দ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, আগামী ১০ সে আপনার মোকদ্দমার দিন ধার্য্য আছে এদিন আর বিচারে চলিবেন, যদি আপনি সরকার সংশ্লিষ্ট ক্ষীরোদবাবু যেন উপস্থিত থাকেন, কিন্তু ক্ষীরোদবাবুর যদি আসল আইনের আপনাকে হাজির হইতে হইবে, অন্যথায় সরকারের আইনানুযায়ী উক্ত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হইবে, এবং আপনার বিরুদ্ধে দাবীর ব্যবস্থা করা হইবে, ইতি ২৮/৪/৪৩

[illegible]

বিচার সচিব

মহিষাদল থানা জাতীয় সরকার

গান্ধীজির দশদিন

কড়কড়ে শীতের কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে ১৯৪৫-এর ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে দশটায় সোদপুর আশ্রম ছেড়ে সেদিন রাত্রিতেই কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে চলে এলেন গান্ধীজি। পরদিন ২৫শে ডিসেম্বর সকাল ৭টায় শুরু হবে তাঁর মেদিনীপুর পরিক্রমা। ভোরবেলা বেরুলে আশ্রমবাসীদের অযথা কষ্ট হয়, এটা ভেবেই চলে এসেছিলেন রাত্রিতেই। অগত্যা কাছাকাছি কোন হোটেল বা রেঁস্তোরা বা পরিচিত কোন বাড়ি নয়, বাঙলার গভর্ণর আর. জি. কেসি-র দেওয়া প্রিন্সেপ ঘাটের নদীবক্ষে নোঙর করা লঞ্চ 'ন্যান্সি'তেই রাতের ঘুমটা সেরে নিলেন তিনি।

কলকাতায় এমন কড়া শীত বহুদিন পড়েনি। দুদিন পর ২৭শে ডিসেম্বর কলকাতা আবহাওয়া অফিসের হিসেব অনুযায়ী তাপমাত্রা ছিল ৪৭ (ফারেনহাইট) ডিগ্রি। এর ১১ বছর আগে জানুয়ারীর ১১ তারিখে তাপমাত্রা ৪৭-এরও নীচে নেমে গিয়েছিল। আর ৩৫ বছর আগে ১৯১০-এর ২৪শে ডিসেম্বর তাপমাত্রা ছিল ৪৬ ডিগ্রি। তবুও সঙ্গীদের রাত্রিতে তাঁর সঙ্গে লঞ্চেই কাটাবার উপদেশ দিলেন। সঙ্গীরা হলেন তাঁর সেক্রেটারী পিয়ারীলাল, ডাঃ সুশীলা নায়ার, আভা গান্ধী, কাঞ্চন বেন, মিস আনতুস সালাম, জয়প্রকাশ নারায়ণের পত্নী প্রভাবতী দেবী, রামকৃষ্ণ বাজাজ, ভারতন কুমারাপ্পা, অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী, মণিলাল গান্ধী, কানু গান্ধী, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত আর রিকনসিলিয়েশন গ্রুপের সেক্রেটারী সুধীর ঘোষ — যাঁর চেষ্টাতেই গান্ধীজির আগমন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ঐ লঞ্চটিতে একটি কেবিনে মাত্র দুটো বেড। গান্ধীজি থাকলেন কেবিনে। সঙ্গীরা লঞ্চের মধ্যে এদিক ওদিক ছড়িয়ে রাত্রিটুকু কাটানোর জন্য শুতে গেলেন। এর আগেও গান্ধীজি মেদিনীপুর জেলায় এসেছেন অনেকবার। প্রথমবার ১৯২০-র ২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর। ২০শে সেপ্টেম্বর বিকেল চারটায় মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুল অঙ্গনের মাঠের জনসভায় গান্ধীজিকে স্বাগত জানিয়ে বীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যাঁর নামে একদিন নতুন অব্দ প্রচলিত হইবে, সেই মহাপুরুষকে স্বাগত জানাইবার সুযোগ লাভ করিয়া আমার জীবন ধন্য হইল। তাঁহার চরনরেণু স্পর্শে মেদিনীপুরের মৃত্তিকা পবিত্র হইল'। দ্বিতীয়বার এলেন (কাঁথি-মেদিনীপুর) ১৯২৫-এর ৫ই জুলাই দেশবন্ধুর তিরোধানের পরপরই 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' তৈরীর লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে। পরেরবার ১৯৩৪-এ স্বল্প কিছুক্ষণের জন্য ওড়িশা যাত্রার সময় খড়্গপুর রেলষ্টেশনে নেমে জেলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের সম্পত্তির কিছু অংশ গান্ধীজিকে অর্পণ করতে চাইলে মেদিনীপুরের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা জানিয়ে বললেন, "If you believe Gandhi, let you believe it that where I may be from Cape Comorin to the Himalayas, the major portion of my heart is being occupied by the Midnapore people." তাঁর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তৃতীয়বারের জন্য এই যাত্রায় বাঙলার অন্যান্য

জায়গায় সফরসূচী কাটছাঁট করলেও গান্ধীজি তাঁর মেদিনীপুর সফরসূচী অপরিবর্তিত রেখেছেন।

কেন অপরিবর্তিত রাখলেন তা জানবার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৪৬-এর ৩রা জানুয়ারীর সম্পাদকীয়তে একটু নজর দেওয়া যাক ঃ

> 'বাঙলাদেশ পরিদর্শনে আসিয়া যে সকল স্থানে যাওয়া মহাত্মাজীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল মেদিনীপুর তাহাদের মধ্যে প্রধান। বাঙলাদেশের উপর দিয়া এই কয় বৎসরে কি ঝড় বহিয়া গিয়াছে, মেদিনীপুরের বিশেষ করিয়া উহার কাঁথি ও তমলুক অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। বঙ্গোপসাগারের পূর্বে ও পশ্চিমে অবস্থিত এই দুই জনপদকে পরপর যে বিচিত্র বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ভারতের অন্য কোন স্থানে তাহা ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ ...'

বাঙলার লাটসাহেব আর.জি.কেসি গান্ধীজিকে বললেন যে তমলুক এবং কাঁথি মহকুমার কংগ্রেসের লোকজন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে গেছে। শুধু লাট সাহেবই নয়, স্থানীয় কংগ্রেসের কিছু নেতা, যারা তমলুকে আগস্ট আন্দোলনের ধারাকে সমর্থন জানাননি, তারা 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের' কিছু কার্যরীতির ব্যাপারে গান্ধীজিকে তাদের আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাই গান্ধীজি নিজেই চলেছেন এর তদন্ত করতে তমলুকের মহিষাদল আর কাঁথি — সব কিছু শুনতে, জানতে। ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ থেকে ৩রা জানুয়ারী ১৯৪৬ মোট দশদিন ঘুরলেন তিনি এই দুটি মহকুমায়।

২৫শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভোর ৫টায় প্রিন্সেফ ঘাট ছেড়ে লঞ্চ 'ন্যান্সী' গান্ধীজিকে নিয়ে এগিয়ে চলল হুগলী নদী বরাবর মহিষাদলের উদ্দেশ্যে। সকালের দিকে প্রয়োজনীয় কিছু চিঠিপত্র পড়ে নিলেন। একটু বেলার দিকে সঙ্গীদের নিয়ে আগের দিনের বাসি খাবার খেয়ে নিলেন। এরই ফাঁকে অভ্যেসমত দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা সেরে নিলেন। পথে ডায়মন্ডহারবারের ভক্তদের উপেক্ষা করতে পারেননি। বেলা ১২টা নাগাদ লঞ্চ এল ডায়মন্ডহারবারে। চড়ার দরুণ লঞ্চ নদীর তীরে ভিড়তে পারল না। অগত্যা একটা নৌকায় করে এলেন ডায়মন্ডহারবারের নদী তীরের এগজিবিশন গ্রাউণ্ডে। উপস্থিত ৫০ হাজার মানুষের উদ্দেশ্যে জনসভায় গান্ধীজি বললেন ঃ 'আজ একথা বলা প্রয়োজন যে গুণ্ডামী এবং উচ্ছৃঙ্খলতা স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় কিংবা মানব কল্যাণের কোন প্রয়োজনে সাহায্য করবে না। আমি নিশ্চিত যে ভারতের ৪০ কোটি মানুষ যদি অহিংসা এবং সত্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারে তাহলে স্বরাজ আমাদের করতলগত হবেই।'

জনসভা সেরে নৌকা আর নৌকা থেকে 'ন্যান্সী'তে চড়ে হুগলী পেরিয়ে রূপনারায়ণ পাড়ি জমিয়ে গেঁওখালির মুখে আসতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল ৫টা। এরপরও এগিয়ে যেতে হবে ৬ মাইল পথ,— রূপনারায়ণের ডানদিক থেকে বেরিয়ে আসা 'হিজলী-টাইডাল-

ক্যানেল' দিয়ে মহিষাদল বাজার পেরিয়ে রাজবাড়িকে বাঁয়ে রেখে একটু এগিয়ে ক্যানেল-এর পাশেই এক্তারপুর গ্রামে। ক্যানেলে তখন জল কম। বড় লঞ্চ 'ন্যান্সী' ঢুকতে পারল না। তাই ছোট্ট অন্য এক লঞ্চে গেঁওখালি থেকে এক্তারপুর। ৬ মাইল দূরত্বের ক্যানেলের দুই পাড়েই হাজার হাজার জনতা তাদের একান্ত প্রিয়জনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে। গান্ধীজিও প্রত্যুত্তরে লঞ্চের ডেকের উপর একটা চেয়ারে বসলেন। ২৫শে ডিসেম্বরের ঐ লঞ্চ যাত্রার দর্শনার্থীদের বিবরণ দিতে গিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেন ১৯৪৬-এর ৫ই জানুয়ারী ঐ পত্রিকায় লিখলেন ঃ 'কন্‌কনে শীতের রাত্রের অন্ধকারে অগণিত নরনারী শিশু হিজলী খালের দুইধারে সারি দিয়ে নিঃশব্দে মুহূর্তমাত্র দর্শনের আকাঙ্খায় যে দাঁড়িয়েছিল — তাহা কিসের প্রেরণায় বুঝতে পারি নি।'

ধীরে ধীরে লঞ্চ এগিয়ে যাওয়ায় মাত্র ৬ মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় লাগল আড়াই ঘন্টা। লঞ্চ থেকে এক্তারপুর-এর ক্যানেল পাড়ে যখন নামলেন তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। ক্যানেলের ধারেই তৈরি মঞ্চে গান্ধীজিকে সংবর্ধনা জানালেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। অসাধারণ সংযম আর শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়ে শিশু সদনের ছেলেমেয়েরা সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানাতে জানাতে সামনের গান্ধী কুটিরে পৌঁছে দিল। গান্ধীজিও ওদের সঙ্গে হাঁটলেন। গান্ধী কুটিরে গান্ধীজিকে স্বাগত জানালেন শ্রীমতী লক্ষ্মীমনি হাজরা, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য, সুহাসিনী দেবী এবং চারুশীলা দেবী।

প্রথমদিন গান্ধীজি মহিষাদলে বিশ্রাম নিয়েই কাটালেন। এখানকার অভূতপূর্ব শৃঙ্খলায় তিনি মুগ্ধ। আসলে গান্ধীজি আগমন উপলক্ষে প্রায় ৬০,০০০ লোকের জনসমাগমকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৩৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকার সদাজাগ্রত একটি দল অতন্দ্র প্রহরীর মত কাজ করে যাচ্ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য গঠিত হয়েছিল এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি ঃ

সভাপতি ঃ সতীশচন্দ্র সামন্ত, যুগ্ম সম্পাদক ঃ নীলমণি হাজরা, ভবতোষ দাস, স্বেচ্ছাসেবক পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ ঃ সতীশচন্দ্র সাহু, মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ঃ লক্ষ্মীমণি হাজরা, চারুশীলা দেবী, যোগাযোগ ও অতিথি আপ্যায়ন ঃ প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, সাংবাদিক ও বাইরের প্রচার ঃ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপাত্র, শিশু সদন অতিথি পরিচর্যা এবং প্রার্থনা ব্যবস্থা ঃ সুধীরচন্দ্র সামন্ত, অফিস পরিচালন ঃ ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, ললিত কুমার ধাড়া, রামচন্দ্র রায়, খাদ্য বিভাগ ঃ দেবেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ঃ ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক, ফায়ার সার্ভিস ও চিকিৎসা ঃ দেবকীনন্দন গোস্বামী, আবাসন ঃ চন্দ্রশেখর বাগ, রাধাকৃষ্ণ বাড়ি, সত্যনারায়ণ বাড়ি, জলধর ভট্ট। এছাড়াও গান্ধীজির ক্যাম্প-এ ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি কুমারচন্দ্র জানা এবং প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, অনঙ্গমোহন দাস ও হংসধ্বজ মাইতি। জাতীয় সরকারের অন্যতম স্তম্ভ অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধাড়া, গোপীনন্দন গোস্বামী ঐ সময় জেলে। কমিটির অন্যান্য দায়িত্বে তমলুক মহকুমার কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা।

২৫ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত গান্ধীজির দৈনন্দিন কর্মসূচী হল ভোর

৪-৩০ মিনিট-এ প্রার্থনা, পরে প্রাতঃকালীন ভ্রমণের সঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা। বিকেল ২টা থেকে ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত কর্মীসভা। এরপর চরকা কাটা। সন্ধ্যা ৪.৩০ মিনিট থেকে ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত গান্ধীজির প্রার্থনা সভা। এরপর ঘরোয়া মিটিং। কাঁথিতেও প্রায় এরকমই দৈনন্দিন কর্মসূচী।

২৬শে ডিসেম্বর বুধবার ক্যানেলের উঁচুপাড় দিয়ে প্রাতঃভ্রমণের সময় অনাথ ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসস্থল শিশু সদনে এসে ওদের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলেন। সদনের সম্পাদিকা ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর কাছে শুনলেন ওদের ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। গান্ধীজি শুনে খুব খুশী হলেন। অপরাহ্নে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট গান্ধীজিকে মহকুমার আগস্ট আন্দোলনের ঘটনা, গভর্ণমেন্টের অত্যাচার, বিশেষতঃ নারীগণের প্রতি অত্যাচার, বন্যা ও তার ধ্বংসলীলা, দুর্ভিক্ষ আর তার ফল নিয়েই অবহিত করলেন। এই সম্পর্কিত এক স্মারক লিপি তিনি রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী সন্তোষ কুমার বসুর কাছ থেকে গ্রহণ করলেন। মন্ত্রী থাকাকালীন শ্রী বসু আগস্ট আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষের কারণে অবস্থা সরজমিনে দেখার জন্য তমলুক মহকুমা পরিদর্শন করেছিলেন। গান্ধীজি সেই বিবরণ ঔৎসুক্য ও বেদনার সঙ্গে পড়লেন।

বিকেল ৪টার সময় কুটিরের সামনের প্রার্থনা সভার মঞ্চে এলেন। সভায় হাজির হয়েছেন ৬০ হাজারেরও বেশী মানুষ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গান্ধীজির দর্শন লাভে ব্যাকুল নরনারী ভোর হতে না হতেই এসে উপস্থিত হয়েছে বাঁকুড়া, হাওড়া, ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুর জেলার মধ্যে থেকে — পায়ে পায়ে, বাসে, নৌকায় গরুরগাড়ী বোঝাই করে। কে নেই সেই তালিকায়? লাঠিভর দিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুকোলে স্ত্রীলোক, ছাত্রযুবা কে নয়? আগস্ট আন্দোলনে যারা নির্যাতিত, পুলিশ যাদের উপর অত্যাচার করেছে, আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করেছে, যাদের শস্য নষ্ট করে দিয়েছে, যে সমস্ত নারীরা পুলিশের দৈহিক ধর্ষণ সহ্য করেছে, পুরুষদের বন্দী করার ফলে যাদের অশেষ ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে যারা নির্যাতন ভোগ করেছে, প্রিয়জনকে যারা হারিয়েছে — সবাই আছে এই জনসমুদ্রে। গান্ধীজিকে শোনাবে তাদের করুণ ইতিহাস। সন্ধ্যার সেই বিশাল জনতাকে লক্ষ্য করে তাঁর মহিষাদলের আসবার কারণ ব্যাখ্যা করে গান্ধীজি বললেন ঃ

> 'আপনারা এতদিন কি করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য এবং দুঃখ কষ্টের সহিত পরিচিত হইয়া তাহা মনেপ্রাণে যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি — আমি এখানে বক্তৃতা দিতে আসি নাই — সমগ্র জীবনে আমি বহু বক্তৃতা দিয়াছি; এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি — আমার জীবনেও একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। আমার মনে হয় বক্তৃতা দিয়া আমি আপনাদের কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারিব না। মেদিনীপুরের জনগণের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিয়া আমি এখানে আসিবার জন্য ব্যাগ্র হইয়াছিলাম, আজ সে সুযোগ পাইয়া আমি সুখী — এখানে

অবস্থানকালে আমি আপনাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিব।'

এরপর তিনি মিলিতভাবে কাজ করবার অভ্যাস গড়ে তুলতে সকলকে সমবেতভাবে প্রার্থনা সঙ্গীতে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বললেন যে 'স্বরাজ কেহ কখনও দেবে না; উহা অর্জনের জন্য আমাদের শক্তি সমন্বয়ের প্রয়োজন; অহিংসা বা শান্তির জন্যও উহার প্রয়োজন আছে।'

তৃতীয় দিন ২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভোরের প্রার্থনা সেরে প্রাতঃ ভ্রমণের পর একবার লঞ্চে এলেন লঞ্চের অসুস্থ কর্মী শুখানি মহম্মদ হাওলাদার-এর খোঁজ নিতে। সঙ্গে শুখানির চিকিৎসক ডাঃ সুশীলা নায়ার। এই সময়েই মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সতীশচন্দ্র সামন্তকে জিজ্ঞেস করলেন ১৯৪২-এর 'আগস্ট আন্দোলন'-এর সময় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে। ঐ সময় দুর্ভিক্ষের গতি-প্রকৃতি এবং সরকারি ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। অহিংসার একনিষ্ঠ পূজারী সতীশচন্দ্র গান্ধীজির কাছ থেকে একটু সময় চেয়ে নিয়ে বললেন, 'আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা সেরে আপনার এই কথার উত্তর দোব।' সহকর্মীদের কাছ থেকে সত্য বলার অনুমতি পেয়ে সতীশচন্দ্র অপরাহ্নে গান্ধীজির মুখোমুখি বসে সবিস্তারে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন এবং ব্রিটিশের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা স্বাধীন 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'-এর কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করলেন। ব্রিটিশ সরকারের সেনাবাহিনীর অত্যাচার নিয়ে বলতে গিয়ে ১৯৪৩-এর ৯ই জানুয়ারী মাশুড়্যা, ডিহিমাশুড়্যা ও চণ্ডীপুর গ্রামে একইদিনে একই সময়ে ব্রিটিশ মিলিটারীর ৭৬টি মহিলার উপর পাশবিক গণধর্ষণের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে বললেন যে ৯ দিনের মধ্যেই একজন ধর্ষিতার মৃত্যু হয়েছিল। অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদে চরকায় সুতো কাটতে কাটতে এই অবর্ণনীয় কাহিনী শুনে সতীশচন্দ্র সামন্তকে বললেন 'প্রমাণ দিতে পার?'। গান্ধীজি তাঁর সামনে এমন ৫ জনকেউপস্থিত করতে বলেছিলেন। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের সময় যারা দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলেন তাদের সম্মান জানানোর জন্যই চরকায় সুতা কাটার প্রদর্শনী চলছিল। ৫ জন ধর্ষিতাকে পাওয়া গেল সহজেই। এদের সাক্ষাৎকার নিলেন আভা গান্ধী। বাংলায় সাক্ষাৎকার নিয়ে ধর্ষিতাদের স্বীকারোক্তি হিন্দিতে তর্জমা করে দিতেই গান্ধীজি বিচলিত হলেন। সুতা কাটতে কাটতেই গান্ধীজির মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল, 'বর্বর'।

এরপরেই গান্ধীজি সতীশচন্দ্রের কাছে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্যধারায় কোন ধরণের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল কিনা তা শুনতে চাইলেন। সতীশচন্দ্র গান্ধীজির কাছে সমস্ত ঘটনাই স্বীকার করলেন। বললেন 'হ্যাঁ, বাপুজি। আমরা গ্রাম্য গুপ্তচর ও দেশদ্রোহীদের প্রাণদণ্ড দিয়েছি, পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে যারা লুঠতরাজ করেছে তাদের অর্থদণ্ড করেছি, গ্রেপ্তার করেছি। ... একদিকে দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকের বর্বর অত্যাচার, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ যখন চরমে উঠেছিল, তখন জাতীয় সরকার

রোগে চিকিৎসা করেছে, পথ্য দিয়েছে, দুর্ভিক্ষে খাদ্য-বস্ত্র দিয়েছে। আবার চোর ডাকাতদের দমন করেছে, মুনাফাখোর পুঁজিপতি ও রিলিফের নামে যারা গরীবদের বঞ্চিত করে খাদ্য পাচার করেছে, গুপ্তচর বৃত্তি, লুণ্ঠন ও অত্যাচারে সামিল হয়েছে, তাদের দমন করতে বাধ্য হয়েছি সাধারণের স্বার্থে ও প্রয়োজনের তাগিদে। ওদের বর্বরতা আমাদের বাধ্য করেছে এ পথ গ্রহণ করতে।'

গান্ধীজি শুনে সতীশচন্দ্রকে বললেন, 'মহিষাদলে আগস্ট আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং বীরোচিতও বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, যেটা ছাড়া স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।' এরপরেই সঙ্গীদের মহিষাদলের বিভিন্ন নির্যাতিত ব্যক্তিদের ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে তমলুক ও মহিষাদলের উন্নয়নের বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বসলেন।

মহিষাদলে কয়েকদিনের অবস্থানকালে গান্ধীজি কোন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেননি। আগস্ট আন্দোলনের সময় মহিষাদল রাজারা যে 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'-এর বিরোধিতা করেছিলেন তা কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজিকে বলেছিলেন। তাই শুধু এদিনের সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় তিনি বললেন, 'আমরা বর্তমান বৈদেশিক শাসনের হাত হইতে অবিলম্বে মুক্তি চাই। বৈদেশিকগণ তো দূরের কথা আমাদের স্বদেশীয় রাজারাও যদি আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সে বন্ধনও মোচন করিতে হইবে।' সভায় শুরুতে ভজন পরিবেশিত হওয়ার সময় উপস্থিত জনতার একসঙ্গে 'করতালি'র লয় সম্বলিত এক শব্দ তরঙ্গের মূর্ছনায় গান্ধীজি আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন। এই 'লয়'-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে গান্ধীজি বললেন, 'আমরা যদি এক মন এক প্রাণ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি তাহা হইলে কি রাষ্ট্র কি সর্বশক্তি ভগবান — যাঁহার নিকট হইতে আসুক না কেন আমরা সকল প্রকার বিপর্যয়কে আমাদের শাসনে আনিতে সক্ষম হইব ... প্রার্থনাকালে যে সমস্ত ভজন গান গীত হইয়া থাকে আপনারা তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবেন, এ আশাই আমি করি।' তিনি বললেন 'আমি লক্ষ্য করিয়াছি, যখন 'রামনাম' গীত হইতেছিল, আপনারা তাহাতে যোগদান করেন নাই। কিন্তু আপনাদিগকে, শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। আপনারা সম্মিলিতভাবে ইহা করিতে পারেন।'

স্বরাজ বা স্বাধীনতা কিভাবে অর্জন করা যায় সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের সমস্ত জীবনকে দুঃখে গাঁথিতে হইবে। আহারেই হউক, ভ্রমণেই হউক, জীবনের সর্বত্র থাকিবে সৌন্দর্য। জীবনে যাঁহাদের সৌন্দর্য নাই তাঁহারা কেমন করিয়া স্বরাজ বা স্বাধীনতা অর্জন করিবেন, আমি বুঝিতে পারি না।'

ঘুরে ফিরে তিনি এসেছেন স্বাধীনতার লক্ষ্য পথে অহিংসার মন্ত্রে। তাই তিনি বললেন, 'আমি আপনাদিগকে স্বাধীনতা দিতে পারি না। স্বাধীনতা অর্জন এবং রক্ষণের শক্তি আপনাদের নিজেদেরই সংগ্রহ করিতে হইবে। জীবনের ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝিয়াছি

বিনিময় ভিন্ন কিছু পাওয়া যায় না। ইহার জন্য চাই শক্তি এবং এই শক্তি অহিংসা। অহিংসাই যথার্থ শক্তি। ধর্মমূলক অনুষ্ঠান হইতে আমরা যাহা পাই তাহাই যথার্থ, তাহাই জীবনকে মহৎ করে। প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য।'

গান্ধীজি যৌথ বক্তব্যের উপর বেশী জোর দিতেন। ঐদিন প্রার্থনা সভায় শ্রোতাদের বললেন ওরা হিন্দুস্থানী জানে কিনা। গান্ধীজির এক প্রশ্নের উত্তর সমবেতভাবে দিতে না পারার জন্য তিনি তাদের কাছে স্নেহসূচক কৈফিয়ৎ চাইলেন। বললেন, 'আপনারা আমার কথা না বুঝেন, দৃঢ়ভাবে সমবেত কণ্ঠে, তাহাই বলিবেন। বক্তব্য বলিবার সময়ে সমবেতভাবে বলিতে চেষ্টা করিবেন।'

২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালীন ভ্রমণের সময়টা খুবই রঙ্গ রসিকতার মধ্যে কাটল। স্বেচ্ছাসেবক শিবির, অস্থায়ী শিশু সদন, অভ্যর্থনা সমিতির অফিস, রেডক্রস এবং চিকিৎসা কেন্দ্র, মহিষাদল থানা কংগ্রেস কমিটির অফিস ইত্যাদি দেখলেন। অনুসন্ধান অফিসের সামনে এসে গান্ধীজি পরিহাস করে বললেন, 'কাহার নিকট আমি অনুসন্ধান করিব? আমি অফিসের মধ্যে কাহাকেও দেখিতেছি না।' অন্যান্য দিনের মত অপরাহ্নে পাঁচ শতাধিক স্ত্রী-পুরুষের মিলিত চরকা কাটা সূত্রযজ্ঞে নিজে যোগদান করে অন্যান্য প্রতিযোগীদের ধন্যবাদ জানালেন। তিনি বললেন, 'চরকায় যেমন শক্তি আছে এমন শক্তি আর কোন যন্ত্রে আছে বলিয়া তাঁহার জানা নাই। ... চরকার মধ্যে স্বরাজের শক্তি ও তাঁহাদের সকল সম্পদ নিহিত রহিয়াছে, চরকা অহিংসার প্রতীক।'

ঐদিন সান্ধ্য প্রার্থনা সভার পূর্বে তিনি শিশু সদনের শিক্ষক, স্বেচ্ছা-সেবিকা ও বালক-বালিকাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। বালক-বালিকাদের ওয়ার্ধা শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের বললেন, 'উহাদিগকে যদি আমরা ভাল শিক্ষা দিতে পারি, তবে এমন একদিন আসিবে, যখন উহারাই দেশের সত্যিকার সেনা হইয়া উঠিবে।' শিশুদের উদ্দেশে বললেন, 'আমি তোমাদিগকে কি বলিব? তোমরা খেলিতে ভালবাস। আমি কি তোমাদের সাথে খেলাই করিব? আমি খেলা করিতে পারি কিন্তু তাহা হইলে অন্যান্য জরুরী কাজ আমার করা হয় না।' এতে শিশুরা খুব হেসে উঠল। গান্ধীজির কথা ওরা খুব উপভোগ করল। তখন সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত গান্ধীজিকে ওদেরকে ওয়ার্ধায় নিয়ে যেতে বললে তিনি বললেন, 'প্রস্তাবটি খুবই ভাল, কিন্তু এদেরকে ওয়ার্ধায় লইয়া গেলে সতীশবাবুই বলিবেন যে উহাদিগকে আমি চুরি করিয়া নিয়েছি।' স্বেচ্ছাসেবিকারা আগস্ট আন্দোলনের সময় জেলায় যে ক্ষতি হয়েছে, মহিলাদের ওপর বলাৎকার হয়েছে তার প্রতিবিধানের পরামর্শ চাইলে গান্ধীজি বললেন, 'পরামর্শ দিতে আমি আসি নাই। যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা দেখিবার ও শুনিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। আমি সমস্ত কিছুই বুঝিতে পারিয়াছি।'

তবুও তাদের দুঃখ দুর্দশার কথার জের টেনে সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় বিশাল জনতার উদ্দেশে বললেন ঃ

'দুঃখ কষ্ট ব্যতীত কেহই স্বরাজ অর্জনের জন্য শক্তিলাভ করিতে পারে না। দুঃখের মধ্য দিয়া ছাড়া কেহই ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে না, দুঃখবরণ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। তাঁহারা যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছে তাহা ব্যর্থ হইবে না।'

যারা আশঙ্কা করেছিল যে নিপীড়িতরা তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানিয়ে মহাত্মাজীকে অস্থির করে তুলবে তারা হতবাক হয়ে গেল। ৬০,০০০ লোকেরা একসঙ্গে করতালি গোপালকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ নাম গান করে সে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গেল। গান্ধীজির সফর সঙ্গী আনন্দবাজারের প্রতিনিধি ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেন সেই দৃশ্য দেখে মন্তব্য করলেন ঃ 'এই নাম গানের দৃশ্য দেখে অবিশ্বাসীরাও মুগ্ধ হয়েছে। আমরা লজ্জিত হয়েছি। ইংরেজি শিক্ষার মোহ আমাদের এমনই সর্বনাশ করেছে যে, ক্ষণিকের জন্যও দুইবাহু তুলে নাম গান করতে পারিনি।'

গান্ধীজি সভার শুরুতে সভায় যে সমস্ত নিয়ম মেনে চলা উচিত, সেই বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বিনয় এবং সৌজন্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বললেন ঃ

'খুব প্রয়োজন না হইলে কাহারও সভাস্থল ত্যাগ করা উচিত নহে। অস্বস্থি বোধ করিলে সভাস্থল ত্যাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে অন্যের অসুবিধা হয়। কেহ কেহ হয়ত ভাবতে পারে। কিন্তু তাহাতে অন্যের অসুবিধা হয়। কেহ কেহ হয়ত ভাবতে পারেন যে, তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশী থাকিতে পারেন না। ইহা ভাল কথা, কিন্তু সভায় আসিবার পূর্বে তাহার এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। সভার কাজ যখন চলিতে থাকিবে সেই সময় সভাস্থল ত্যাগ করা উচিত নহে।'

মাঝে মাঝে দেখা যায় সভা আরম্ভ হবার পরে অনেকে সভায় আসেন না। তাই তিনি বললেন ঃ

'সভাস্থলের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তাহাদের ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করা উচিত। সাধারণ সভার এই নিয়মগুলি প্রার্থনা সভার পক্ষে আরও বেশীভাবে প্রযোজ্য। প্রার্থনার সময় তাঁহারা চিন্তামগ্ন থাকেন। প্রার্থনার সময় বাহির হইতে বাধা পাওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সভার আহ্বায়কদের শ্রোতৃগণকে এই বিষয়ে শিক্ষাদানের চেষ্টা করা উচিত। ইহা দ্বারা তাহাদের প্রতিষ্ঠানগত শক্তিবৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার দ্বারা জীবনের বহুক্ষেত্রে সাফল্য লাভ সম্ভব হইবে।'

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ (শনিবার) গান্ধীজির মহিষাদলে পূর্ণ অবস্থানের শেষ দিন। ঐদিন তিনি ভীষণ কর্ম ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। প্রত্যুষে প্রার্থনা সেরে সকালবেলায় ভ্রমণের সময়ও তিনি বহুলোকের সঙ্গে নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। দুপুরে আলোচনায় বসলেন মহিষাদল কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে বাসুদেবপুরে কুমারচন্দ্র জানার গান্ধী আশ্রমে

যাবেন কিনা এই নিয়ে। বাসুদেবপুরে যাওয়ার ব্যাপারেও নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার উর্দ্ধে দলকে স্থান দিয়াছিলেন তিনি। গান্ধীজি মেদিনীপুর সফরে তমলুক মহকুমার কোথায় অবস্থান করবেন এই নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিল। আগস্ট বিপ্লবের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের পছন্দ মহিষাদল আর বিরোধীরা বিশেষ করে কুমারচন্দ্র জানা চাইলেন সূতাহাটা। ঠিক হয় মহিষাদল। তাই কুমাববাবু চাইলেন যে গান্ধীজি একবার কিছুক্ষণের জন্যও যদি সূতাহাটায় যান। গান্ধীজি সায় দিতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন ঃ 'যাঁরা আমার কর্মসূচী প্রস্তুত করেছেন এবং যাঁদের আশ্রয়ে আমি অবস্থান করেছি তাঁরা যা স্থির করবেন তাই হবে।' কুমারবাবু ঠিক করলেন যে গান্ধীজি সূতাহাটা না গেলে তিনি অনশন করবেন। এ কথায় গান্ধীজি ক্ষুণ্ণ হলেন। সতীশচন্দ্র সামন্ত তাই আলোচনাকালে গান্ধীজির কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন, 'বাবুজি আপনি এসেছেন আমাদের মধ্যে মনমালিন্য দূর করে মিলন ঘটাতে। আপনি একবার কিছু সময়ের জন্য কুমারবাবুর অনুরোধে তাঁর আশ্রমে না গেলে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অন্তরায় সৃষ্টি হবে।'

এর পরেই গান্ধীজি বাসুদেবপুর যাওয়া স্থির করেন। বেলা দুটার সময় সঙ্গীদের প্রহ্লাদ প্রামাণিকের সঙ্গে তমলুক পাঠিযে দিলেন ওখানে আগস্ট আন্দোলনের ঘটনার সব কিছুর খবর নিতে। আর সতীশচন্দ্র সামন্তকে সঙ্গে নিয়ে বাসুদেবপুর গেলেন। ওখানে একঘন্টা কাটিয়ে জনসভায় ভাষণ দিয়ে মহিষাদলের সান্ধ্য প্রার্থনা সভার নির্ধারিত সময়ের আগে ফিরে এলেন। প্রার্থনা সভায় একঘন্টা সময় নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ করলেন সভায় সমবেত মানুযকে। তমলুক মহকুমায় আগস্ট আন্দোলনের কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি বললেন ঃ

> 'যে কারণগুলোর খোঁজার জন্য আপনাদের মাঝে আমার এই কয়দিনের অবস্থান, আপনাদের কাছে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমি অনেকাংশে এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমি আগে বলেছি যে আপনারা অনেক সাহস এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন, এরই সঙ্গে আমি বলব যে সেই কাজে আপনারা অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। অহিংসা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই অনৈক্যের মূল হেতু। অহিংসার তাৎপর্য্য সম্পর্কে আপনাদের কাহারও কাহারও মনে ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। তাছাড়া আপনারা কিভাবে পরস্পরকে নিগৃহীত করিয়াছেন — সেটিরও আপনাদের বিবেচনা করা উচিত।
>
> 'আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে কোন ফাটল ধরাতে দেওয়া যাইতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ শির উন্নত করিয়া চলার শিক্ষাই আমাদের লাভ করা উচিত। কোন অবস্থাতেই হিংসার আশ্রয় লওয়া আমাদের উচিত নহে। অহিংসার মধ্য দিয়াই আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য।
>
> 'আপনারা যদি ইহা না করেন তাহা হইলে আমি কিছু করিতে পারিব না।

এমন কি আমাদের দাবির পক্ষে বিশ্বব্যাপী প্রচার চালালেও আমি কাজে সফলতা লাভ করব না যদি না এটা আপনাদের পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিই।

'৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছি যে বিশ্বের সমক্ষে দোষ ত্রুটি স্বীকার করিলে কোন ক্ষতি তো হয়ই না বরং অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন হওয়া যায়। সত্য অহিংসার সাধনা করিয়া আমাকে কোন ক্ষেত্রেই একটুকু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে না পারিলেও অহিংসার ওপর আমাদের দোষারোপ করা উচিত নহে। পক্ষান্তরে ইহাতে এই কথাই বুঝা যায় যে, আমাদের যাহা উচিত ছিল, আমরা তাহা পাইতে পারি নাই। সত্য ও অহিংসা মানুষকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানব সন্তানকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। আপনারা কি সকলকে নিজের মত ভালবাসেন? সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে পারিলে হরিজনেরা এখনও আর অস্পৃশ্য থাকিত না। তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। অস্তগামী সূর্যকে সাক্ষী করিয়া আমি ঘোষণা করিতেছি যে হিন্দুরা যদি অস্পৃশ্যতা বর্জনে সক্ষম না হন তাহা হইলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য।'

পরিশেষে গান্ধীজি বললেন যে, 'আজ আমার মহিষাদল থাকার শেষ দিন। এই সফর আমি খুব উপভোগ করেছি।' তাঁকে এবং তাঁর দলের সদস্যাদের আতিথেয়তার স্বাচ্ছন্দ দিতে স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছা-সেবিকারা হাসিমুখে অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন, তারজন্য তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে নেমে চললেন কুটিরের দিকে।

রাত্রি আটটায় গান্ধী কুটিরে আলোচনা বসল রাজনৈতিক নির্যাতিত বন্দী মুক্তির ব্যাপারে। অনেকের দীর্ঘ নানান প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নানান উদাহরণ দেখিয়ে। নারী মর্যাদা রক্ষা করে অহিংসা নীতি অনুযায়ী কি করে স্বাধীনতা আন্দোলন চালানো যায় এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন দীর্ঘ সময় দিয়ে। গান্ধীজি বললেন, 'আমরাত তেমন স্বরাজ চাই না যাতে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণই হতে পারে। আমি আজই বিকেলে একবার বলেছি যে যদি সত্যি ভঙ্গ করে স্বরাজ পাই, তবে তা আমাদের কাম্য সমাজ হবে না। তেমনি বলতে পারি স্ত্রী জাতির মর্য্যাদা নষ্ট করে যদি স্বরাজ পেতে হয়, তবে তাকেও আমি স্বরাজ বলব না। অহিংসার দ্বারা যদি স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রক্ষা করতে না পারি, তবে সে অহিংসা কোন কাজের নয়। কিন্তু আমি বলব যে, যা হিংসার দ্বারা পেতে পারি তা অহিংসার দ্বারা অবশ্যই পেতে পারি।' ১৯২১-এ বলা পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'যদি কোন পুরুষ বলে, আমি অহিংস আছি অথচ আমার স্ত্রীকে, বোনকে, মাকে রক্ষা করতে পারলাম না, তারত উচিত তরোয়াল ব্যবহার করা। ... কাপুরুষ তো হতে বলি না।'

৩০শে ডিসেম্বর (রবিবার) সকালবেলা প্রাতঃকালীন ভ্রমণের রোজকার সঙ্গী

সতীশচন্দ্র সামন্ত উশখুশ করছেন গান্ধীজিকে একটা কথা বলার জন্য। একটু পরেই কাঁথির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বেন। বলা হবে না ঘুরপাক খাওয়া কথাগুলো। দ্বন্দ্বকে সরিয়ে সাহসে ভর করে সতীশ সামন্ত গান্ধীজিকে বললেন, 'বাপুজি আপনি তো সব শুনলেন, সব দেখলেন। এবার আপনার রায়ের জন্য মাথা পেতে আছি।' উত্তরে গান্ধীজি বললেন, 'আমি কি এতোই বোকা (বুঢ়বক) যে এত বড় শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে যার এতটুকু প্রমাণ করতে পারেন নি তোমাদের কাজ, সে কথা আমি স্বীকার করে বা প্রকাশ্যে বলে তোমাদের ফাঁসি কাঠে লটকিয়ে দেবো।'? তারপর সতীশচন্দ্র সামন্তর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সব কো সাথ দোস্তী বনো। — সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোল।'

এর পরেই সকাল সাতটায় পায়ে পায়ে গিয়ে উঠলেন লঞ্চ 'ন্যান্সী'তে। টাইড্যাল ক্যানেলে জল কম থাকায় প্রথমে ঠিক ছিল নরঘাট হয়ে পুরো রাস্তা যাবেন মোটরে। সেইমত নরঘাট-অঞ্চলে বিশাল জনতা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু গান্ধীজির জলপথটাই বেশী পছন্দের। শেষ মুহূর্তে সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা ভরসা দিলেন হিজলী টাইড্যাল ক্যানেল দিয়েই লঞ্চ যেতে পারবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নরঘাটের জমায়েতকে জানিয়ে দেওয়া হল গান্ধীজি ঐ পথে যাবেন না। অগত্যা লঞ্চ ন্যান্সী এগিয়ে চলল ক্যানেল বরাবর হলদি নদী ডিঙিয়ে কাঁথির দিকে। কিছু দূরে রেয়েপাড়ায় গান্ধীজি লঞ্চ থেকে নামতে হাঁসচড়া-র জমিদার বনবিহারী গায়েন এবং তার স্ত্রী সুমতি গায়েন টাকার তোড়া আর 'সূত্র অর্ঘ্য' দিয়ে গান্ধীজিকে সম্মান জানালেন।

আরও কিছুটা এগিয়ে বেলা এগারটায় তাঁর লঞ্চ উপস্থিত হল ইরিঞ্চিঘাট-এ। ইরিঞ্চিঘাট থেকে মোটরে ৪ মাইল দূরের ভগবানপুর আর পটাশপুর থানার সীমানায় 'কাকরা' গ্রামে পৌঁছলেন দুপুরবেলা। তখনকার দিনে সমগ্র ভারতের মধ্যে বস্ত্র সমস্যা সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল এই খাদি গ্রামটি দেখবার জন্য গান্ধীজি আগ্রহান্বিত ছিলেন খুব। ইরিঞ্চিঘাট থেকে কাকরা পর্যন্ত গান্ধীজির মোটর যাওয়ার জন্য রাস্তা তৈরি করেছিলেন গ্রামের লোকেরাই। কাকরায় যাওয়ার পথে গান্ধীজি পেলেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। কাকরায় পৌঁছলে কংগ্রেস নেতা ঈশ্বরচন্দ্র মাল গ্রামের অবস্থান বর্ণনা দিলেন গান্ধীজিকে। কাকরা গ্রামে গান্ধীজি কাটালেন তিনঘন্টা। গ্রামে সেবাশ্রমের উদ্যোগে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ছিল চরকা কাটার প্রদর্শনী। শ্রীযুক্তা শৈলবালা দাস নিজের হাতে বোনা একটি খাদির চাদর. উপহার দিলেন গান্ধীজিকে। ফিরে আসবার আগেই প্রার্থনা সেরে নিলেন তিনি। বিশাল জনতার শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন রাসবিহারী পাল, সতীশচন্দ্র দিণ্ডা, নৃপেন্দ্র ভূষণ মাইতি, ভীমচন্দ্র পাত্র, পীতবাস দাস, ভূপেন্দ্র মাইতি এবং রামসুন্দর সিংহ প্রমুখেরা। ফিরতি পথে ৬০,০০০ মানুষ রাস্তার কর্ডন ভেঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। গান্ধীজির গাড়ির চালক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে দ্রুত গাড়িটিকে নিরাপদে বের করে ইরিঞ্চিঘাটে পৌঁছে দিলেন। তখন বিকাল ৪টা।

ওখান থেকে লঞ্চে আবার যাবেন কালিনগর। কালিনগর পৌঁছবার আগেই লকগেটে গান্ধীজির লঞ্চ ২০ মিনিটের জন্য আটকে গেল ক্যানেলে জল কম থাকায়। জোয়ারে লঞ্চ ভাসলো। কালিনগর পৌঁছলেন সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ। আবার এগিয়ে চললেন কাঁথির দিকে। কালিনগরে অল্প দূরে 'ভাইতজোড়'-এ আগস্ট আন্দোলনের শহীদ তোরণ দেখে তিনি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এক মিনিট থামলেন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কাঁথি শহরে গাড়ি নিয়ে ঢুকলেন তিনি প্রায় নিঃশব্দে। উদ্যোক্তারা আর স্বেচ্ছাসেবকরা ভেবেছিলেন যে গান্ধীজির গাড়ি ঢুকলে সাইরেণ বাজবে, পাইলট গাড়ি থাকবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্বেচ্ছাসেবকদের ভেতর দিয়েই অতি সাধারণভাবে হেঁটে এগিয়ে গেলেন। কাঁথি শহরের কেন্দ্রস্থলে বরেণ্য মনীষী বীরেন্দ্রনাথের ভাইপো দেবকুমার শাসমলের বাড়িতে উঠলেন। এ বাড়িই কাঁথি থাকাকালীন গান্ধীজির ঠিকানা। ওখানেই অভ্যর্থনা জানালেন কাঁথি মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, ডাঃ রাসবিহারী পাল, প্রমথনাথ ব্যানার্জী, বলাই লাল দাসমহাপাত্র এবং সতীশচন্দ্র দিণ্ডা প্রমুখ কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা।

কাকরার প্রার্থনা সভার পর তাঁর সাপ্তাহিক মৌন থাকার সময়। পরদিন অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর সোমবার বিকেলের প্রার্থনা সভার সময় পর্যন্ত তিনি মৌন থাকবেন। তাই রাত্রি বিশ্রাম নিয়ে কাটালেন।

গান্ধীজির কাঁথির দৈনন্দিন কর্মসূচী মহিষাদলের কর্মসূচীর মতোই। ৩১শে ডিসেম্বর সোমবার তাঁর সাপ্তাহিক মৌন দিবস। সকালে দেখা করতে এসেছিলেন অনেকেই। তারা এক তরফা কিছু বলে গেলেও কোন আলোচনা করা যায়নি। সকালবেলা স্থানীয় এক স্কুলে মণিলাল খাঁ এবং সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত উপস্থিত মানুষজনদের বুঝিয়ে দিলেন গান্ধীজির সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা সভায় যোগদান করার নিয়ম কানুন। ওঁরা বলে দিলেন গান্ধীজির কাঁথি অবস্থানকালে যেন সবাই 'গান্ধীজি কি জয়' না বলে 'রামচন্দ্র কি জয়' বলেন।

১লা জানুয়ারী ১৯৪৬ গান্ধীজি কাঁথি মহকুমার ১৮জন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে কাঁথি মহকুমার পুনর্গঠনে ৩৬ পাতার রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। কংগ্রেস কর্মীরা গান্ধীজিকে এলাকায় বন্যার প্লাবন ঠেকাতে নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝালেন। এ ব্যাপারে ১১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার একটি পরিকল্পনা গান্ধীজির কাছে জমা দেন। সেবা সঙ্ঘের কর্মীরা গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন গ্রামীণ শিল্পের নানা সমস্যার কথা। চরকা এবং বয়ন শিল্পের সমস্যার কথা শোনাতে উপস্থিত হলেন স্বয়ং কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি। মেয়েরাও বাদ যায় নি। উপস্থিত হয়েছিলেন — আভা মাইতি, বন্দনা দিণ্ডা, গীতা পাল।

অপরাহ্নে প্রায় ২ জন ছাত্র, ২৫ জন মহিলা এবং ৫০ জন কর্মী গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাদের পড়াশুনা, বুনিয়াদী শিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রশ্ন আগ্রহ ভরে শুনলেন। তাঁরা গান্ধীজিকে জিজ্ঞেস করলেন যে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত হবে কিনা এবং স্কুলে স্কুলে সহ শিক্ষা চালু করা উপযোগী কিনা।

বিকেলে প্রার্থনা সভা আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছু আগে থেকে কাঁথির সমস্ত অলিগলি বেয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে প্রার্থনা সভার দিকে।

মেদিনীপুর জেলায় দুর্গতির কারণ কি ছিল তা দেখার জন্য মূলতঃ এই পরিক্রমা থাকলেও পরিষদীয় রাজনীতির ছোঁয়া থেকে কখনও বিমুক্ত হতে পারেন নি। বিকেলের প্রার্থনা সভায় গান্ধীজি বললেন যদিও তিনি পরিষদীয় কাজকর্মকে প্রধান স্থান দেন না গঠনমূলক কাজই কংগ্রেসের মুখ্য কাজ হওয়া উচিত, তবুও চলতি নিয়মকানুন মেনে কিছু লোককে পরিষদে যেতে হবে। তাই যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রচার করছেন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে আইন সভায় যেতেই হবে। প্রায় দেড় লক্ষ লোকের এই সমাবেশে গান্ধীজি প্রার্থনা চালু করার উপর গুরুত্ব দিলেন। তিনি বললেন যে তার মানে এই নয় যে ছাত্রদের এ ব্যাপারে বাধ্য করা হবে প্রার্থনায় যোগ দিতে। বাধ্যতার কোন প্রশ্নই নেই। তিনি বললেন যে, 'আমাকে অনেকে বলেছেন আপনারা আমার ভাষণ শুনতে এসেছেন — প্রার্থনায় যোগ দিতে নয়। তাহলে আমি নাচার। প্রার্থনার মধ্য দিয়াই আপনারা আপনাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন'। গান্ধীজি যে জন্যে কাঁথি এসেছেন সেই সম্পর্কিত অনেক অভিযোগই তিনি নিজে কদিন ধরে শুনেছেন। তাই তিনি সভায় বললেন যে এখানে আসবার আগেই বাঙলার বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার সেচ এবং নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি গভর্ণর আর.জি. কেসির সঙ্গে আলোচনা করে এসেছেন।

গত কয়েক দিনের পরিশ্রমে স্বাস্থ্যের কারণে ২রা জানুয়ারী কাঁথির বন্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখা বাতিল করলেন। দলের অন্য লোকজনদের পাঠালেন খবর সংগ্রহের জন্য। সকালে প্রাতঃভ্রমণের সময় অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের সদস্যারা গান্ধীজিকে গার্ড-অফ-অনার দিলেন। তারপর স্বেচ্ছাসেবকদের মঞ্চে দাঁড়িয়ে (১) সুভাষ বোস বাহিনী (২) গান্ধী বাহিনী (৩) বীরেন্দ্রনাথ বাহিনী (৪) নেহেরু রেজিমেন্ট এবং (৫) দেশপ্রাণ বাহিনীর মিলিত অভিবাদন গ্রহণ করলেন। প্রত্যুত্তরে গান্ধীজি দেশের কাজের জন্য একটি স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গুরুত্বের কথা বলেন। অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মানুষের কাজ করবে এবং মানুষকে কোনভাবেই বিরক্ত করবে না এই ইচ্ছাই পোষণ করলেন।

বিকেলের প্রার্থনা সভায় সম্পূর্ণ অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে নেতাজীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বললেন ঃ

> 'আমি বিশ্বাস করি সুভাষ বোস নিশ্চিত জীবিত আছেন। হয়তো কোথায় লুক্কায়িত আছেন। তাঁর শৌর্য্যের এবং দেশপ্রেমের আমি একজন অনুরাগী। কিন্তু তিনি যে পন্থা নিয়েছিলেন তাতে আমার বিশ্বাস নেই। ভারতের মানুষ তরবারির জোরে কখনও স্বাধীনতা পাবে না।'

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন ছাত্ররা হরিজনদের কিভাবে সাহায্য করবে। তিনি বললেন ঃ 'এটা বহু পুরাতন প্রশ্ন। যদি সত্যিই তারা হরিজনদের সেবা করতে চায় তাহলে

গ্রামে গিয়ে ওদের সাথে মিশে ওদের ভালবেসে ওদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।' হরিজনদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া এবং অসবর্ণ বিবাহের প্রশ্নে যদিও গান্ধীজি বোঝেন যে কংগ্রেস কর্মীরা এই প্রশ্নে দ্বিমত হবে না বা হওয়া উচিত নয়, তবু বললেন কেউ যদি নিজেকে একজন হরিজন হিসেবে ভাবতে না পারেন তাহলে সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করা যাবে না। যদি কেউ হরিজনকে বিবাহ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে তিনি সেই বিবাহে তাঁর আশীর্বাদ দিতে পারেন না। তিনি বললেন হরিজনকে বিবাহ করা আসলে সমস্যা নয়, আসলে সমস্যাটা হল মনের।

ছাত্রীদের কোন আলাদা সংগঠন থাকবে কিনা-এর উত্তরে বললেন যদিও জীবনে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই কিন্তু যতক্ষণ মহিলারা 'মহিলা' থাকবেন ততক্ষণ তাদের কাজের জন্য আলাদা সংগঠন থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁর ওয়ার্ধার আশ্রমে পুরুষ এবং নারীরা একত্রে বসবাস করে এবং কাজও করে একসঙ্গে, তা সত্ত্বেও সেখানে আলাদা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সভার শেষে তিনি বললেন, শ্রেণী সংগ্রামকে হঠিয়ে সমাজ ব্যবস্থায় জনগণের লড়াইয়ের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাই হল তার 'রামরাজ্য' বা 'খুদা কি রাজ' প্রতিষ্ঠার মূল সোপান — যেখানে এক ঝাড়ুদারও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হবে।

৩রা জানুয়ারী সকালবেলা কাঁথি থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর সেই স্টীম লঞ্চে চড়ে ফিরে এলেন পুরনো পথেই , তাঁর ভালো লাগার মহিষাদল হয়েই। পথে দুইধারে কাতারে কাতারে মানুষ অভিবাদন জানিয়েছে। তমলুক-কাঁথির ভক্তদের এই নীরব শৃঙ্খলা গান্ধীজির হৃদয়-স্পর্শ করেছে। এই শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি দেখেছেন যে, তাঁর বাণী এদের হৃদয়ে স্থানলাভ করেছে, তাঁর সাধন পথে এই দুটি মহকুমার লোকেরা চলতে শিখেছে। ৩০-৪০ মাইল দূর থেকে লোক ছুটে এসেছে সমস্ত কিছু কাজ ফেলে সমস্ত ধরণের প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে। এসেছে শুধু এই নিবেদন করতে যে, 'প্রভু তোমারই কাজের জন্য আমরা একটুমাত্র করতে পেরেছি।'
